উড়িষ্যার সাধক কবি
দ্বারিকাদাসের

মনসামঙ্গল

শ্রীবিষ্ণুপদ পাণ্ডা এম. এ. ; পি-এইচ. ডি. ; ডি. লিট.
অধ্যাপক
ভুবনেশ্বর আঞ্চলিক শিক্ষা-মহাবিদ্যালয়
কর্তৃক সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৭৯

ভারতবর্ষে মুদ্রিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসের সুপারিনটেন্ডেন্ট শ্রীঅক্ষয়কুমার রায় কর্তৃক বেঙ্গলি পাবলিকেশন কমিটির পক্ষে ৪৮ হাজরা রোড, কলিকাতা-১৯ হইতে প্রকাশিত।

প্রথম প্রকাশ: ২০শে জানুয়ারী, ১৯৮০

মূল্য: ২৫'০০ টাকা (পঁচিশ টাকা)
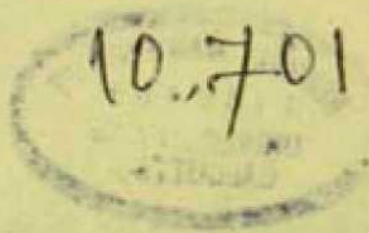
মুদ্রণে:
মিলি প্রেস
২৩, যুগলকিশোর দাস লেন
কলিকাতা-৬

"যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হয়ে রও।
ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত,
কথা কও, কথা কও।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরম পূজনীয়া মাতৃদেবীর
শ্রীচরণোদ্দেশে

প্রাক্‌কথন

কয়েকবৎসর পূর্বে একবার অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ পাণ্ডার সহিত আলোচনা হইতেছিল। তখন তিনি ভুবনেশ্বরে কোনো—এক কলেজের বাংলার অধ্যাপক। পুঁথির খোঁজখবর লওয়া তখন তাঁহার নেশায় পর্যবসিত হইয়াছিল। সেই সময়ে ভুবনেশ্বরে অবস্থিত উড়িষ্যা সরকারের প্রদর্শশালায় অনেকগুলি বাংলা পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছিল, যাহার হরফ ওড়িয়া, ভাষা বাংলা, লেখক অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওড়িয়া। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী, পুরাণের আখ্যান এবং মঙ্গলকাব্য—এই শ্রেণীর অনেকগুলি বাংলা কাব্য ভুবনেশ্বরের প্রদর্শশালায় সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু এই বিচিত্র ব্যাপারের প্রতি বড়ো কাহারো দৃষ্টি পড়ে নাই। বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্য, ডক্টর পাণ্ডা গ্রন্থগুলির সন্ধান পাইলেন, পরীক্ষা করিলেন এবং ওড়িয়া হরফ হইতে বাংলা হরফে রূপান্তরিত করিয়া লইলেন। তাঁহার পত্রে বিস্তারিত পরিচয় পাইয়া কৌতূহলের বশে একদিন তাঁহার বাসায় হানা দিলাম। পরিচয় যাহা পাইলাম তাহাতে চমকিত হইলাম। সপ্তদশ শতাব্দীতে এবং আরো পরে আবির্ভূত বেশ কয়েকজন ওড়িয়া কবি ওড়িয়া হরফে দিব্য বাংলা কাব্য ফাঁদিয়াছিলেন। ডঃ পাণ্ডা তাহারই কিছু কিছু লিপ্যন্তরীকরণ করাইয়াছেন। প্রায় তিন-শত বৎসর ধরিয়া একাধিক ওড়িয়া কবি ওড়িয়া হরফে বাংলা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার সংবাদ আমরা রাখি নাই। ডঃ পাণ্ডা এই পুঁথিগুলি সাজাইয়া গুছাইয়া লিপ্যন্তরীকরণ করাইয়া ছাপাইবার অভিলাষী। কিন্তু প্রকাশক জুটে না। কীটের ভোজ্য এই সমস্ত তালপাতায় লেখা পুঁথি ছাপাইয়া প্রকাশকের কোন লাভ নাই। তাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা প্রকাশন বিভাগ এইরূপ একখানি পুঁথি প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ডঃ পাণ্ডাই তাহা সম্পাদনা করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং জীবনের শেষ কয় বৎসর পুরীধামেই অতিবাহিত করেন। অনেক ওড়িয়া ভক্ত ও অভিজাত সম্প্রদায় তাঁহাকে দেবতাবৎ ভক্তি করিতেন। স্বয়ং রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন, এ সব কথা চৈতন্যজীবনীকাব্যে আছে। তাঁহার প্রভাবে উড়িষ্যায় নূতন ভক্তিভাবের বন্যা আসে। তাঁহার ওড়িয়া ভক্তেরা

বোধ হয় কিছু কিছু বাংলাও শিখিয়াছিলেন। অবশ্য ওড় ভূমির নিজস্ব একটা বলবীর্যময় সুকঠিন চরিত্রধর্মও ছিল, যাহার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে বাঙ্গালী কবি গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' এবং ওড়িয়া কবি ব্রজনাথ বড়জেনার 'সমর তরঙ্গ' এর তুলনামূলক আলোচনা করিলে। বর্গীর হাঙ্গামায় বাংলাদেশ যখন বিত্রস্ত এবং প্রবল উপপ্লবে তৃণখণ্ডবৎ ভাসিয়া গিয়াছিল, তখন ঢেনকানলের সাধারণ লোক হাতিয়ার বাঁধিয়া হিতাহিত জ্ঞানশূন্য লুঠেরাদের বিরুদ্ধে খাড়া দাঁড়াইয়া লড়াই করিয়াছে। সে যাহা হোক, চৈতন্যদেবের প্রভাব বীর্যকঠোর ওড় কলিঙ্গের চরিত্রে একটা কমনীয় স্বাদু মাধুর্য সঞ্চার করিয়াছিল তাহা অস্বীকার করিলে ইতিহাসকেই অস্বীকার করা হইবে। তাঁহারই প্রভাবে কিছু কিছু ওড়িয়া কবি বাংলা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, অবশ্য ওড়িয়া হরফে। ডঃ বিষ্ণুপদ পাণ্ডা এইরূপ অনেকগুলি কাব্য লোকলোচনের সমক্ষে আনিয়া বাংলা সাহিত্যের মহদুপকার করিয়াছেন, দুইদেশ ও সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্কও চমৎকার বুঝাইয়াছেন। সম্প্রতি রাজনীতির পক্ষ হইতে জাতীয় সংহতি সংস্থাপনের জন্য নানাবিধ প্রচেষ্টা ও কার্যক্রম অনুসৃত হইতেছে। তবে সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়াই যথার্থ সংহতি স্থাপিত হইতে পারে। একদা শ্রীচৈতন্য উড়িষ্যা ও বাংলাকে আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধিয়াছিলেন, ডঃ পাণ্ডা অবিষ্কৃত এই পুঁথিগুলি হইতে তাহার আর-এক বিচিত্র পরিচয় পাওয়া গেল।

ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে কবি দ্বারিকাদাস সুপরিচিত। ভক্তিগ্রন্থ, পৌরাণিক কাব্য, তত্ত্বকবিতা প্রভৃতি রচনা করিয়া তিনি ওড়িয়া সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। উড়িষ্যা প্রদর্শশালায় ওড়িয়া হরফে লেখা দ্বারিকাদাসের মনসামঙ্গলকাব্য, যাহা বাংলা ভাষায় রচিত, তাহা কি ওড়িয়া কবি দ্বারিকা-দাসেরই রচিত? এ-বিষয়ে সম্পাদক যে সমস্ত যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহার মূল্য স্বীকার করিতে হইবে। এই কবি কিছুকাল মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে বসবাস করিয়াছিলেন, মেদিনীপুর তখন উড়িষ্যারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনুমান করি, এই অঞ্চলে আসিবার পূর্বেই দ্বারিকাদাস বাংলাভাষা ভালোই আয়ত্ত করিয়া-ছিলেন। এখন যেমন ভাষার প্রাচীর তুলিয়া ভৌগোলিক সীমানা নির্দিষ্ট হয়, দুই-তিন শত বৎসর পূর্বে সেরূপ সীমা- সঙ্কীর্ণতা ছিল না, বাংলা ও ওড়িয়ার ক্ষেত্রে তো নহেই। যাহাহউক, ডঃ পাণ্ডার যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত অনুসারে কবি দ্বারিকাদাসকে ওড়িয়া কবি বলিয়া গ্রহণ করা গেল।

মনসামঙ্গলকাব্য সমগ্র বাংলা দেশে সুপ্রচারিত, প্রান্তীয় অঞ্চলেও এই কাব্যোক্ত মনসাদেবী ও তাঁহার পূজা প্রচারের কাহিনী প্রচলিত আছে। বাংলার বাহিরে নানা স্থানে মনসা, বেহুলা, নেতার উল্লেখ হইতে মনে হয় সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উৎস প্রাগবৈদিক, ইরানীয় ও হেলেনীয় ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত। আদিবাসী কিরাত, নিষাদ, দ্রাবিড়, আর্য (ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন) প্রভৃতি চিন্তা-ভাবনায়ও সর্পভূষণা সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সন্ধান পাওয়া যাইবে। বাংলাদেশের নদ-নদী জলা বেষ্টিত জাঙ্গল প্রদেশে বায়ুভুক নিঃশব্দসঞ্চারী 'পন্নগিনী লতেব' সর্পকুল দীর্ঘকাল ধরিয়া পুত্রকলত্র সহ বসবাস করিতেছে। কাহারও দন্ত প্রাণঘাতী, কাহারও বা নহে। যে কোন সর্পকে দেখিবামাত্র শরীর সির সির করিয়া উঠে, বিষ নির্বিষ না বাছিয়াই তাহাকে নিপাত করাই মনুষ্যসমাজের সাধারণ রীতি। কোলরীজের মতো অহিফেন প্রসাদাৎ দিব্যদৃষ্টি লাভ হইলে ভুজঙ্গ দেহের চারুচিত্রে মন খুশি হইতে পারিত। মনসাকে কেন্দ্র করিয়া সর্পপূজক 'কাল্ট' বা উপধর্ম বাংলাদেশে হাজার খানেক বৎসর জাঁকাইয়া বসিয়াছে। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ—বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলেই মনসামঙ্গল কাব্য প্রচারিত হইয়াছে, মনসাপূজক সম্প্রদায় গোটা বাংলাদেশেই ছড়াইয়া আছে। সুতরাং ধর্মমঙ্গলকে নহে, মনসামঙ্গলকাব্যকেই মধ্যযুগীয় বাংলার জাতীয় কাব্য বলা যাইতে পারে। উপরন্তু এ কাহিনীর মধ্যে মহাকাব্যোচিত ঘটনার ঘনঘটা আছে, আছে নরনারীর হৃদয়বেদনায় অশ্রুসকাতর স্পর্শ, ট্রাজেডির বিষণ্ণতাও ইহাতে দুর্লভ নহে। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্কীর্ণতা, শিক্ষা-দীক্ষার অভাব এবং অক্ষরপরিচয়হীন 'সামাজিক'-দের প্রয়োজনের তাড়নায় এ-কাব্য নিতান্তই স্থানীয় রচনা হইয়াছে, মহাকাব্যের বিশাল প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ সমস্ত মঙ্গলকাব্যেই ভূমিচারী আদর্শ ও অনুজ্জ্বল রচনাধর্ম ইহার কাব্যত্বকে ভূগোল ইতিহাসের সীমা ছাড়াইতে দেয় নাই। মধ্যযুগের কোন্ আখ্যান কাব্যই বা পারিয়াছে?

অবশ্য দ্বারিকাদাসের মনসামঙ্গল অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের রচনা, ভাষা-ভঙ্গিমায় সেই আধুনিকতা ধরা পড়িবে। ফলে রচনরীতি অনেকটা মার্জিত, পয়ার-ত্রিপদী-একাবলী ছন্দও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিখুঁত। দু-এক স্থলে কিছু কিছু বিস্ময়কর বাগ্‌ভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। কৌতুক রসে কবির বিশেষ স্পৃহা না থাকিলেও করুণরসের রচনায় তিনি আন্তরিকতা সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। মনসামঙ্গলের কোন কোন স্থলে কিছু আদিরসের বাড়াবাড়ি আছে যাহা ব্রীড়া-

জনক। কবি সে সমস্ত স্থূলতা বর্জন করিয়া সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন। বাংলা দেশের মনসামঙ্গলের সহিত কোন কোন স্থলে ইহার যৎকিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে, সম্পাদক তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি সুদীর্ঘ ভূমিকায় এই কাব্য ও কাব্য-বহির্ভূত অনেক বিষয়ে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন; কাব্যের বিষয়, চরিত্র, ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা নৈপুণ্য দাবি করিতে পারে। ওড়িয়া হরফে লেখা আরও অনেক বাংলা কাব্য-কবিতার সন্ধান তাঁহার কাছেই মিলিবে। সেগুলি ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইলে উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক বিচিত্র রহস্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় — অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৮৬ ॥ ১৯৭৯

ভূমিকা

উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ষোড়শ শতাব্দী ছিল একটি অত্যন্ত মূল্যবান যুগ। এই সময় শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম শুধু উড়িষ্যার সমাজকে নয়, সে যুগের সর্ব-শ্রেণীর মানুষের আবেগকে উদ্বেলিত করে তুলেছিল। একথা ঠিক যে, শ্রীরাঘবেন্দ্র পুরী নীলাচলে বসবাস করার ফলে শুদ্ধ প্রেমের প্রতি উড়িষ্যার মানুষের আকর্ষণ চৈতন্য-পূর্ব যুগেও সৃজিত হয়েছিল। চৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীচৈতন্য এবং রায় রামানন্দের যে বিশদ কথোপকথনের কথা বিবৃত হয়েছে, তা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উড়িষ্যার জনসমাজে শুদ্ধ প্রেমের প্রচার সর্ব প্রথমে শ্রীচৈতন্য করেননি। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, নীলাচলে তিরোধান পর্যন্ত অবস্থানের মধ্যেই শ্রীচৈতন্যের প্রেমবাদ বিপুল পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করে এবং তার ফলে অন্যান্য ধর্ম-বিশ্বাস যেমন ভক্তিমূলক যোগ মার্গ প্রভৃতি বাধ্যতামূলকভাবে প্রেমমার্গের সঙ্গে এক ধরণের বোঝাপড়ার মধ্যে চলে আসে এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণের ক্ষেত্রে উভয় মার্গের মধ্যে সহাবস্থানের সেতুবন্ধন ঘটে। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের তরঙ্গ উড়িষ্যার কবিকুলের অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। যাঁরা ওড়িয়া ভাষার কবি হিসেবে খ্যাত ছিলেন তাঁদের অনেকেই বাংলা ভাষায় কাব্য রচনায় ব্রতী হন। তখন উড়িষ্যায় চলেছে প্রতাপরুদ্রদেবের শাসন। সেই প্রবল প্রতাপান্বিত রাজাও শ্রীচৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং অনুমানে বাধা নেই যে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রাজদরবারের অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দও শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর পরিকরদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক প্রভাবে যে তৎকালীন পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। কবির ভাব ও ভাষার মধ্যে সেই প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই সঞ্চারিত হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, সাম্প্রতিক কালের প্রাদেশিক এবং ভাষাগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা সে যুগে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। এর ফলে ওড়িয়া ভাষার প্রতিভাবান স্বভাবকবিরা বাংলা ভাষার স্বভাবকবিতে পরিণত হয়েছিলেন কিন্তু তার জন্যে সাম্প্রতিক কালের মতো ভাষা শিক্ষায় কোন প্রকার প্রয়োজনই তাঁদের হয়নি।

ভুবনেশ্বর আঞ্চলিক শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ের গবেষক-অধ্যাপক ডঃ বিষ্ণুপদ পাণ্ডার অধ্যবসায়কে অজস্র ধন্যবাদ। তিনি উড়িষ্যার রাজ্য সংগ্রহশালার পুথি

বিভাগ থেকে ওড়িয়া লিপিতে লেখা বহু তালপাতার পুথি আবিষ্কার করেছেন। ডঃ পাণ্ডার মতে, ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকে বহু ওড়িয়া কবি বাংলায় কাব্য রচনা করেছেন। ষোড়শ শতকের রচয়িতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেন রায় রামানন্দ, বিখ্যাত ওড়িয়া ভাগবত লেখক জগন্নাথ দাস এবং কবি অনন্ত দাস। এঁরা সকলেই প্রতাপরুদ্রদেবের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। সপ্তদশ শতকের কবিদের মধ্যে যাঁদের রচনা পাওয়া গেছে তাঁরা হলেন, দ্বারিকাদাস, দ্বিজ লোকনাথ, জগন্নাথ মিশ্র, মাধবদাস, মধুদাস, মাধব রথ, পুরুষোত্তমদাস, শেখরদাস, ধনঞ্জয় ভঞ্জ, যদুনন্দনদাস এবং কবিপ্রসাদ। অষ্টাদশ শতকে বাংলা রচনা যাঁদের পাওয়া গেছে তাঁদের মধ্যে আছেন ভৃঙ্গবর রায়, ব্রজবন্ধু সিংহ, ছুবী শ্যামদাস, রঘুনাথদাস, গোকুল রায়, হরিচরণদাস, পিত্তিকা শ্রীচন্দন, নিত্যানন্দদাস, রামচন্দ্র দেব, রামচন্দ্র দাস, শঙ্কর আচার্য এবং শ্যামসুন্দর ভঞ্জ। কবি গৌরচরণ, কবিচন্দ্র জগন্নাথ, নটবর দাস এবং নারায়ণ মর্দরাজ রচিত যে বাংলা কাব্যগুলি পাওয়া গেছে সেগুলি উনবিংশ শতকের। এছাড়া আরো বেশ কিছু পুথি ডঃ পাণ্ডা পেয়েছেন যেগুলিতে কবির নাম নেই বা যেগুলি থেকে কবির নামাঙ্কিত অংশ নষ্ট হয়ে গেছে। এখনো রাজ্য সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষ দূরবর্তী পল্লী অঞ্চল থেকে পুথি সংগ্রহের কাজ অব্যাহত রেখেছেন। অতএব আশা করা যায় যে, এই ধরণের আরো অনেক পুথি ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে।

ঠিক কী ভাবে এবং কেন একজন খ্যাতিমান ওড়িয়া কবি বাংলায় কাব্য রচনা করেছিলেন সেটি বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান এবং আলোচনার বিষয়। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, এঁরা বই পড়ে বাংলা শেখেন নি কারণ বাংলা লিপির ব্যবহার এঁরা করেন নি। প্রতিবেশী বাঙালীদের সঙ্গে পারস্পরিক এবং আন্তরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বাংলার ভাষাগত জ্ঞান তাঁদের গড়ে উঠেছিল এবং পুরীধামে শ্রীচৈতন্যের অবস্থান কালে অহোরাত্র সংকীর্তন প্রথা প্রচলিত হওয়ার ফলে ঐ জ্ঞান আরো সুসংগঠিত হতে পেরেছিল। এখনো উড়িষ্যার সর্বত্র শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর প্রবর্তিত প্রেমধর্ম সম্পর্কিত কীর্তন বাংলাতেই গীত হয়ে থাকে। জনসাধারণের বিশ্বাস এই যে, ওড়িয়া ভাষার চাইতে বাংলায় গীত সংকীর্তনের ভক্তিমূলক আবেদন অনেক বেশী। প্রকৃতপক্ষে শ্রীচৈতন্যকে অবলম্বন করে বা তাঁর প্রবর্তিত প্রেমধর্ম বিষয়ে ভক্তিমূলক সঙ্গীত আজও ওড়িয়া ভাষায় যথেষ্ট সংখ্যক রচিত হয় নি।

আমরা যেসব শতাব্দীর কথা চিন্তা করছি সেগুলিতে ভাষাকেন্দ্রিক বিবাদ মোটেই ছিল না। ধর্মচিন্তা এবং ধর্মবিশ্বাসই ছিল জীবনযাত্রার মৌল প্রেরণা। হয়তো সেই কারণেই উড়িষ্যার কবিকুল শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত প্রেমধর্ম যে ভাষায় প্রচারিত হয়েছিল সেই ভাষাকেই আপন আপন ভাবাবেগ প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তুলনামূলক ভাবে বিচার করলে বলতে হয় যে, ওড়িয়া বা হিন্দীর তুলনায় বাংলা ভাষা স্বভাবতই অনেক পরিমাণে কোমল। বাংলা ভাষার এই কোমলতা অমসৃণ অন্য যে কোন ভাষার চাইতে গভীর অনুভূতির বাহন হিসেবে তাকে অনেক বেশী সার্থক হতে সাহায্য করেছে। যে যুগে শ্রীচৈতন্য ছিলেন গুরু এবং রাজা প্রতাপরুদ্র ছিলেন তাঁর শিষ্য, সে যুগে পুরীধামের সামগ্রিক পরিবেশ যে ভক্তিরসে সম্পূর্ণভাবে আর্দ্র হয়ে উঠেছিল এতে কোন সন্দেহ নেই এবং এরই ফলে হয়তো বা সে যুগের কবিরা বাংলা ভাষার কাব্য রচনা করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাছাড়া বাংলা ভাষা শাসন পরিচালনের কাজে তখনো অল্প বিস্তর ব্যবহৃত হোত।

ডঃ পাওার এই গবেষণামূলক কাজকে আমি সাধুবাদ জানাই কারণ তাঁর কাজ প্রমাণিত করল যে উড়িষ্যা, বাংলাদেশ এবং আসাম পরস্পরের মধ্যে মূল্যবান ভাবের আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে সমগ্র পূর্বভারতে একটি অখণ্ড সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে তুলেছিল। বহু শতাব্দী ধরে পূর্বভারতের বিভিন্ন ধর্ম এবং সংস্কৃতির মধ্যে সংহতি সাধনের প্রতীক হিসেবে শ্রীজগন্নাথদেবের অবদান সর্বস্বীকৃত। জানা গেল, উড়িষ্যার কয়েকজন কবির বাংলা লিপিতে লিপ্যন্তরিত অল্প কিছু রচনা মেদিনীপুর, বীরভূম এবং বঙ্গদেশের অন্য কোন কোন অঞ্চলে জনপ্রিয় ছিল। এখন দেখা গেল ওড়িয়া কবিদের রচিত ওড়িয়া লিপিতে লিখিত প্রচুর বাংলা কাব্য উড়িষ্যায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

ঊনবিংশ শতকে উড়িষ্যা এবং বঙ্গদেশীয় অধিবাসীগণের মধ্যে ভাবসংহতির ক্ষেত্রে কেন বাধা সৃষ্ট হয়েছিল, তার বিশ্লেষণ সহজ নয়। ইতিহাসের দিক থেকে বলা যায় যে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব এবং প্রায় সমসাময়িক কালে প্রতাপরুদ্র দেবের মৃত্যুতে সমগ্র উড়িষ্যায় রাজনৈতিক অরাজকতা সূচিত হয়। নীলাচলস্থিত শ্রীজগন্নাথকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে উঠেছিল তা সৈন্যদলের মধ্যে অন্তর্বিরোধ, কতকগুলি বিখ্যাত সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যের বিদ্রোহ এবং বহিরাগত মুসলমানদের আক্রমণে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে যে যোগমার্গীয় ধর্মাচার প্রায় সম্পূর্ণভাবে অপস্থত হয়েছিল, তার পুনরাবর্তন ঘটে এবং শ্রদ্ধাভক্তি বনাম জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির বাদ-বিসংবাদ অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে। শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য রচনার ক্ষেত্রে এই নতুন চিন্তাধারা বাধা সৃষ্টি করেছিল, এই অনুমান অসঙ্গত নয়। এরপর উনবিংশ শতকে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হোল এবং তাদের বিভেদ-সৃষ্টিমূলক শাসন প্রথার জন্যে আর কিছু পরিমাণে অর্থনৈতিক কারণে উড়িষ্যা এবং বঙ্গবাসীদের মধ্যে বিরোধ ঘনীভূত হয়ে উঠল। আজও কোন কোন গোষ্ঠীর মধ্যে সেই চিন্তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

সাময়িকভাবে উড়িষ্যার বা বঙ্গদেশের আচরণের মধ্যে যা-কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটুক না কেন, গত পাঁচ শতকেরও অধিক কাল উড়িষ্যাবাসীদের ও বঙ্গবাসীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য যে অখণ্ড এবং অবিভাজ্য থেকেছে, এ সত্য অবিস্মরণীয়।

একাম্র নিবাস
ভুবনেশ্বর

শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব

ভূমিকায় উল্লিখিত পুথির মোটসংখ্যা ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত মুদ্রিত তালিকায় পাওয়া গিয়েছিল। রাজ্য প্রদর্শশালায় এখন প্রায় ৩৫ হাজার পুথি পঞ্জীভুক্ত হয়েছে।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট

ভূমিকা

পুথি পরিচয়

উড়িষ্যা রাজ্য সরকারের সাংস্কৃতিক বিভাগের তত্ত্বাবধানে ভুবনেশ্বরে যে প্রদর্শশালাটি আছে তার সঙ্গে একটি পুথি-বিভাগ সংযুক্ত আছে। এখানে বিভিন্ন শতাব্দীর বিভিন্ন ভাষায় রচিত পাঁচ সহস্রাধিক পুথি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সংরক্ষিত আছে। এই সংগ্রহের মধ্যে কিছু বাংলা পুথিও আছে, যদিও তার সংখ্যা খুব বেশী নয়। এর অধিকাংশই কিন্তু ওড়িয়া লেখা হরফে তালপাতার পুথি।

প্রদর্শশালার পুথি বিভাগে চারখানি মনসামঙ্গল কাব্যের সন্ধান পাই। এর মধ্যে দু'খানি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ কৃত মনসামঙ্গলের অনুলিপি এবং অন্য দু'খানি দ্বারিকা দাস নামক কোন এক অজ্ঞাত পরিচয় কবির মনসামঙ্গল। প্রথমোক্ত পুথি দু'খানির একটি একেবারেই খণ্ডিত এবং অন্যটির শেষাংশ নেই। কেতকাদাসের নামাঙ্কিত বহু পুথি এযাবত সংগৃহীত হয়েছে এবং এই কবির একটি সংকলন অধ্যাপক যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে। গ্রন্থটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করেছেন। স্বভাবতই দ্বারিকা দাস কৃত মনসামঙ্গল দু'খানির প্রতি আমি আকৃষ্ট হই এবং উড়িষ্যা রাজ্য সরকারের অনুমতি ক্রমে এগুলির অনুলিপি প্রস্তুত করি। এগুলির লিপিরূপও ওড়িয়া।

আলোচ্য দু'খানি পুথি (বি ৩২ এবং বি ৩৩) মেদিনীপুর জেলা নিবাসী জনৈক সীতারাম দাস ১৯৬০ সালের ১৫ই নভেম্বর প্রদর্শশালায় দিয়ে যান। কেতকা দাসের উল্লিখিত দু'খানি পুথির মধ্যেও একখানি (বি ৬৩) পাওয়া যায় ঐ সংগ্রাহকের কাছ থেকে।

সংকলিত গ্রন্থে বি ৩২ সংখ্যক পুথিখানিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে বলে এটিকে 'ক' পুথি এবং দ্বিতীয়টিকে 'খ' পুথি বলেই অতঃপর উল্লেখ করা হবে। আপাতদৃষ্টিতে 'খ' পুথিটিকে প্রাচীনতর মনে হলেও পুথি বিভাগের অধ্যক্ষ পণ্ডিত নীলমণি মিশ্রের মতে এবং লিপিরূপ বিচারে 'খ' পুথির চেয়ে 'ক' পুথিটিই প্রাচীনতর বলে স্বীকৃত হয়। 'ক' পুথিটিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহন করার যুক্তি এই একটিই।

'ক' পুথির পত্রসংখ্যা ৮৯, অর্থাৎ এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৭৮। এটির আকার ৪০'৫×৩'৪ সেন্টিমিটার। প্রতিটি পৃষ্ঠায় চার বা পাঁচ ছত্র লেখা হয়েছে।

সর্বশেষ পৃষ্ঠার ছত্রসংখ্যা দুই। তিন ছত্র লেখা কোন পৃষ্ঠা এ পুথিতে নেই। এর লিপিরূপ সুন্দর নয় এবং হস্তাক্ষর অস্পষ্ট। পুথির প্রান্তিক অংশগুলিতে কোথাও কোন মন্তব্য বা মূল কাহিনীর সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত কোন বক্তব্য লিখিত নেই। 'ক' এবং 'খ' পুথি দু'টির ভণিতার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তাই এ নিয়ে আলোচনা একত্রে করা যাবে। পুষ্পিকায় প্রকাশ, লেখক শ্রী বংশীচরণ বেরা কাঁথি নিবাসী রাধাচরণ বেরার পৌত্র এবং মনোহর বেরার পুত্র। এঁর সম্পূর্ণ বক্তব্য সংকলন গ্রন্থের শেষে যুক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় বা 'খ' পুথির পত্রসংখ্যা ৯৫ এবং স্বাভাবিকভাবেই এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯০। এটির আকার ৪৪·৮ × ৩·৫ সেন্টিমিটার। পৃষ্ঠাগুলিতে চার এবং পাঁচ ছত্র লেখা পাওয়া যায়। এই পুথির কোথাও দুই বা তিন ছত্র লেখা নেই। এটির হস্তাক্ষর অনেক পরিচ্ছন্ন এবং লিপিরূপও সুন্দর। এই পুথির পুষ্পিকা অংশটি বিনষ্ট। সেখান থেকে যেটুকু পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তা হলো—

ইতি শ্রী মনসামঙ্গল হ্নদাজয় সম্পূর্ণং।
শ্রীশ্রী বিষহরায় নম। পৌষ মাস……
সাঙ্গ হইল মনসার গীত ॥
কবিরাজে গায় মনসার পদ্মপায়।
কৃপা করি বিষহরী রাখিও আমায় ॥
বেল তিনি ঘড়ি সমএ এ গ্রন্থ লিখন পুন্য হইল।
লিখিতং গিরিধর মাহান্তী…প্রগনে…
……সর্পভয়রু উদ্ধার করিব।

পুথি দুটির তালপাতাগুলোর মাঝখানে ছিদ্র করে মোটা সুতো দিয়ে দু'টি করে মসৃণ কাঠের সঙ্গে বাঁধা। 'খ' পুথির উপান্তে কোন কিছু মন্তব্য লিপিবদ্ধ হয়নি কিন্তু কোন কোন অধ্যায়ের শীর্ষদেশে সম্ভবতঃ গায়েনদের ব্যবহার করবার জন্যে লিপিকর একটি ধ্রুবপদ যুক্ত করেছেন। সে পদটি হোল 'জয় হরি বলরে, গোবিন্দ বলরে'। 'ক' পুথিতে কোথাও এই ধ্রুবপদের উল্লেখ নেই। সংকলিত গ্রন্থে এটি তাই বর্জিত।

কোন পুথিতেই প্রক্ষিপ্ত অংশ নেই অর্থাৎ কাহিনীর বা বর্ণনার কোন অংশে লিপিকরের স্থূলহস্তাবলেপ ঘটেনি। এর ফলে কীটদষ্ট অংশ ব্যতীত কাব্যখানিকে প্রায় অবিকৃত ভাবেই পাওয়া গিয়াছে। লিপিকর প্রমাদ অবশ্যই ঘটেছে। দু'টি পুথির পাঠ মিলিয়ে যতদূর সম্ভব সেগুলির সংশোধন করা হয়েছে। কিন্তু

কোন কোন অংশে পাঠবিকৃতি ঘটেছে সংশোধনের সুযোগহীন লিপিবিকৃতির জন্যে। তৃতীয় পুথি যদি কোনদিন আবিষ্কৃত হয় তাহলে এই ত্রুটিগুলির সংশোধন সম্ভব হবে।

দু'টি পুথিই জীর্ণ এবং শোচনীয় ভাবে কীটদষ্ট। 'খ' পুথিটি জীর্ণতর। পুথিগুলি গৃহস্থের কাছে যেভাবে রক্ষিত থাকে তাতে সমস্ত পুথিরই বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা। মনে হয়, তালপাতার ব্যবহার ভারতীয় সংস্কৃতির পক্ষে সৌভাগ্যসূচক। পাতাগুলির সুদৃঢ় গঠন সমস্ত অবহেলা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভক্তিমিশ্রিত মনোযোগ অতিক্রম করে, বহু মূল্যবান অনুলিপি সাম্প্রতিক কালের গবেষকদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছে।

'ক' পুথির পাঠ আদর্শ হিসেবে গৃহীত হয়েছে বলেই 'খ' পুথি থেকে সংগ্রহ করা পাঠান্তরগুলি পাদটীকায় যথারীতি সংযোজিত হয়েছে। প্রথম পুথির বিনষ্ট অংশের পাঠ দ্বিতীয় পুথির সাহায্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উদ্ধার করা গেছে। যেখানে তা করা সম্ভব হয়নি, সেখানে পাঠ অযুক্ত থেকেছে। দু' একটি এমন ক্ষেত্র ও আছে যেখানে অনবধান বশতঃ প্রথম পুথিতে একাধিক ছত্র লিখিত হয়নি। দ্বিতীয় পুথির সাহায্য নিয়ে এ সব ত্রুটিও সম্ভবমত সংশোধন করা গেছে।

বানান বৈষম্য পুথির শুদ্ধ পাঠ নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি বিরাট বাধা। প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় রচিত পুথির সম্পাদনার সময় তৎসম শব্দগুলির শুদ্ধ রূপ দেবার রীতি সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন। বর্তমান ক্ষেত্রেও তা স্বীকৃত। কিন্তু এই প্রসঙ্গে রীতিটির অন্য একটি দিক আলোচনার যোগ্য মনে করি।

বর্তমান পুথির মূল ভাষা মধ্যবাংলা কিন্তু এর সঙ্গে কিছু সমকালীন ওড়িয়া শব্দের সংমিশ্রণ ঘটেছে। বলা বাহুল্য, পুথির মধ্যে তৎসম শব্দের সংখ্যা অল্প নয়। এই শব্দগুলি যে বানানে লিখিত হয়েছে, সে কালে প্রাকৃতজনেরা শব্দগুলিকে ঐভাবে উচ্চারণ করতেন। অর্থাৎ এই শব্দগুলির লিপিরূপ তাৎকালিক প্রাকৃত ব্যবহারের ধ্বনিরূপটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। কবির মূল রচনায় শুদ্ধরূপ থাকলেও লিপিকরদের দ্বারা তা যে সর্বত্র রক্ষিত হয়নি এ রকম অনুমানে বাধা নেই। তুস্তি (স্তুতি), আগ্যা (আজ্ঞা), বস্ত্র (বস্ত্র), পুশ্য (পুষ্প), দৈবগ্য (দৈবজ্ঞ), প্রভৃতি শব্দগুলি এই শ্রেণীভুক্ত।

পুথির কাহিনীটি পঞ্চাশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। মনসার জন্মবৃত্তান্ত ও আভরণ বর্ণনা থেকে শুরু করে বেহুলা-লখিন্দরের স্বর্গ প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সমগ্র কাহিনীটি এরই মধ্যে বিন্যস্ত। অধিকাংশ অধ্যায় সংক্ষিপ্ত এবং কোন অধ্যায়েই বিষয়বস্তু-

সংক্রান্ত শীর্ষক নেই। বেহুলার সঙ্গে লখিন্দরের বিবাহ প্রস্তাব, বিবাহ বর্ণনা, স্বর্গে বেহুলার নৃত্য ও বরভিক্ষা প্রভৃতি অল্প কয়েকটি অধ্যায় কিঞ্চিৎ দীর্ঘ।

পুথিটি যে প্রক্ষিপ্ত নয়, এ কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। দু'টি পুথির কাহিনী অংশে কোথাও কোন পার্থক্য সৃজিত হয়নি। লিপিকরের অনবধানতা বশতঃ কয়েকটি অংশের এখানে ওখানে বিলুপ্তি ছাড়া কোথাও উল্লেখ্য কোন পার্থক্য নেই। দুটি পুথির ভণিতাংশে যে পার্থক্য পাওয়া গেছে, তা এই রকম—

১। ক—রচিয়া বিলাপ কহে শ্রী দ্বারিকা দাস (পৃ ২১)
খ—শচীর বিলাপে কহে দ্বারকার দাস।

২। ক—দ্বারিকা দাসেতে বলে সনকা চরণতলে
অধিকে দুগুণে বাড়ে দুখ। (পৃ ১৬)
খ—দ্বারিকা দাসেতে ভণে শুনিয়া বেহুলা মনে
অধিকে দুগুণে বাড়ে দুখ।

এই ধরণের পার্থক্য যে আলোচনার যোগ্য নয়, তা বলাই বাহুল্য।

কবির আত্ম-পরিচিতি কাব্যটির মধ্যে কোথাও বর্ণিত হয়নি। মঙ্গল কাব্য ধারায় এ একটি বিরল ব্যতিক্রম। কাব্য রচনার স্থান সম্পর্কে দু'টি ভণিতায় কিছু তথ্য আছে। সেদুটি ভণিতা এবং কবির আত্ম-পরিচিতির অনুপস্থিতি সম্পর্কে পরে আলোচনা করা যাবে।

কবি প্রসঙ্গ

দ্বারিকা দাসের মনসামঙ্গলটির ভাষা অষ্টাদশ শতকের পূর্ববর্তী মধ্যবাংলার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, অথচ ঐ সময়ের ঐ নামধারী কোন বাঙালী কবির সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি। শুধু মনসামঙ্গল কেন, কোন প্রকার বাংলা কাব্য রচয়িতা হিসেবে দ্বারিকা দাসের নাম অজ্ঞাত। কাব্যটির ভাষা সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে মধ্যবাংলার সঙ্গে বেশ কিছু ওড়িয়া শব্দের সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। সূত্র সন্ধানের জন্যে তাই উড়িষ্যার তাৎকালিক কবিদের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়।

অনুসন্ধানে জানা যায় যে, সপ্তদশ শতকে উড়িষ্যায় ঐ নামে একজন শক্তিমান কবি ছিলেন। তাঁর কবিপ্রতিভা সর্বস্বীকৃত এবং ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাস-গুলিতে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট। রামায়ণ ও ভাগবতের অনুবাদ ছাড়া প্রেমরস চন্দ্রিকা, শিবপুরাণ, পরচে গীতা, গুপ্ত গীতা, ব্রহ্মমুদ্গার, তত্ত্বচূড়ামণি, ভক্তিরসামৃত, ছ'পঈ

ন'পঙ্গ, তের পঙ্গ প্রভৃতি বহুকাব্য গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে এই কবি বিখ্যাত। উড়িষ্যা রাজ্য প্রদর্শশালার পুথি বিভাগে উল্লিখিত অধিকাংশ কাব্যের পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হয়েছে।

শুধু দ্বারিকা দাস নামে কোন কবির পরিচয় জানা নেই বা তাঁর রচনায় ওড়িয়া শব্দের সংমিশ্রণ আছে বলেই নয়, তাঁর নামের বানানটিও উড়িষ্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের অন্যতম কারণ। দ্বারিকা এবং দ্বারকা, হু'টি শব্দই ব্যাকরণসম্মত। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক বাঙালীরা দ্বারকা, দ্বারকানাথ, দ্বারকাপ্রসাদ প্রভৃতি নাম ব্যবহারে অভ্যস্ত। অন্য পক্ষে দ্বারিকা নামটিই উড়িষ্যায় বহু ব্যবহৃত।

ওড়িয়া সাহিত্যের সমালোচকদের মধ্যে এই কবি সম্পর্কে ডঃ আর্তবল্লভ মহান্তীর আলোচনাটি[১] গবেষণাধর্মী, বিশদ এবং নির্ভরযোগ্য। কবির 'পরচে গীতা' নামক ক্ষুদ্র কাব্য গ্রন্থটি সম্পাদনা প্রসঙ্গে ডঃ মহান্তী কবি সম্বন্ধে বহু তথ্যের উল্লেখ করেছেন।

দ্বারিকা দাস তাঁর শিব পুরাণের মধ্যে বলেছেন যে 'মুকুন্দদেবংক দুই অংকে' তাঁর জন্ম হয়। রাজা মুকুন্দ দেব ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই বিচারে ডঃ মহান্তী কবির জন্ম ঐ ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল বলেই মত প্রকাশ করেছেন।

'অনাকার সংহিতা', রচয়িতা নন্দ দাসের মতে কবি দ্বারিকা দাসের জন্ম ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে। কবি 'শিব পুরাণের' মধ্যে গ্রন্থ সমাপ্তির যে কাল নির্দেশ দিয়েছেন তাতে জানা যায় যে ঐ কাব্য রচনার সমাপ্ত ঘটে ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে। স্বভাবতই নন্দ দাসের উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা। বিনায়ক মিশ্রের মতে কবির জন্ম ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি এই অভিমতের সমর্থনে কোন যুক্তি উপস্থিত করেননি। ওড়িয়া সাহিত্যের অন্যতম ইতিহাস রচয়িতা পণ্ডিত সূর্যনারায়ণ দাস ডঃ মহান্তীর মত সমর্থন করে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দ-টিকেই কবির জন্মবর্ষ বলে চিহ্নিত করেছেন।

কবি শিব পুরাণে খোর্দা রাজবংশের বিবরণ দিয়ে বলেছেন যে তিনি রাজা বীরকেশরীকে রাজ্যে অভিষিক্ত হতে দেখেছেন। সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতার সাধারণ ভাবে ইতিহাসের সাল তারিখ মিলিয়ে বীরকেশরীর রাজ্যারোহণ

(১) ডঃ আর্তবল্লভ মহান্তী সম্পাদিত 'পরচে গীতা'; প্রাচী সমিতি, কটক; ১৯২৯; ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য।

১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল বলেছেন। এবিষয়ে ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব[১], ডঃ এন, কে, সাহু[২] ও কেদারনাথ মহাপাত্রের[৩] ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে আমাদের প্রয়োজনীয় কালসীমার রাজবংশাবলীটি এই রকম—

মুকুন্দ দেব — — — — ১৬৫৭ — ১৬৮৯
দিব্যসিংহ দেব — — — ১৬৮৯ — ১৭১৫
হরেকৃষ্ণ দেব — —— ১৭১৭ — ১৭১৯
গোপীনাথ দেব — —— ১৭১৯ — ১৭২৭
রামচন্দ্র দেব — — — ১৭২৭ — ১৭৩৭
বীরকেশরী দেব — —— ১৭৩৭ — ১৭৯৩

এরপর বীরকেশরী দেব সম্পর্কে ডঃ মহতাবের অভিমতটি[৪] হোল —

" At the time of the death of Ramchandra Deva his son and successor, Virakesari Deva was taking shelter in the Gumsar estate under the protection of Chana Bhanja. But he got back the throne of Khurda in 1739 after making negotiation with Sarafraj Khan, the Nazim of Bengal through his trusted officer Brndavana Kumara Guru Mahapatra, the Parichha of the State."

অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে কবি দ্বারিকা দাস ১৬৫৯ থেকে অন্ততঃ ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

কবি রচিত' 'পরচে গীতা' র উপসংহার অংশে পাওয়া যায় —

শূদ্র কুলরে মু হইলি জাত।
রামদাস মোর অটই তাত।
সিন্ধু কুলরে ধূলিসর গ্রাম।
সেইঠারে মোর মঠ উদ্যান॥
দ্বারিকা দাস যে নাম মোহর।
চৌতিশা চৌপদী কলি বিচার॥

1. Dr. H. K. Mahtub, The History of Orissa, Vol. II, Ist. Edn. 1960
2. Dr. N. K,Sahu, Ed.; A Hitory of Orissa, Vol II, Ist. Edn. 1956
৩ কেদারনাথ মহাপাত্র. খুরুদা ইতিহাস (১৫৬৮—১৮১৯), ১৯৬৯
4. Dr. H. K. Mahtab, The Histo ry of Orissa, Vol. II, Ist Edn. 1960, P 68

(আমার জন্ম শূদ্র বংশে এবং আমার পিতার নাম রাম দাস। সিন্ধু নদীর তীরে ধূলিসর গ্রামে আমার একটি উদ্যানবেষ্টিত মঠ আছে। আমার নাম দ্বারিকা দাস এবং আমি চৌতিশা, চৌপদী প্রভৃতি ছন্দে কাব্য রচনা করেছি।)

শিব পুরাণের মধ্যে আছে —

শূদ্রকুলে মুহি হইলি জাত।
নারায়ণ শিষ্য রাম দাস সুত॥

(আমি শূদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করেছি। আমার পিতামহের নাম নারায়ণ দাস এবং পিতার নাম রাম দাস।)

কবি বর্ণিত তথ্যগুলিকে একত্রিত করলে এই দাঁড়ায় যে, কবি শূদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতা ও পিতামহের নাম ছিল যথাক্রমে রাম দাস ও নারায়ণ দাস। সিন্ধু (সিন্ধু—সিড়ু—কাঠজুড়ী নদীর একটি শাখা বিশেষ) নদীর তীরে ধুলিসর (এখন 'জগৎপুর' নামে পরিচিত) গ্রামটিতে তাঁর উদ্যানবেষ্টিত একটি মঠ ছিল। ডঃ আর্তবল্লভ মহান্তী কটক প্রাচী সমিতির অনুরোধে যখন 'পরচে গীতা'র সম্পাদনা করেন, তখন কবির সপ্তম পুরুষ জীবিত ছিলেন। তাঁদের সহায়তায় ডঃ মহান্তী কবির যে বংশলতিকাটি প্রস্তুত করেন তা হোল এই —

নারায়ণ দাস
|
রামদাস
|
দ্বারিকা দাস
|
ভক্তচরণ
|
কল্পতরু
|
জগবন্ধু

- রামধনী
  - রাধাকৃষ্ণ
    - গোবিন্দচন্দ্র
      - গোপীনাথ
      - জগন্নাথ
- রাঘব
  - চক্রধর *
- সাধুচরণ
  - নারায়ণ *
- রামহরি
  - পুরুষোত্তম *
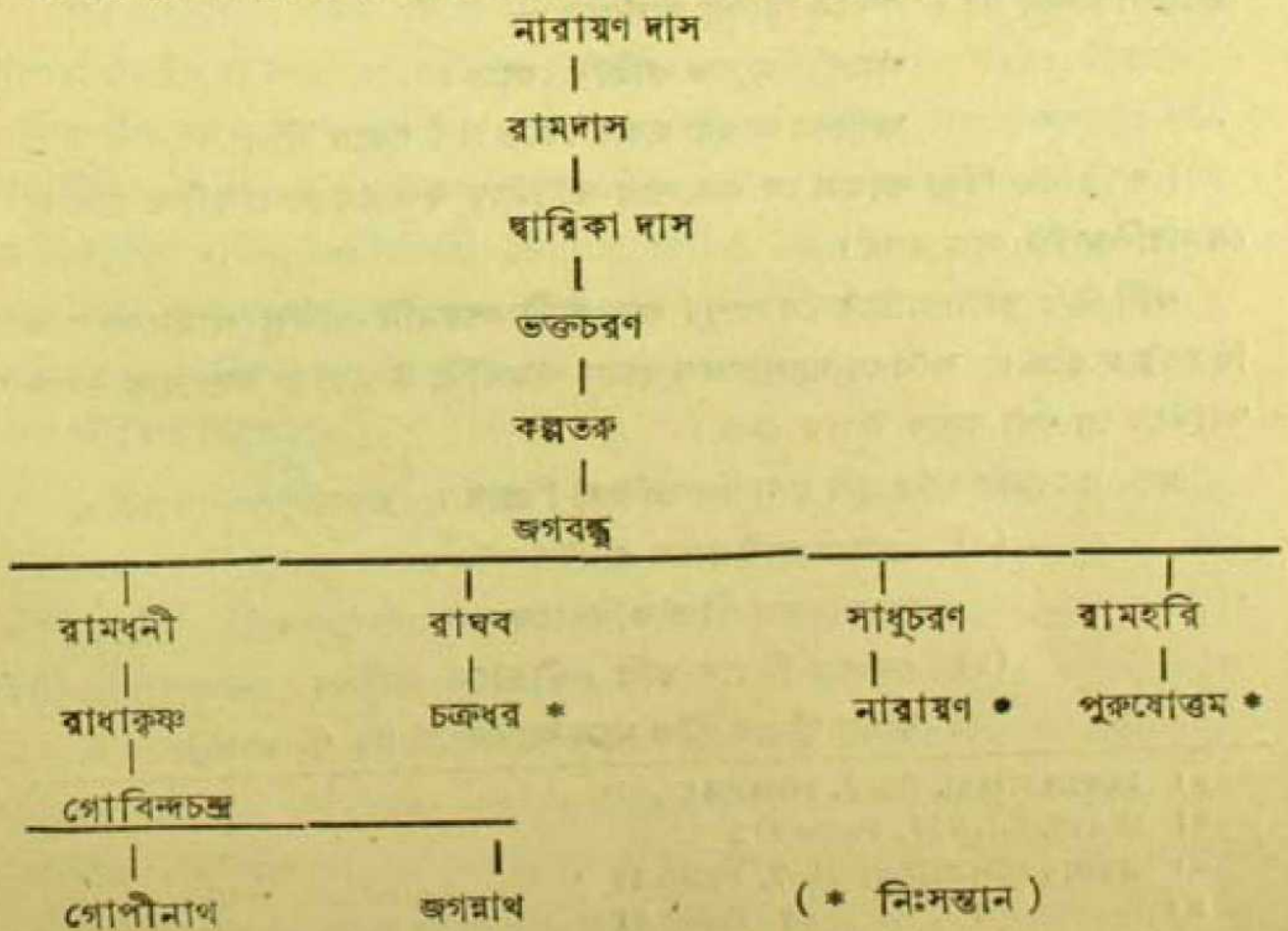
(* নিঃসন্তান)

কবির নামটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনায় বলা হয়েছে যে এটি উড়িষ্যায় প্রচলিত রীতির দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রদর্শশালায় কবি-রচিত কাব্যগুলির যে ক'টি পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে সেগুলিতে 'দ্বারিকা' নামটিই ব্যবহৃত হয়েছে। 'পরচে গীতা'র উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে এবং সেখানেও দ্বারিকা নাম পাওয়া গেছে। আরও কয়েকটির ভণিতা এই রকম —

(ক) শুন সুজনে এহু প্রেম রস।
ভাবরে ভণিলে দ্বারিকা দাস ॥[১]

(খ) কহই দ্বারিকা পামর।
গুপ্ত জ্ঞান পরিচার ॥[২]

(গ) কহই হীন দ্বারিকা পামর।
সুজ্ঞ জনমানে হেতুরে ধর ॥[৩]

(ঘ) অষ্টম পটল হেলা সম্পূর্ণ।
কহই অধম দ্বারিকা হীন ॥[৪]

কবি-রচিত কাব্যগুলির মধ্যে কয়েকটির নাম ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। 'পরচে গীতা'র মধ্যে স্বীয় কাব্যসমূহের নাম বর্ণনা করেছেন কবি ঠিকই, কিন্তু সে তালিকা সম্পূর্ণ নয়। তিনি নিজেই বলেছেন —

আহরি অনেক কহিবি কেতে।
দ্বারিকা ভাবনা হৃদয়ে যেতে ॥ (পরচে গীতা)

(দ্বারিকার চিন্তা ভাবনা যে কত আর তা নিয়ে কত যে কাব্য রচিত হয়েছে, সে সবকিছু কি করে বলব।)

কবি তাঁর তালিকাটিকে যে সম্পূর্ণ বলে দাবী করেননি এ কিন্তু আমাদের পক্ষে হিতকর হয়েছে। কবি যে মনসামঙ্গল রচনা করেননি, উপরোক্ত বক্তব্যের দিকে তাকিয়ে সে কথা বলার উপায় নেই।

এখন মনসামঙ্গলটির দুটি মূল্যবান ভণিতা বিচার্য। সেগুলি —

(১) শুমগড় নন্দীগ্রামে এ গীত বর্ণন।
মনসামঙ্গল গীত কবিরাজে কন ॥ (পৃ, ৯২)

(২) কেকড়ে নিবাস করি নন্দীগ্রামে আসি।
রচিলু তুমার গীত মনে অভিলাষি ॥ (পৃ. ১৬৮)

১। প্রেমরস চন্দ্রিকা, OL 7, Folio 41
২। ভাগবত, OL 857, Folio 112
৩। ব্রহ্মজ্ঞান পটল মালিকা OL 7, Folio 11
৪। ঐ ঐ Folio 41

গুমগড় এবং নন্দীগ্রাম মেদিনীপুর জেলার দুটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এই অঞ্চলে মনসার ভাসান গান এখনো শোনা যায়। পট দেখিয়ে গায় বলে গায়কদের স্থানীয় নাম 'পটিদার', কিন্তু এদের পদবী 'চিত্রকর'। কবি যে বহিরাগত ছিলেন তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত 'আসি' অসমাপিকা ক্রিয়া পদটির মধ্যে নিহিত আছে। কিন্তু 'কেরুড়' নামে কোন গ্রামের সন্ধান ঐ অঞ্চলে পাওয়া যায়নি। নন্দীগ্রাম থানার কিছু অংশ 'কেওড়ামাল' পরগনার অন্তর্ভুক্ত। অনুমিত হয় যে, ঐ পরগনার সংক্ষিপ্ত কবিদত্ত নাম 'কেউড়', লিপিকর প্রমাদে 'কেরুড়' এ পরিণত হয়েছে।

কবি দ্বারিকা দাসের মেদিনীপুর যাওয়া বা নন্দীগ্রামে বসতি স্থাপন করা যে অসম্ভব ছিল না, এই অনুমানের পক্ষে আরও দু'টি যুক্তি আছে। কবি ধূলিসর গ্রামে অবস্থিত তাঁর মঠের উল্লেখ করেছেন, বাসস্থানের উল্লেখ করে নি। প্রকৃতপক্ষে তিনি গৃহী সন্ন্যাসী ছিলেন। এ আলোচনা ডঃ মহান্তী করেছেন এবং স্বীয় মতের সমর্থনে কবি-রচিত 'সপ্ত পঙ্গ' কাব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন[১]। উদ্ধৃতিটিতে কবি নিজেকে 'নিরঙ্ক দ্বারিকা' অর্থাৎ গৃহহীন ব্যক্তি বলে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় যুক্তিটি হোল এই যে, সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে বা অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে কটক থেকে মেদিনীপুর যাওয়ার অর্থাৎ উড়িষ্যার বাইরে যাওয়া বোঝাতো না। মেদিনীপুর উড়িষ্যা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে। ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে মারাঠারা বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার বিস্তৃত ভূখণ্ডে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। নেতাকে হত্যা করার পরও যখন অবস্থার উন্নতি হোল না, তখনি তাদের সঙ্গে সন্ধির অন্যতম শর্ত হিসাবে, উড়িষ্যা প্রদেশটিকে মারাঠাদের হাতে তুলে দেন, বঙ্গদেশের তদানীন্তন শাসনকর্তা আলিবর্দী খাঁ। বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার সীমারেখা নির্দিষ্ট হয় নদী সুবর্ণরেখা। এই বিভাজনের সময় অবশ্যই দ্বারিকা দাস জীবিত ছিলেন না।

কবির পরিচয় প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত যেসব তথ্য উপস্থিত হয়েছে, তারই ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্তে আসা যায় তা হোল, আলোচ্য মনসামঙ্গলের কবি দ্বারিকা দাস এবং সপ্তদশ শতকের ওড়িয়া কবি দ্বারিকা দাস একই ব্যক্তি। ইনি সাময়িক ভাবে মেদিনীপুর গিয়ে নন্দীগ্রাম অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। ঐখানে থাকার সময় তিনি মনসামঙ্গল রচনার জন্য অনুপ্রাণিত হন এবং পূর্ব ভারতে বহু প্রচলিত বেহুলা-লখিন্দর কাহিনীটি নিয়ে কাব্য রচনা করেন। মূল কাব্যের লিপিরূপ কী ছিল তা নিশ্চয় করে বলা সম্ভব নয়, তবে ধরে নেওয়া

১। ডঃ আর্তবল্লভ মহান্তী সং পরচে গীতা, প্রাচী সমিতি, ১৯২৯, পৃঃ ১০

যায় যে, তা ছিল ওড়িয়া। বাংলা হরফে যদি ওড়িয়া ভাষার ভাগবতের অনুবাদ তৈরি হতে পারে (সনাতন বিদ্যাবাগীশ কৃত 'ভাষাবন্ধ ভাগবতে'র অংশ বিশেষ) তাহলে ওড়িয়া হরফে মনসামঙ্গল রচনায় বাধার প্রশ্ন অবান্তর।

দ্বারিকা দাস দীর্ঘজীবী কবি ছিলেন। বহু কাব্য ও প্রচুর ভজন ইত্যাদি রচনার পর পরিণত বয়সে পরিশীলিত কবি-প্রতিভার অধিকারী এই সাধু প্রকৃতির মানুষ, বাংলা ভাষায় মনসামঙ্গল কাব্য খানি রচনা করেন। নন্দীগ্রাম অঞ্চলে 'মনসার ভাসান' গান খুবই জনপ্রিয় ছিল। সাম্প্রতিক কালেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। কবির কাব্যখানিও মূলতঃ গীতোদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল এবং কবি আপন কাব্যখানিকে আসরে গীত হতে শুনেছেন। এই উক্তিগুলির সমর্থনে কবির কাব্য থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া গেল—

জয় বিষহরী ঈশানকুমারী।
সৃষ্টি স্থিতি সংহারিনী তুমি দয়াধারী ॥
সেবকের আশা পুরগো মনসা।
উরগো আসরে মোর দুর্গতি বিনাশা ॥
চরণে শরণ আমি অভাজন
জানিয়া করিবে কৃপা যে জানে আপন ॥
সংগীত তোমার ব্যাপিত সংসার।
বর্ণিতে বাসনা কিছু হইল আমার ॥
ভাবি পদতল ভরসা কেবল।
অধিষ্ঠাত্রী হৈয়া কহ আপনা মঙ্গল ॥ (পৃঃ ৪)

ইতিহাসের পটভূমিকা

উড়িষ্যার রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গেই শুধু নয় তার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গেও বঙ্গদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন ও নিগূঢ়। সুদূর অতীতে কাঁশাই নদী (কপিশা) আর বৈতরণী নদীর (জাজপুরের নিকটবর্তী) মধ্যবর্তী মেদিনীপুর ও বালেশ্বর জেলার কিয়দংশকে 'উৎকল' বলা হোত। অন্য দিকে বৈতরণী থেকে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড 'কলিঙ্গ' নামে খ্যাত ছিল।

খ্রী পূঃ ৪র্থ শতকে মহাপদ্ম নন্দ কলিঙ্গ অধিকার করেন। কলিঙ্গ অশোকের অধিকারভুক্ত হয় খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে। মগধ সাম্রাজ্যের পতনের পর খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতকে কলিঙ্গে আর্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। মহাপরাক্রান্ত খারবেল

এই বংশের তৃতীয় নরপতি। চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত কলিঙ্গ গুপ্ত রাজবংশের অধিকারে ছিল। গুপ্তবংশের পতনের পর অল্পকাল কয়েকটি রাজবংশ স্বাধীনভাবে উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন কিন্তু সপ্তম শতকের সূত্রপাতেই মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কর্ণসুবর্ণের গৌড়রাজ, গঞ্জাম জেলা পর্যন্ত অধিকার বিস্তৃত করেন॥ আনুমানিক ৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধ ভৌমকর বংশের শক্তিবৃদ্ধির ফলে উড়িষ্যায় আর একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হয়। এঁদের অধিকৃত ভূখণ্ডের নাম ছিল 'তোসলা' বা 'তোসলি'। আদিমধ্য যুগে এই তোসলার বিস্তৃতি ছিল মেদিনীপুর থেকে গঞ্জাম।

অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গদেব ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১১৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিঙ্গনগর থেকে কটকে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। শক্তিশালী যোদ্ধা আর দক্ষ রাজনীতিবিদ রূপে ইনি ইতিহাসে সুনির্দিষ্ট স্থানের অধিকারী। তাছাড়া ইনিই পুরীধামে লক্ষ্মী ও জগন্নাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

গঙ্গরাজবংশের চতুর্থ ভানুদেবের মৃত্যু হয় ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। এইখানেই গঙ্গরাজবংশের বিলুপ্তি ঘটে। এরপর উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহন করেন কপিলেন্দ্রদেব। এই বংশের তৃতীয় নরপতি প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালে (১৪৯৭-১৫৪০ খ্রী:) শ্রীচৈতন্যদেব উড়িষ্যায় আসেন এবং প্রকটকালের শেষ আঠারো বছর নীলাচলে অবস্থান করেন।

উড়িষ্যা আফগানদের হস্তগত হয় ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আফগান শাসনকর্তা দাউদ খাঁ নিহত হন এবং উড়িষ্যার আফগান অধিকৃত অঞ্চল মোগলরা দখল করেন। বাকী অংশটুকু অধিকার করবার জন্যে মানসিংহ দু'বার (১৫৯০, ১৫৯২ খ্রী:) উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। বলাবাহুল্য যে, আফগান এবং পরবর্তী কালে মোগলরা একই সঙ্গে বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার বিস্তৃত অঞ্চলের কর্তৃত্ব করেছেন।

আলিবর্দীর সময় ইতিহাসের পট পরিবর্তিত হয়। ইনি বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার শাসনকর্তা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম কয়েক বছর শান্তিতে অতিবাহিত করার পর মারাঠাদের সঙ্গে তাঁকে বিবাদে লিপ্ত হতে হয়। ইতিমধ্যে উড়িষ্যায় মারাঠারা অনুপ্রবেশ করেছিল এবং ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকৃতপক্ষে তারাই উড়িষ্যার শাসন কর্তৃত্ব দখল করেছিল। এদের নেতা ভাস্কর পণ্ডিতকে আলিবর্দী মুর্শিদাবাদে ডেকে পাঠান, সন্ধির শর্তাবলী আলোচনা করবার জন্যে এবং সেখানে ভাস্কর পণ্ডিত নিহত হন। এতে

মারাঠাদের সঙ্গে আলিবর্দী খাঁর সংঘর্ষ বহু পরিমাণে বেড়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত রঘুজী ভোঁসলের সঙ্গে তাঁকে সন্ধি করতে হয়। এই সন্ধির অন্যতম শর্ত হিসাবে মারাঠারা বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করে এবং উড়িষ্যার শাসন কর্তৃত্ব তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই সময় বঙ্গদেশ আর উড়িষ্যার সীমারেখা রূপে সুবর্ণরেখা নদী নির্দিষ্ট হয়। এ প্রসঙ্গটি সংক্ষেপে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

উড়িষ্যার এই রাজনৈতিক ইতিহাসের পতন ও অভ্যুদয়ের সঙ্গে বঙ্গদেশ বহু প্রাচীনকাল থেকেই সঙ্গী হয়ে থেকেছে। এইজন্যেই বলা হয়েছে যে, উড়িষ্যার রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার ফলে একটি সমন্বয়-মূলক সাংস্কৃতিক ইতিহাসও এই দুটি রাজ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। মধ্য-দ্বাদশ শতকে অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গদেবের নীলাচলে জগন্নাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠার পর এই সাংস্কৃতিক ঐক্য নতুনভাবে অর্থান্বিত হয়ে ওঠে। পুরীধাম তখন শুধু বাঙালীদেরই নয়, ভারতবর্ষীয় হিন্দুদের এবং সমগ্র পৃথিবীর কলারসিকদের তীর্থে পরিণত হয়।

নীলাচলের জগন্নাথদেবকে কেন্দ্র করে যে সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ নতুন করে অনুভূত হয়েছিল, শ্রীচৈতন্যদেব এখানে আসার ফলে তাতে অসামান্য প্রাণবেগ সঞ্চারিত হোল। অখণ্ডজীবনাশ্রিত বৈষ্ণবধর্ম সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষকে ভক্তি আর বিশ্বাসের স্বর্ণশৃংখলে বন্দী করে ষোড়শ শতকে উৎকল-বঙ্গ সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ পৃথক মর্যাদা দান করেছিল। কিন্তু তাই বলে এই ঐশী উপলব্ধি শুধু মাত্র ধর্মচেতনার মধ্যেই সীমিত ছিল না। কাব্যে, দর্শনে, জীবনীসাহিত্য রচনায় এর সর্বব্যাপী প্রভাব আজও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অম্লান হয়ে আছে।

জাতীয় জীবনের এই অধ্যায়ে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যে সমপ্রাণতা আর উচ্চকোটির আদর্শবাদ দেখা দিয়েছিল তা অবিস্মরণীয়। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে ধর্মালোচনা, নামসংকীর্তন, ধর্মগ্রন্থ পাঠ প্রভৃতির প্রয়োজনে উড়িষ্যার ভক্তসম্প্রদায়ের পক্ষে স্বাধীনভাবে বাংলা ভাষার চর্চা ও তাতে কিছু পরিমাণে দক্ষতা অর্জন প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। মধ্য—দ্বাদশ শতকে যে চর্চার বিকাশ ঘটেছিল, তার ফলবান রূপ দেখা গিয়েছিল সপ্তদশ আর অষ্টাদশ শতকে। ষোড়শ শতকে বঙ্গভাষার এই অনুশীলন সুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করেছিল বলেই পরবর্তী দুটি শতকে তার বিবর্ধন সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল। আবার এটিও লক্ষণীয় যে, অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদ থেকেই বঙ্গভাষার চর্চা তার

অন্তর্নিহিত প্রেরণাটি হারিয়ে ফেলে আর উনবিংশ শতকে এসে সেটি প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড উড়িষ্যায়ও রাজদণ্ডে পরিণত হয়েছে এবং বহুপূর্বে এই রাজ্যে তাদের অনুপ্রবেশ ঘটলেও এর শাসনকর্তৃত্ব তারা গ্রহণ করে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর। নবজাগরণের অন্যতম লক্ষণরূপে ভারতীয় ভাষার প্রতি সাময়িক অনাসক্তি দেখা গেল। এর ফল ভালো কি মন্দ হয়েছিল তা এক্ষেত্রে আমাদের বিচার্য নয়। তবে একথা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই যে নবজাগরণ আমাদের সংস্কৃতিকেন্দ্রিক ক্রিয়াকাণ্ডকে সেদিন ভিন্নমুখী করে তুলেছিল।

ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যে ওড়িয়া কবিদের বাংলা কাব্য প্রচেষ্টার কথা আগেই বলা হয়েছে। সেই নিদর্শনগুলির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, সপ্তদশ আর অষ্টাদশ শতকেই তার সংখ্যাধিক্য। ষোড়শ শতকের সৃষ্টিমূলক প্রচেষ্টাও যে সীমাবদ্ধ ছিল তা সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা দেখেই বোঝা যায়। নবজাগরণের প্রভাব প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পারস্পরিক হৃদ্য সম্পর্কের পটভূমিতে যে চিন্তার বিস্তৃতি ঘটেছিল, নবজাগরণের পরিবর্তিত মূল্যবোধের প্রবল স্রোতোধারায় তা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রবর্তিত রাধারসতরঙ্গিত প্রেমধর্মের প্রভাবটিও স্তিমিত হয়ে এসেছিল। ইতিহাসের-ঘটনা প্রবাহ সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী হোল উনবিংশ শতকে। যে কারণগুলির সমবায়ে ষোড়শ শতকে ওড়িয়া কবিদের অন্তরে বাংলা কাব্য রচনার প্রেরণা সৃজিত হয়েছিল, পল্লবিত হয়ে উঠেছিল সপ্তদশ আর অষ্টাদশ শতকে, ইতিহাসের ধারা-পরিবর্তনে উনিশ শতক থেকে তার বিলুপ্তি ঘটল।

কাব্য-কাহিনী

দ্বারিকা দাস তাঁর কাব্যের পরিধিটিকে শুধুমাত্র বেহুলা-লখিন্দর কাহিনীর মধ্যে আবদ্ধ রেখেছেন। এ কাহিনী পূর্ব ভারতে বহুপ্রচলিত। দ্বারিকা দাস, যে কারণেই হোক, কোন পালা এর সঙ্গে যুক্ত করেননি। এর ফলে কাব্যটির মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে কিনা, তা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

কাহিনীর সূত্রপাত দেবী মনসার সর্পাভরণের বর্ণনা দিয়ে। কবি প্রাচীন ভঙ্গীতে দেবী আবাহান করে কাব্যের সূচনা করেছেন —

প্রথমে তু করপুটে বিষহরী উর ঘটে
কৃপা কর সাগর দুহিতা।

রাখিয়া সংগীতে মন ভাকে তোমায় অভাজন
বর্ণিবারে তব কিছু কথা ॥ (পৃঃ ৩)

দ্বিতীয় অধ্যায়েই দেখা যায় চাঁদ সদাগর সাতটি বাণিজ্য-তরী সাজিয়ে নিয়ে চলেছেন সৌভাগ্যের সন্ধানে। নিপুণভাবে পথের বর্ণনা দেবার পর পট-পরিবর্তিত হোল। মনসা চাঁদের যাত্রা পথ বিপৎসঙ্কুল করে তুলতে চাইলেন। চিরকালের মন্ত্রণাদাত্রী নেতু পরামর্শ দিলেন—'হনুমানে মনে কর চাপু গিয়া নায়'। আয়োজনের কোন ত্রুটি রইল না। একদিকে প্রবল ঝড় বৃষ্টি, অন্য দিকে হনুমানের প্রচণ্ড প্রতাপ। ব ণিজ্য তরীগুলি নিমজ্জিত হোল।

মনসার আপন স্বার্থেই চাঁদকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। অকূল সমুদ্রে চাঁদকে রক্ষা করবার জন্যে মনসা সাহায্য প্রেরণ করলেন কিন্তু সে সাহায্য প্রত্যাখ্যা-করলেন চাঁদ। প্রাণপণ চেষ্টা করে তীরে এসে উঠলেন চাঁদ সদাগর। মনসা ছদ্মবেশে এসে দেখা করলেন চাঁদের সঙ্গে, পরামর্শ দিলেন, 'পর গিয়া শ্মশানের কানি'। আর ও বললেন, 'ঝুলা করি বাম করে, মেগে খাও ঘরে ঘরে'। কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি এত সহজে চাঁদের জীবন যাপনের পক্ষে সহায়ক হোলনা। সেখানেও বাধা প্রচুর, 'কেহ খেপাইয়া মারে, কেহ খিল দেয় ঘরে'—কিন্তু 'কেহ ধান্য দেয় স্থালে, কেহ দেয় ছিন্ন পরিধান'। চাঁদ একটি কুঁড়ে ঘরে থাকেন আর ভিক্ষালব্ধ ধান-চাল ওইখানে সঞ্চিত রাখেন। মনসা এবার গণেশের ইঁদুরটিকে চেয়ে এনে তারই সাহায্যে সব সঞ্চয় নষ্ট করালেন। ইঁদুর চাঁদের ছিন্ন বস্ত্র-খণ্ডটুকুও রেখে গেলনা।

আবার পথে বেরুলেন চাঁদ সদাগর। ব্যাধেরা পাখী ধরবার জন্যে ফাঁদ পেতে বসে আছে। আপন দুর্ভাগ্যের চিন্তায় অন্যমনস্ক চাঁদ গিয়ে পড়লেন ওখানে। পাখী উড়ে গেল আর চাঁদ ব্যাধেদের কাছে অপমানিত হলেন। এরপর চাঁদ সদাগর পুরাতন বন্ধু ধর্মদাসের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হলেন। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা জানিয়ে বন্ধুর সহায়তা প্রার্থনা করলেন তিনি কিন্তু তাঁর জানা ছিল না যে বন্ধু মনসার ভক্ত। ওখানে মনসা সম্পর্কে অশ্রদ্ধেয় উক্তি করার ফলে বন্ধুর বিরাগ ভাজন হলেন তিনি এবং সে আশ্রয় থেকেও বিতাড়িত হলেন।

একদল কাঠুরে চলেছে বনে। চাঁদের মনে হোল জীবিকা হিসেবে এটি অত্যন্ত নিরাপদ। কিন্তু মনসার খরদৃষ্টি সেখানেও তাঁকে অনুসরণ করে চলেছিল। বন থেকে বহু কষ্টে কিছু কাঠ মাথায় নিয়ে ফিরছেন চাঁদ, মনসা হনুমানকে

আদেশ করলেন, 'কাষ্ঠের মাঝে চাপ অল্প করি'। দেবীর আদেশে হনুমান, 'বাম হস্ত তুলি দিল চান্দের বোঝায়, পর্বত জিনিয়া যেন পড়িল মাথায়'। কাঠের বোঝা ফেলে দিয়ে চাঁদ সে যাত্রা রক্ষা পেলেন। আবার শুরু হোল জীবিকার সন্ধান। গিয়ে পৌছলেন এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে। প্রার্থনা জানালেন—

কৃপা করে রাখ মোরে শুন দ্বিজবর।
সদাকর ছিলাম অবে হইব কিংকর॥ (পৃ ১৮)

ব্রাহ্মণ পুত্রস্নেহে তাঁকে আশ্রয় দিলেন আর তাঁর ক্ষেত থেকে আগাছা পরিষ্কার করবার কাজ দিলেন। 'ধান্য বাছে কোন ভাবে সাধু নাই জানে' অতএব 'ধান্য উপাড়িয়া যায় রাখি যায় তৃণে'। ফলে যা হবার তাই হোল। নির্যাতিত এবং আশ্রয় থেকে বিতাড়িত হলেন চাঁদ।

এইখানে এসেছে নীলাম্বর আর ছায়ার উপাখ্যান। মূলতঃ চণ্ডীমঙ্গলে ব্যবহৃত এই দুটি চরিত্রকে দ্বারিকা দাস নতুন কাহিনীর ভেতর দিয়ে নিয়ে এসেছেন। ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর নৃত্যপটু। দেবসভায় তার নৃত্য দেবগণকে পরিতুষ্ট করেছে। শিব মহা আনন্দে নীলাম্বরের গলায় হাড়ের মালা পরিয়ে দিলেন। শিব খুশী হয়ে দিলেন ঠিকই কিন্তু ঐ বিশেষ মালাটি প্রাপকের কাছে প্রীতিকর মনে হোল না। শিব নীলাম্বরের মনের কথা বুঝতে পেরে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হলেন, অভিশাপ দিলেন—

আভরণে সুখভোগ বাসনা তোমার।
পৃথিবীতে জন্ম লভ বণিকের ঘর॥ (পৃ ২০)

নীলাম্বর ভস্ম হলেন তাঁর পত্নী ছায়া সহমৃতা হলেন। 'ইন্দ্রের নগর বেড়ি উঠিল ক্রন্দন'। শচী এসে শিবের কাছে আবেদন জানালেন, 'দেবলোকে থাকু কথা, খড়্গে কাট মোর মাথা, ঘুঁচু মোর মনের সন্তাপ'। শূলপাণি বললেন, 'ভস্ম হৈল যার তনু, পুনর্বার জন্ম বিনু, না পাইবা আপনা নন্দন। এই নীলাম্বর আর ছায়া মনসার সহায়তায় মর্ত্যে এসে অমলা আর সনকার কোলে বেহুলা লখিন্দর হয়ে জন্ম নিলেন।

লখিন্দর চাঁদ সদাগরের সপ্তম পুত্র। বহু কষ্টভোগের পর চাঁদ গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। এই প্রত্যাবর্তন মুহূর্তটিকেও মনসা চাঁদকে যন্ত্রনা দেবার কাজে ব্যবহার করেছেন। সমস্ত অপমান আর দৈহিক পীড়ন সহ্য করে চাঁদ ঘরে এসে সপ্তম পুত্রের মুখদর্শন করলেন।

'মনসার মায়া হৈতে, চতুর্দশ বরসেতে, প্রবেশিল সাধুর নন্দন'—অতএব সনকা পুত্রের বিবাহের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। এরপর কাহিনী আরও দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়েছে। কুল পুরোহিত জনার্দন উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধানে সায় সদাগরের বাড়ী গিয়ে বেহুলাকে নির্বাচন করে এলেন। চাঁদ এই প্রস্তাব মেনে নিয়ে গেলেন কথা পাকা করে আসবার জন্যে। দৈবজ্ঞ কোষ্ঠী দেখলেন কিন্তু দৈবী মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে সত্য গোপন করে বললেন, 'ভাল বটে'। বিবাহের দিনক্ষণ স্থির হবার পর মনসা.

শ্বেতমাছি রূপ ধরি চান্দের মস্তকে।
অঙ্গে বস্যা বিপরীত বুদ্ধি দিল তাকে ॥ (পৃ ৩৪)

চাঁদ বললেন,

লুহার কলাই যদি সিজাইতে পারে।
তবে পুত্র বিভা করাইব সে পুত্রীরে ॥ (পৃ ৩৪)

সায় সদাগর খুব অপমানিত বোধ করলেন কিন্তু বেহুলা সহজ ভাবেই এই পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন; বলা বাহুল্য তিনি সসম্মানে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হলেন।

এবার লখিন্দর-বেহুলার বিবাহের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন চাঁদ। তিনি জানেন, মনসা তাঁর সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করবার জন্যে তৎপর চাঁদ তাই স্থির করলেন—

সাতালি পর্বতে বাসর করি।
পুত্র বধূ তাতে রাখিব পুরি ॥
না রাখিব সন্ধি লোহার ঘরে।
পিপীলিকা যেন যাইতে নারে ॥ (পৃ ৩৮)

ছদ্মবেশী বিশ্বকর্মার সহায়তায় সাতালি পর্বতে লৌহবাসর নির্মিত হোল। খুব জাঁকজমকের সঙ্গে বেহুলা-লখিন্দরের বিবাহ হয়ে যাবার পর, চাঁদ সেই রাত্রেই ওদের নিশ্ছিদ্র বাসরে এনে তুললেন। রাত্রি অবসিতপ্রায়। বিবাহের রাত্রেই সর্পদংশনে মৃত্যু বিধিলিপি। রাত্রি অতিক্রান্ত হলে বিধিলিপি ব্যর্থ হয়ে যাবে। মনসা বিপন্ন বোধ করে সূর্যের কাছে প্রার্থনা জানালেন,

আমার বিনয় রাখ শুন দিনকর।
আচ্ছাদনে যাও তুমি গগন উপর (পৃ ৫১)

এর পর একে একে সাপেরা এসেছে লখিন্দরকে দংশন করতে আর বেহুলার হাতে বন্দী হয়েছে। এক সময় মনসা হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছেন। তাঁর মনে

হয়েছে 'রাত্র অবশেষ, কলংক রহিল মোর জুড়াইয়া দেশ'। এখানেও পরামর্শদাত্রী সেই নেতু। সে বলেছে—

যত দেখ সর্পরাজ সাধিতে তোমার কাজ
একা কালী বিনা কেহ নয়। (পৃ ৬২)

শেষ পর্যন্ত কালীনাগকে আসতে হয়েছে এবং লখিন্দরকে দংশন করবার দায়িত্ব নিয়ে সাতালি পর্বতে যেতে হয়েছে। এবার 'ডাকি আনি নিদ্রাবতী' মনসা তাঁকে আদেশ করলেন, 'বেহুলা লক্ষীন্দরে, নিদ্রা করাঅ তারে, দংশিব সাধুসুতে আমি'। অতএব বেহুলা লখিন্দর নিদ্রিত হলেন এবং লখিন্দরের অসতর্ক পদ-চালনায় আহত হয়ে কালনাগিনী তাঁকে দংশন করল। চাঁদের সমস্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ব্যর্থ করে দিয়ে লৌহবাসরের মধ্যেই লখিন্দরের মৃত্যু হোল। পুরুষ-কারের মর্মান্তিক পরাজয় ঘটল দৈবশক্তির কাছে। সে যুগে পুরুষকারের এই পরাজয় তদানীন্তন মানুষদের অসীম তৃপ্তি দিয়েছে। তাদের কাছে এইটিই ছিল স্বাভাবিক। এবং কাব্যের পরিণতি সমকালীন বিশ্বাসের সমান্তরাল হওয়ার দরুন মঙ্গলকাব্য এতখানি জনপ্রিয় হতে পেরেছিল।

যাই হোক, বেহুলা এবার কলার মান্দাসে পতির মৃতদেহ নিয়ে যাত্রা করলেন, প্রতিজ্ঞা—স্বামী পুনর্জীবন ফিরে না পেলে প্রত্যাবর্তন করবেন না। তাঁর বক্তব্য—

যদি মনসার দাসী আমি পতিব্রতা।
জিয়াইব প্রাণনাথে এ বোল সর্বথা॥ (পৃ ৮১)

অজস্র বাধা বিপত্তির ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললেন বেহুলা। রাখাল, গোদা, কুকুর, রাঘব বোয়াল—মানুষ, জন্তু সবাই বেহুলার যাত্রা পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। স্বয়ং মনসাও কিছু কম ছলনা করেননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেহুলা নেতুর কাছে গিয়ে পৌছলেন।

ধনা আর মনা দুই ছেলে নিয়ে কাপড় কাচতে এসেছে নেতু কিন্তু ছেলেদের উৎপাতে নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারছে না। নেতু সাপকে ডেকে আদেশ করল—

ধনা মনা মোর এ দুই সুতে।
দংশন করহ আমার হিতে॥ (পৃ ১০৯)

সাপের কামড়ে ওদের মৃত্যু হোল আর তাদের মাতা নিরুদ্বেগে কাজ শেষ করল। এর পর যখন বাড়ী যাবার সময় হয়েছে, তখন তাদের শরীর থেকে বিষ দূর করে

ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে গেল নেতু। বেহুলার স্থির বিশ্বাস হোল যে, এই সেই রমণী যার সহায়তা পেলে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া সম্ভব।

বেহুলা নেতুর সাহায্য ভিক্ষা করলেন। এই হতভাগিনীর আচরণে নেতু, এত মুগ্ধ হোল যে, সে ঘোষণা করল—

সাধিতে তোমার কাজ মনসা চরণ মাঝ
উছর্গিব আমার জীবন। (পৃ ১৩৩)

কাহিনীর এই অংশে নেতুর ভূমিকাটি মুখ্য। সে শুধু বেহুলাকে দেবপুরীতে নিয়ে গিয়ে দেবতাদের প্রীত করার জন্যে বেহুলার নৃত্যেরই আয়োজন করেনি, মনসাকে দেবসভায় উপস্থিত করিয়ে লখিন্দরের পুনর্জীবন দানে তাঁকে বাধ্য করেছে। অবশ্য মনসাকে সাহায্যও সে যথেষ্ট পরিমাণে করেছে। বহুক্ষেত্রে তার পরামর্শ নিতে হয়েছে দেবী মনসাকে।

বেহুলার নৃত্যে পরিতুষ্ট হয়ে দেবতারা, বিশেষ করে শিব মনসাকে লখিন্দরের পুনর্জীবন দান করতে অনুরোধ করলেন। লখিন্দর পুনর্জীবিত হলেন। মনসা এবার বেহুলাকে মর্ত্যে ফিরে যেতে আর চাঁদকে দিয়ে তাঁর পূজোর আয়োজন করাতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু নিজের গরবে গরবিনী হয়ে বেহুলা ফিরে যেতে পারেন না। লখিন্দরের অগ্রজ ছ'টি ভাইকে না নিয়ে গেলে—

ছয় জায়া মোরে দেখি নিরন্তরে
তুলিবে দুঃখের নদী। (পৃ ১৩৮)

ওদেরও অকাল মৃত্যু হয়েছিল। মনসা তাই তাদের রেখেছিলেন বরুণের কাছে। মনসা তাদের ফিরিয়ে আনলেন। এখনো তৃপ্তি হয় নি বেহুলার, বললেন—

কৃপা করি বিষহরী দেঅ সাত তরি।
অনাথা কিরূপে ঘরে যাইবারে পারি॥ (পৃ ১৪১)

এই প্রার্থনা পূর্ণ হবার পর বেহুলা সবাইকে নিয়ে মর্ত্যে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

সব কিছু পেয়েও বেহুলার মনে শান্তি নেই। শ্বশুর চাঁদ সদাগর যদি মনসার পূজা না করেন, কোন কিছুই তিনি পাবেননা। পথে মায়ের সঙ্গে দেখা করে এলেন কিন্তু তাঁর আদর যত্ন ভোগ করবার জন্যে রইলেন না সেখানে। ঘরে ফিরে প্রথমে শাশুড়ীকে সব শর্তের কথা জানালেন। চাঁদ ও শুনলেন সব কথা মনোযোগ দিয়ে। সামনে শোকের জীবন্ত প্রতিমূর্তি সনকা, বিধবা ছ'টি পুত্রবধূ, স্বর্গ প্রত্যাগত বেহুলা আর ওদিকে দ্বারে অপেক্ষমান পুনর্জীবিত সাত পুত্র।

এই পরিস্থিতিতে ও মনসার পূজো করবেন না, এ কথা বলবার মত মনের জোর পেলেন না এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষটি। শেষবারের মত তিনি শর্ত আরোপ করলেন, যদি তাঁর সাতটি বাণিজ্যতরী ডাঙার উপর দিয়েই তাঁর বাড়ীর দরজায় চলে আসে, বাম হাতে মনসার পূজো তিনি করবেন। মনসা এই শর্ত পূরণ করলেন। তাঁর আদেশে সর্পকুল মাথায় করে নৌকাগুলোকে চাঁদের দরজায় পৌছে দিয়ে গেল। চাঁদ মনসার পূজো করে সব ফিরে পেলেন।

কাহিনীর উপসংহারে মনসা এলেন চাঁদ সদাগরের কাছে। বেহুলা লখিন্দরের পূর্বজন্মের কাহিনী শুনিয়ে তাদের স্বর্গে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

চরিত্র

দ্বারিকা দাসের এই মনসামঙ্গল খানির মধ্যে কাহিনী বা চরিত্রগুলিতে কোন মৌলিকতা নেই ঠিকই, কিন্তু পরিকল্পনার মধ্যে এবং উপস্থাপন পদ্ধতিতে কিছু বৈশিষ্ট্য অবশ্যই চোখে পড়ে। গ্রহণবর্জনের নীতি মেনে নিয়ে কবি কাহিনীর মধ্যে যেমনি কিছু পরিবর্তন এনেছেন, তেমনি চরিত্রগুলির মধ্যেও এনেছেন কিছু পরিবর্তন। আপন মানসিকতার প্রতিফলন তিনি ঘটিয়েছেন চরিত্রগুলিতে। স্রষ্টার সহানুভূতির উষ্ণ স্পর্শেই চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন প্রকারের, এমন কি সম্পূর্ণ বিপরীত কোটির চরিত্র সৃজন করতে গিয়ে একই কালে তাদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করা সৃজনধর্মী প্রতিভার অন্যতম লক্ষণ। এই ভাবে পরম যত্ন আর আন্তরিকতার সঙ্গে চরিত্রগুলিকে গড়ে তুলতে গিয়ে সেগুলির মধ্যে কিছু পরিমাণে স্রষ্টার ব্যক্তিমানসের অভিক্ষেপ ঘটেই। এতে অতি পরিচিত চরিত্রের মধ্যেও এমন একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য সৃজিত হয়, যা প্রতিটি সৃষ্টিকে অনন্যতা দান করে। কবির পরিচিতি প্রসঙ্গে তাঁর সম্পর্কে যে ধারণা সৃষ্ট হয়েছে, কাহিনী ও চরিত্র গুলির পরিকল্পনার মধ্যে তার অভ্রান্ত সমর্থন পাওয়া যায়।

দ্বারিকা দাস ধর্মনিষ্ঠ ও নীতিমান মানুষ ছিলেন। মনসামঙ্গল তাঁর পরিণত বয়সের রচনা। অতএব এই কাব্যে তাঁর পরিশীলিত রুচির পরিচয় পাওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। একেই বলা হয়েছে কবির বিশিষ্ট মানসিকতার অভিক্ষেপ।

প্রাচীন যুগের ধর্মচিন্তাশ্রিত সাহিত্য মধ্যযুগে এসে তার মধ্যে মানুষের জন্যে অনেকখানি স্থান করে দিয়েছে। এ যুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে তাই বেশ কিছু ব্যক্তিত্বচিহ্নিত নরনারীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। আপন সুখ দুঃখের গণ্ডীর মধ্যে জীবন্ত সাধারণ মানুষের মতই এরা আচরণ করেছে। দেবতার সর্বাতিশায়ী

শক্তির কাছে এরা প্রায়শঃ নত-মস্তক, কিন্তু এর ফলে তাদের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলা যায়না। তাদের ভাষণে আর আচরণে নতুনত্বের আস্বাদ আছে। হয়ত এও অন্যতম একটি কারণ যার জন্যে মঙ্গলকাব্য মানুষের প্রীতি সম্পাদন করেছে প্রায় পাঁচশ বছর।

মনসামঙ্গল এদিক থেকে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। সেখানে প্রাচীন সংস্কার থেকে মুক্ত হবার জন্যে মানুষের আপোসহীন সংগ্রাম অনায়াসে আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। দৈবের সঙ্গে পুরুষকারের এই সংঘর্ষ মানুষকে আত্মশক্তির ওপর নির্ভরশীল করেছে, তাকে এনে দিয়েছে অপরিমেয় আত্মসম্মানবোধ। দ্বন্দ্ব আর সংঘাতের ভেতর দিয়ে সে নিজের মূল্যায়ন করতে পেরেছে। মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যগুলির এই সব চরিত্রই আধুনিক যুগের সাহিত্যে উন্নতশীর্ষ নরনারীতে পরিণত হয়েছে।

মনসামঙ্গল কাব্যের মুখ্য চরিত্র চাঁদ সদাগর। বেহুলা, সনকা, মনসা আর নেতু বা নেতাই চরিত্রগুলিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। চাঁদ মনসাদ্রোহী কিন্তু দেবদ্রোহী নন। তিনি শিবভক্ত, আদর্শবান, দৃঢ়চরিত্র এবং ক্রিয়াশীল নায়ক। কবি তাঁকে 'দুর্বাসা' গোত্রীয় বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর তেজস্বিতা হয়ত গোত্র পরম্পরার লক্ষণ।[1] স্বয়ং মনসা যে চাঁদের ভয়ে সন্ত্রস্ত, তার বর্ণনা কাব্যের মধ্যেই আছে। তিনি শিব পূজক, শিবতনয়ার পূজায় তাই তাঁর তীব্র অনিচ্ছা। সে অনিচ্ছার সুস্পষ্ট রূপটি হোল—

চাঁদ বাণ্যা বলে কি তারে ডরি।
দেখা পাল্যে প্রাণে ধরিয়া মারি॥
যত দুঃখ দিয়া আছয়ে মোরে।
হেন্তালের বাড়ি তাহার তরে॥
ভাঙ্গিব পাঁজর পাইলে দেখা।
সতেকি আমারে ভেটিবে একা॥ (পৃ ৩৮)

বিপন্ন হয়ে বন্ধু ধর্মদাসের গৃহে আশ্রয় নিয়েছেন চাঁদ। তিনি জানতেন না যে বন্ধু মনসার ভক্ত। তাঁর ঘরে মনসার ঘট দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন চাঁদ, বললেন,—

মিতা মূঢ় মতি তোরে দিল স্থিতি
কি গুণে মন্দিরে আনি।

ভুলায়্যা বর্বর থাঅ নিরন্তর
আজু যাবে প্রাণ জানি ॥ (পৃ ১৫)

মনসার পূজা মর্ত্যে প্রচলিত ছিল। শুধু চাঁদ ছিলেন এই দেবীর পূজায় অনিচ্ছুক। তাঁর এই অপরাধের জন্যে মনসা তাঁকে যে পরিমান শাস্তি দিয়েছেন, তার যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়।

কোন কোন মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদের আচরণ স্থূল এবং মানবতা বর্জিত। সেদিক থেকে দ্বারিকা দাস অত্যন্ত সতর্ক। কেতকাদাসের চাঁদ লখিন্দরের মৃত্যুর পর গৃহভৃত্যকে বলেছেন, 'ঝাট কর্‌যা কাট নেড়া রামকলার পাত, মৎস্যপোড়া দিয়া আজি খাব পান্তা ভাত'। এ উক্তি শুধু অশোভনই নয়, চাঁদের মানবিকতা ও এতে ক্ষুন্ন হয়েছে। দ্বারিকা দাসের চাঁদ মনসার সঙ্গে বিবাদের আর কোন সুযোগ রইল না বলে আনন্দ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তার সঙ্গে কবি বলেছেন—

পুত্রের দারুণ শোকে নানা কথা কহে মুখে
অভিমানে নিন্দে বিষহরী। (পৃ ৭৯)

এক্ষেত্রে 'অভিমান' শব্দটির ব্যঞ্জনা আমাদের অভিভূত করে। এর অন্তরালে মানবশক্তির সীমাবদ্ধতা এবং সন্তানহারা পিতৃহৃদয়ের আর্তি যে উদ্বেলিত, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

মনসার পূজা করতে রাজী হয়েছেন চাঁদ। এখন 'মনসার ঘট স্থাপে ঘরের ভিতর; কিন্তু 'হেন্তালের বাড়ি, দূরে ছিল পড়ি, নিকটে রাখিল সাধু ক্রোধ দূরে ছাড়ি'। পরিবেশটি নিঃসন্দেহে কৌতুককর।

আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব আর বহির্জগতের সংঘাত চাঁদ চরিত্রটিকে পরিপূর্ণতা দান করেছে। কষ্টার্জিত সম্পদ আর প্রাণাধিক সন্তানদের রক্ষার জন্যেও চাঁদ আপন আদর্শ ত্যাগ করেননি। এর ফলে যে সব পীড়ন তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে তা কিন্তু কেবল মাত্র মানসিক স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। দৈহিক শাস্তি ও প্রচুর ভোগ করতে হয়েছে তাঁকে। তবুও এই বজ্রকঠিন চরিত্রের উন্নতমস্তক মানুষটি একবারও বেদনায় হাহাকার করে উঠেননি। কোনো অভিযোগও করেননি কারোর বিরুদ্ধে। এঁর আদর্শগত ঋজুতাকে অবনমিত করবার চেষ্টায় মনসা যা করেছেন তার জন্যে দেবসভায় তিনি ভর্ৎসিত হয়েছেন কিন্তু এ সবের জন্যে চাঁদকে শোককাতর দেখা যায়নি।

এই চরিত্র-পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করলে তবে তার বৈশিষ্টটি ধরা পড়ে। আপাতদৃষ্টিতে চাঁদকে স্নেহমমতা বর্জিত দৃঢ়চেতা মানুষ বলেই মনে হয়। প্রকৃত-

পক্ষে এই বজ্রকঠোর হৃদয়ের মধ্যে স্নেহ ভালোবাসার ফল্গুধারা নিহিত ছিল। কোন কোন দুর্বল মুহূর্তে তার সংযত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

লখিন্দরের মৃত্যুর পর বেহুলা তাঁর মনোবাসনা প্রকাশ করেছেন। তাঁকে নিবৃত্ত করবার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। শোকবিহ্বল সনকা চাঁদের কাছে এসে তাঁর অনুমতি চাইলেন, বললেন, 'অনুমতি দেঅ তায়, পুত্র গেল বধূ যায়'। ক্ষুব্ধ সনকার কণ্ঠে শোনা গেল,—

পুত্র না থাকিলে কোলে অপুত্রক সভে বলে
প্রভাতে না দেখে কেও মুখ।
বিস্তর পাপের ফলে পুত্র মরে মার কোলে
অন্তে যম দেয় ঘোর দুখ॥
যেবা মাতাপিতা হৈয়া পুত্রে না করয়ে দয়া
পাপ প্রাণ ধরে অকারণে।
উদরেতে জন্ম দিয়া সাতপুত্র আমি খায়্যা
নিশ্চিন্তে বসিনু এতদিনে॥ (পৃ ৭৯-৮০)

চাঁদ নিজেকে বহু কষ্টে সংযত রেখেছিলেন কিন্তু এবার তার সীমা অতিক্রান্ত হোল। সনকার সামনে সাধুর অবস্থাটি বর্ণনা করলেন দ্বারিকা দাস—'শুনি সনকার কথা, সাধু করে হেট মাথা, কাতর হইয়া অতিশয়'। আরও একটি দৃশ্য আছে। কাহিনীর অন্ত্য পর্বে মনসা বেহুলা আর লখিন্দরের পূর্বজন্মবৃত্তান্ত জানালেন সবাইকে। এবার তাঁদের স্বর্গে ফিরে যেতে হবে। শাপভ্রষ্ট লখিন্দর আর বেহুলার বিদায় মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। ওদের নিয়ে যাবার জন্যে মনসা এসে দাঁড়িয়েছেন। তখন—

লক্ষ্মীন্দর বেহুলা বিদায় হয় বাপ মায়।
ছয়ভাই বধূগণে মাগিল বিদায়॥
কলরব গণ্ডগোল উঠিল বিস্তর।
ধরণী লোটয়্যা কাঁদে চাঁদ সদাগর॥ (পৃ ১৬৭)

এই ভূলুণ্ঠিত মানুষটি কোন অপ্রত্যাশিত দৃশ্যের অবতারণা করেননি। তাঁর স্নেহপরায়ণ অন্তরের পরিচয় চকিত চপলার মৌহূর্তিক প্রকাশের মত দীপ্তিলাভ করেছে একাধিক বার। বাৎসল্য স্নেহের কাছে আজ তাঁর পরাজয় সম্পূর্ণ। স্নেহ ভালবাসার সযত্ন নিরুদ্ধ প্রবাহটি আজ কূলপ্লাবী হয়ে উন্নতশীর্ষ চাঁদকে উতলা করে

তুলেছে। এবার চাঁদের চরিত্রটি পরিপূর্ণ জীবন্ত চরিত্রের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হোল।

ললিতে কঠোরে মিশ্রিত এই চরিত্রটি মনসামঙ্গল কাব্যখানিকে এমন একটি সুষমামিশ্রিত গাম্ভীর্য দান করেছে যা মধ্যযুগীয় রচনায় অকল্পনীয়। বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যধারায় চাঁদসদাগর একটি পরম আকর্ষণীয় চরিত্র। কিন্তু কোন কোন কাব্যে এই চরিত্রে যে স্থূলতা অর্পিত হয়েছে, এ ক্ষেত্রে তা নেই এবং নেই বলেই এটি আদর্শচরিত্রে পরিণত হতে পেরেছে।

সনকা এবং অমলা বাঙালী পরিবারের অতিপরিচিত মাতৃমূর্তি। সন্তানের মঙ্গল কামনায় নিবিষ্টচিত্ত ও ধর্মপরায়ণা এই চরিত্র দুটি এ কাব্যে নতুন কোন বৈশিষ্ট্য অর্জন করেনি। তবে এ দুটি জীবন্ত চরিত্র যে সার্থক হয়ে উঠেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সনকাকে অমলার চাইতে ব্যক্তিত্ব সম্পন্না ও বুদ্ধিমতী বলেই মনে হয়। অবশ্য কাব্যটির মধ্যে তাঁর উপস্থিতির ক্ষেত্র ও বৃহত্তর। চাঁদকে যুক্তি পরামর্শ দিয়ে তাঁকে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলে, সনকা অনেক বেশী কর্তব্য পালন করেছেন। কাব্যের মধ্যে তাঁর ভূমিকাটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

মাতা সনকার শোকাবহ জীবন তুলনাহীন। লখিন্দরের মৃত্যুর পর করুণ বিলাপের মধ্যে শুনি—

আমি পাপী দুরাচারী দশমাস গর্ভে ধরি
শয়ন সাজালু কার তরে।
চন্দ্রসম সাত সুতে সম্পিলু সাপের হাতে
বিধি বাম কি দোষে আমারে॥
মনসা সাধিল বাদ আছিল মনের সাধ
পুত্রহাতে পাব পিণ্ডদান।
এ বড় দারুণ কথা বিদ্যমান মাতা পিতা
সাতপুত্র তেজিল পরান॥ (পৃ ১৫)

সনকা আর চাঁদ সদাগরের মধ্যে যে পার্থক্যটি সহজে চোখে পড়ে তা হোল, সনকার ক্ষেত্রে শোকের বহিঃ প্রকাশ আছে, চাঁদের ক্ষেত্রে তা নেই। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, চাঁদ দুঃখ-সুখের অতীত, স্থিতধী পুরুষ।

আপন শোকের প্রাবল্যে সনকা মুহ্যমান তবুও বেহুলার প্রস্তাব যে বিপজ্জনক সে কথা চাঁদকে স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি ভোলেননি। এর মধ্যে স্নেহ এবং

কর্ত্তব্য-পরায়ণতা মিশ্রিত হয়ে আছে। মৃতপতির দেহ নিয়ে বেহুলার সমুদ্রে ভেসে যাবার ইচ্ছে জানতে পেরে সনকা বলেছেন—

দারুণ যমের ঘর যায় যেই জন।
পুনর্বার জিয়াইতে নারে দেবগণ॥
দয়া যদি মনসার থাকিত হৃদয়।
সাতপুত্রশোক তবে মোরে কেন হয়॥
সমুদ্রে ভাসিতে চাহ কলার মান্দাসে।
বড় বড় ডিঙ্গা যেথা না যায় সরসে। (পৃ ৭৭)

পুত্র লখিন্দরের মৃত্যুর পর শোকের প্রাথমিক তীব্রতায় তিনি বধূ বেহুলাকে ভং র্সনা করেছেন। পুত্রের মৃত্যুর জন্যে তাঁকে দায়ী করতেও কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু নিজের ত্রুটি অনুধাবনে তার বিলম্ব হয়নি। তিনি নিজের ভাগ্য এবং মনসার সঙ্গে স্বামীর বিবাদকেই সব কিছু ক্ষয়ক্ষতির মূল কারণ বলে মেনে নিয়েছেন। ভাগ্যহীনা পুত্রবধূটির জন্যে তাঁর স্নেহ মমতার অন্ত ছিলনা। পুনর্জীবিত লখিন্দর, তার অগ্রজ ছ'ভাই এবং নিমজ্জিত সাতটি বাণিজ্য তরী নিয়ে বেহুলা যখন প্রত্যাবর্তন করেছেন তখন তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করেননি সনকা। বেহুলাকে পুত্রবধূ রূপে পেয়ে তাঁর বংশ যে ধন্য হয়েছে, সেকথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন—

দুর্গম তরিলে মাগো কলার মান্দাসে।
হারা ধনজন লৈয়া আইলে নিজ দেশে॥
হেন কর্ম পৃথিবীতে করে কোন জন।
উদ্ধার পাইলু মোরা তোমার কারণ॥ (পৃ ১৫৯)

এই উক্তির মধ্যে শুধু স্নেহ মমতা নয়, সনকা চিত্তের ঔদার্যটিও উদাহৃত।

অমলা চরিত্রটিও স্নেহ মমতায় সমভাবেই পরিপূর্ণ। স্বল্প পরিসরে হলেও তার স্পর্শ অভ্রান্ত ভাবেই পাওয়া যায়। লখিন্দরের সঙ্গে বেহুলার বিবাহ নিষ্পন্ন হয়ে যাবার পরেই চাঁদ যখন ঘোষণা করলেন, 'কন্যাবর লয়্যা রাত্রে যাব নিকেতন' তখনই অমঙ্গল আশংকায় মাতৃহৃদয় বিচলিত হয়েছে। তখন-

অমলা রোদন করে বেহুলারে আনি।
তেজিয়া আমার কোল যাবেরে নন্দিনী॥
বিপরীত শুনি তাহে স্থির নহে প্রাণ।
নাজানি বিধাতা কর্মে কার কি ঘটান॥ (পৃ ৫৩)

মৃতপতি নিয়ে কলার মান্দাসে ভেসে চলেছেন বেহুলা, এ খবর কাকরূপী মনসাই অমলার কাছে পৌছে দিলেন। শোকে ভেঙ্গে পড়লেন অমলা। তাঁর আদেশে পুত্রেরা গেল স্নেহের একমাত্র ভগিনীকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে। তাঁদের সমস্ত চেষ্টা কিন্তু ব্যর্থ হ'লা। সংকল্পে অটল বেহুলা ভায়েদের পেছনে ফেলে চলে গেলেন। সেই থেকে শুরু হোল কন্যার ভাবনা। দিনরাত্রির অজস্র কর্মব্যস্ততার মধ্যেও অমলার অন্তরে বেহুলার চিন্তা রইল সদাজাগ্রত।

বেহুলার মনস্কামনা পূর্ণ হোল। ধনজন নিয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে স্বামীকে নিয়ে মাতা অমলার সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলেন তিনি। গিয়েছিলেন ছদ্মবেশে কিন্তু কন্যাকে চিনতে মায়ের এক মুহূর্তও বিলম্ব হোলনা। আনন্দ আর বেদনা একই কালে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল অমলার অন্তরে। কন্যাকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন—

> অভাগী মায়ের প্রাণে কত কত হয়।
> অন্তরে তুষের অগ্নি প্রতিদিন দয়॥
> হায় হায় করি রাত্রদিন বসি কান্দি।
> একদিন স্বপ্নে বাছা দেখা দিল যদি॥
> ধুবনীর ঘাটে বাছা কাচয়ে বসন।
> ঘামে দরদর তনু বিরস বদন॥
> দেখিয়া আকুলে যাই ধরিবারে কোলে॥
> পাপনিদ্রা ছাড়ি মোর গেল হেন কালে॥ (পৃ ১৫০)

স্নেহসিক্ত মাতৃহৃদয়ের স্বচ্ছদর্পণে কন্যার দুঃখ দুর্দশার সবটুকুই নিখুঁতভাবে ধরা পড়েছে। যাইহোক, কন্যাজামাতাকে ঘরে নিয়ে তুলতে চাইলেন অমলা, বললেন-

> ধরুক ঘরের শোভা আইসগো ভুবনে।
> ঘরে আস বস মাগো জামাতার সনে॥ (পৃ ১৫২)

কিন্তু এই স্নেহযত্ন ভোগ করবার বা আনন্দ করবার মত অবসর আপাততঃ বেহুলার নেই। যে গুরুদায়িত্ব বহন করে মনসার 'ব্রতকন্যা' চলেছেন নিজ গৃহে, তার চিন্তাই তাঁকে বিচলিত করে রেখেছে। ব্রতোদ্‌যাপনের পূর্বে যে কোন প্রকার আনন্দ উপভোগের প্রশ্ন তাঁর কাছে অবান্তর। মাতাকে সান্ত্বনা দিয়ে স্বামীকে নিয়ে তাই ফিরে চললেন বেহুলা চম্পা নগরের দিকে। কন্যা-জামাতার সেই অপস্রয়মান মূর্তির দিকে তাকিয়ে নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইলেন অমলা। সে চিত্রটির স্বল্পাক্ষর বর্ণনা বড় মর্মস্পর্শী—

চরণ নাচলে তার দেখি দুই জনে।
চাহিয়া দুঁহার মুখ রহিল সেখানে॥ (পৃ ১৫২)

বড় আকর্ষনীয় এ চিত্রটি। পুত্র, কন্যা, বা অন্য কোন প্রিয় পরিজন বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন আর মাতা বা মাতৃস্থানীয়া মমতাময়ী কোন নারী তার যাত্রা পথের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন—এ চিত্র বাঙালীমাত্রেরই অতি পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে অমলা সমগ্র কাব্যটির ওপর অশ্রুসজল বেদনার স্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছেন।

মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যমণি বেহুলা। যেদিন বণিক বংশের কুল-পুরোহিত জনার্দন বেহুলাকে চাঁদ সদাগরের পুত্রবধূরূপে মনোনীত করলেন, সেদিন থেকে কাহিনীর গতি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন তিনিই। তাঁরই ক্রিয়াশীলতার ফলে কাহিনী নতুন নতুন পথে অগ্রসর হয়েছে আর অভাবিত লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে। অপূর্ব সুন্দরী, অসামান্য নৃত্যপটিয়সী, এবং অতুলনীয় মানসিক শক্তির অধিকারিনী এই পতিব্রতা নারী একদিকে স্নেহে, প্রেমে, শ্রদ্ধায় অন্যদিকে তেজে ও চারিত্রিক দৃঢ়তায় অনন্যা। বেহুলা কোন ব্যক্তিনাম নয়, ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শের প্রতীক এ নাম।

চাঁদ সদাগরের মধ্যে যেমনি অনমনীয় ব্যক্তিত্ব এবং স্নেহপ্রবনতার সংমিশ্রণ দেখা যায়, ঠিক তেমনি দেখা যায় প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস আর আপোসহীন প্রতিজ্ঞার সঙ্গে স্নেহ, প্রেম আর শ্রদ্ধার সংমিশ্রন বেহুলারও চরিত্রে। মধ্য যুগের বেশ কয়েকটি শতাব্দীর অবসরে প্রতিভাধর কিছু কবির তুলিকাস্পর্শে বেহুলা চরিত্রটি অপূর্ব দীপ্তি লাভ করেছে। এই দীপ্তির উৎস তাঁর সুনির্মল চরিত্র আর অকলঙ্ক সতীত্ব। তেজস্বিনী, মনস্বিনী এবং লাবণ্যময়ী বেহুলা ভারতীয় জীবনদর্শনের অঙ্গীভূত।

বেহুলার মূল্যায়ন কবি অনেককে দিয়েই করিয়েছেন বিভিন্ন ক্রিয়া কলাপের ভিত্তিতে পৃথক পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে তবেই বেহুলার মূল্যায়ন হয়েছে। সেগুলিকে একত্রে গ্রহণ করলে তাঁর সমগ্র পরিচয়টি সুস্পষ্ট ভাবেই পাওয়া যায়।

শ্বেতমক্ষিকা হয়ে মনসা চাঁদকে দিলেন বিপরীত বুদ্ধি। তিনি প্রস্তাব করলেন, লোহার কলাই সেদ্ধ করে বেহুলাকে তাঁর সতীত্বের প্রমান দিতে হবে। উপস্থিত সবাই এ প্রস্তাব শুনে বিব্রত বোধ করলেন। সায় সদাগর এতে বেশ অপমানিত বোধ করলেন। তিনি এ কথাও বললেন, 'আর কেহ বাণ্যা হইলে

পাইত তার মত'। বেহুলা কিন্তু সব শুনে নির্বিকার রইলেন। বেহুলার প্রতি-ক্রিয়া সুন্দর ভাবেই বর্ণনা করেছেন কবি—

বেহুলা বলেন বাপা নিবেদি চরণে।
রান্ধিব লোহার চুণা বিষহরী ধ্যানে॥
অধর্ম বলিয়া আমি নাই জানি ভালে।
অন্যথা কলঙ্ক কি কারণে মোর কুলে॥
সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যদি যাবে সদাকর।
অসতী বলিয়া মোরে ঘোষিবেক নর॥ (পৃ ৩৫)

লোহার কলাই সেদ্ধ করে বেহুলা প্রমাণ করলেন যে তাঁর সতীত্ব প্রশ্নাতীত। উপস্থিত সবাই ধন্য ধন্য করেছেন। কুলপুরোহিত জনার্দন—

বলে পৃথিবীতে এ সতীকন্যা।
ভুবন পবিত্র করিল ধন্যা॥ (পৃ ৩৮)

লখিন্দরের সঙ্গে বেহুলার বিবাহ, লৌহবাসরে সর্পদংশনে লখিন্দরের মৃত্যু, কলার মান্দাসে পতির মৃতদেহ নিয়ে অকূলে ভেসে যাওয়া এ সবই চির পরিচিত কাহিনী। এর মধ্যে লক্ষণীয় বেহুলার জাগ্রত আর সতর্ক রূপটি। প্রথমে এসেছে উদয় নাগ। সে এসে, 'দেখিল বেহুলা বসি জাগে'। বেহুলার এই সতর্কতায় মনসা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত নিদ্রাবতী এসে বেহুলাকে ঘুম পাড়ালেন আর কাল নাগিনী এসে লখীন্দরকে দংশন করে গেল।

সপ্তম পুত্রের মৃত্যু সনকাকে ভীষণ ভাবে বিচলিত করল। শোকের প্রাবল্যে তিনি এর জন্যে দায়ী করলেন বেহুলাকে। বেহুলা বিনয়ী এবং শ্রদ্ধাশীলা কিন্তু অন্যায় বা অসত্যের সমর্থন তিনি কখনোই করতে পারেন না। স্বামীর মৃত্যুর জন্যে তিনি নিজের প্রাক্তনকে দায়ী করেছেন, স্বর্ণ-কঙ্কণ দিয়ে নিজের মাথায় আঘাত করে নিজেকে নির্মমভাবে শাস্তি দিতেও চেয়েছেন। কিন্তু তাই বলে ভিত্তিহীন অপবাদ নীরবে তিনি সহ্য করতে পারেন না। তিনি সবিনয়ে সনকাকে বলেছেন—

শুন শুন আগো মাতা বল অনুচিত।
কপালে আমার দুঃখ বিধির লিখিত॥
আর ছয় পুত্র তোমার মরিল কেমনে।
আপনা স্বামীর দোষ না বিচার কেনে॥ (পৃ ৭৬)

এই সত্যনিষ্ঠা এবং তেজস্বিতা বেহুলা চরিত্রকে যে নৈতিক শক্তির অধিকারী

করেছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই দুটি গুণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পতিব্রতা নারীর তেজোময়তা। কাহিনীর স্বর্গখণ্ডে, যেখানে দেবসভায় বেহুলা আপন দুর্ভাগ্যের বর্ণনা দিয়ে মনসাকে পরোক্ষভাবে পরম লজ্জিত করেছেন, সেখানেও বেহুলার অবিশ্বাস্য শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। লজ্জিত এবং ক্ষুব্ধ মনসা বেহুলাকে দংশন করবার জন্যে আদেশ করলেন সর্পকুলকে। বেহুলা আত্মরক্ষার জন্যে আপনার চারদিকে গণ্ডী রচনা করলেন। যে-ক'টি সাপ এলো মনসার আদেশ পালন করবার জন্য, তারা গণ্ডী-স্পর্শ করেই মৃত্যুমুখে পতিত হোল। বিস্মিত মনসার তাৎকালিন উক্তিতে বেহুলার অলৌকিক শক্তির মূল্যায়ন পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন—

আলো বেউলা কুমন্ত্রে মারিলি মোর সাপ।
চাঁদ বাণ্যা জিনি তোর দেখিতে প্রতাপ॥ (পৃ ১২৮)

আর এক দেবতা বেহুলা চরিত্রের যে গুণগান করেছেন, সেটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সে বর্ণনার মধ্যে বেহুলার পরিপূর্ণ বৃত্তান্ত আছে। কিন্তু বরুণের যে বর্ণনাংশটি এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক, তা হোল—

ধন্য ধন্য জন্ম তার রমনীর কুলে।
মনুষ্য শরীর হয়্যা স্বর্গে আসি মিলে॥
ধন্য মাতা ধন্য পিতা ধন্য তার স্বামী।
ধন্য দেশ ধন্য পৃথী সতী যেই ভূমি॥
পিতাকুল মাতাকুল আপনার বংশ।
সপ্তকুল উদ্ধার পাতক কৈল ধ্বংস॥
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
হেন সতী উপনীত তোমার ভুবনে।
স্বধর্মে উদ্ধার করিল সাতজনে॥ (পৃ ১৪০)

বরুণ কর্তৃক বর্ণিত এই 'স্বধর্ম' প্রকৃতপক্ষে বেহুলার সতীধর্মকেই স্মরণ করে উক্ত হয়েছে।

সনকা যে বেহুলা সম্পর্কে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন, সে সম্বন্ধে উদাহরণ সহ আলোচনা করা হয়েছে। অতএব একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে বেহুলা চরিত্রটি মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যমণি।

যে নারী দেবতা এবং মানুষ উভয়ের দ্বারা প্রসংশিত তার মনের মধ্যে অন্তত

কোন দুর্বল মুহূর্তে কিছু পরিমাণে আত্মশ্লাঘা সৃষ্ট হয়েছিল কিনা, এ প্রশ্ন পাঠকের দিক থেকে উত্থাপিত হতে পারে। কবি এ প্রশ্নের ও উত্তর নিপুণ ভাবেই দিয়ে গিয়েছেন।

'হারা ধনজন লৈয়া' বেহুলা ফিরেছেন কিন্তু শাশুড়ির সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন ছদ্মবেশে। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর সনকা ছদ্মবেশিনীকে বেহুলা বলে সন্দেহ করেছেন, প্রশ্ন করেছেন,

মোর দিব্য আছে যদি কহ অন্য করি।
হবেকি আমার বধু বেহুলা সুন্দরী ॥ (পৃ ১৫৭)

বেহুলা, সেই মুহূর্তে, 'দুকর জুড়িয়া বলে বেহুলা মোর নাম'। কিন্তু এর পরেই বেহুলা যা বলেছেন তাতে তাঁর মানসিক বৈশিষ্ট্যটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন—

আছিল বিশেষ পুণ্য তোমায় আমায়।
দুর্গম সমুদ্র তরি ভেটি মনসায় ॥
স্বামীদান দিল মোরে দেখি বিষহরী।
ছ ভাসুরে দিল প্রাণ আর সপ্ততরী ॥ (পৃ ১৫৭)

এ সত্য প্রমানের অপেক্ষা রাখে না যে, হৃতসর্বস্ব ফিরিয়ে আনার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব বেহুলার কিন্তু তাই বলে তার সবটুকু আত্মসাৎ করবার বিন্দুমাত্রও স্পৃহা তাঁর নেই। বিনা দ্বিধায় কৃতিত্বের রাজভাগ তুলে দিয়েছেন সনকার হাতে, অবশিষ্টাংশটুকু রেখেছেন নিজের জন্যে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর অন্তরালে যে অপরিমেয় মানসিক ঔদার্য ছিল, তাকে যথোচিত মূল্য অবশ্যই দিতে হবে।

বেহুলা চরিত্রের বর্ণবহুল বৈশিষ্ট্য পাঠকমাত্রেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। এ কথা ভাববার অবকাশ আছে যে, এ চরিত্রটি পূর্ণ পরিণতি নিয়েই আবির্ভূত হয়েছে। চাঁদ সদাগর প্রস্তাবিত লোহার কলাই সেদ্ধ করবার কথা শোনার পর বেহুলার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলে স্বীকার করতেই হয় যে আত্মবিশ্বাস, আত্ম-সম্মান এবং সুপরিণত চিন্তার অধিকারী ছিলেন তিনি। বয়সের পরিণতি না থাকলেও মানসিক পরিণতির অভাব ছিল না। কাহিনীর প্রথম পর্ব থেকেই তাঁকে পূর্ণ প্রস্ফুটিত শতদলটির মতই পাওয়া গেছে। তিনি দৈবশক্তির প্রতি একান্ত ভক্তিমান আবার স্বীয় চারিত্রিক শুচিতা সম্বন্ধেও যথেষ্ট সচেতন। তাঁর মধ্যে কোন প্রকার অপরাধবোধ বা হীনমন্যতা নেই তাই অকারণে পরাজয় বা

বক্তা স্বীকারের প্রশ্নও ওঠেনা তাঁর ক্ষেত্রে। বেহুলা তাই সমুন্নতমস্তক প্রতিবাদ মুখর বলিষ্ঠ চরিত্র।

এই চরিত্রের আর একটি দিকও বিচার্য। তিনি অলৌকিক এবং অস্বাভাবিক মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়ে স্বর্গ থেকে মৃত পতি, ছ'টি ভাসুর এবং নিমজ্জিত সাতটি বাণিজ্য তরী নিয়ে ফিরে এসেছেন। যে মানসিকতা এই সাফল্য অর্জনের প্রেরণা দিয়েছে, তা কি ভোগকামনা-চিহ্নিত-সংসারাসক্তি? বেহুলা কি সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ একটি সংসারে অজস্র স্নেহপ্রেমের মধ্যে পরম নিশ্চিন্তে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন? কবি এই প্রশ্ন ছ'টির নেতিবাচক স্বল্পাক্ষর উত্তর দিয়েছেন। তিনি বেহুলার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

এ সব সংসার মায়ার সঞ্চার।
ইহাতে আমার চিত নাহি ডুবে আর॥ (পৃ ১৬৪)

এই উক্তির বিচার প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে বেহুলা যখন এসব কথা বলছেন তখনো কিন্তু তিনি তাঁর পূর্বজন্মের ইতিহাস জানতেন না। উদ্ধৃত ছত্র ছ'টিতে যে অনাসক্তি প্রকাশিত, তা যে তাঁর সহজাত নয়, তার প্রমাণ 'আর' শব্দটি। আবার একথাও স্বীকার করতে হয় যে বেহুলার আপোসহীন অতন্দ্র সংগ্রাম ভোগ লালসার কামনাতাড়িত ছিল না। তার প্রেরণা উচ্চকোটির জীবনাদর্শের মধ্যেই সংগুপ্ত ছিল। আবার একথাও ঠিক যে, সেই প্রেরণাই শেষ পর্যন্ত বেহুলাকে ভোগাসক্তির প্রতি বীতস্পৃহ করে তুলেছে। বেহুলা যদি সুখভোগের উদ্দেশ্যে সংসারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার স্বপ্ন দেখতেন, তাঁর চারিত্রিক মহিমা অবশ্যই ক্ষুন্ন হোত।

মনসা চরিত্রটি অত্যন্ত স্বার্থচিহ্নিত হওয়ার ফলে তাঁর ক্রুরতা আর নিষ্ঠুরতার দিকটিই প্রকট হয়ে উঠেছে। চাঁদের মনসা পূজার অস্বীকৃত হওয়া ছাড়া উভয়ের মধ্যে বিরোধের অন্য কোন কারণ কাব্যের মধ্যে নেই, তাই মনসার অত্যাচার-প্রবন চরিত্র পাঠকের মানসিক পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মনসার একমাত্র চিন্তা চাঁদকে কী ভাবে বিপন্ন করা যায়। এর ফলে তাঁর দেবীমাহাত্ম্য অনেকখানি ক্ষুন্ন হয়েছে।

মনসার পূজা মর্ত্যে প্রচলিত ছিল। বেহুলা বলেছেন, 'জন্ম হৈতে ইষ্ট মোর মনসা সুন্দরী'। সনকা মনসা পূজার কথা বহুবার উল্লেখ করেছেন। চাঁদের বন্ধু ধর্মদাস বাড়ীতে মনসার ঘট স্থাপন করে পূজা করতেন। বেহুলা মান্দাসে ভেসে যাবার পথে কেদার ঘাটে নেমে মনসার মন্দিরে পূজা দিয়ে ইষ্টসিদ্ধির বর

লাভ করেছিলেন। তবু মনসা কোন কিছুতেই সন্তুষ্ট নন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য, চাঁদকে দিয়ে নিজের পূজা করানো। এই কামনাটির তীব্রতা তাঁর ন্যায়-অন্যায় বোধকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। এর সঙ্গে তাঁর চাঁদভীতি মিশ্রিত হয়ে তাঁকে হীনবল ভীত চরিত্রে পরিণত করেছে। এর অনিবার্য ফল স্বরূপ দেবদেবী সম্পর্কিত আমাদের সযত্ন লালিত ধারণা দ্বিধাগ্রস্ত হয়। এবং তুলনামূলক ভাবে চাঁদের চরিত্রটি তার স্পর্ধিত ব্যক্তিত্ব নিয়ে পরম শ্রদ্ধেয় এবং আকর্ষণীয় হয়ে উঠে।

কবি মনসা চরিত্রের এই দুর্বল দিকটি সম্পর্কে নিশ্চয়ই সচেতন ছিলেন। কোন চরিত্রই নিছক ভালো বা মন্দ হতে পারেনা, এমনকি পার্থিব চরিত্রও নয়। মনসা চরিত্রটি ক্রূরতার কলঙ্কিত স্পর্শে পরিপূর্ণ ভাবে হেয় চরিত্রে পরিণত হোক, কবির এ কামনা অবশ্যই ছিল না। দ্বারিকা দাস এখানে ওখানে এমন দু একটি ছত্র যোগ করেছেন, যাতে মনসা অতি পরিচিত স্বাভাবিক নারী চরিত্রে পরিণত হতে পেরেছেন। সেই অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু মূল্যবান সংযোজনগুলি এবার বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

চাঁদকে নিজের পূজা করতে বাধ্য করাই ছিল মনসার একমাত্র কামনা। কিন্তু এই কামনা পূর্তির জন্যে যে পরিমাণ ক্ষতি চাঁদের তিনি করেছেন, তার জন্যে তাঁর মানসিক স্তরে অপরাধবোধ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল। বেহুলা দেব-সভায় নৃত্য করে অমরবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করলেন। এবার বেহুলার স্বর্গে আসার কারণ জানতে চাইলেন তাঁরা। তখন—

নেতু বলে কহ পূর্বের কথা।
বিষহরী লাজে পুতিল মাথা॥ (পৃ ১২৫)

যাই হোক, বেহুলা তাঁর দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করলেন এবং বিশেষ করে শিব মনসার আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি যথেষ্ট ভর্ৎসনা করলেন মনসাকে আর মনসা দেবসভায় তাঁকে অপমানিত করার জন্যে বেহুলার উপর ক্রুদ্ধ হলেন। এবার আপন সতীত্বশক্তির পরিচয় দেবার পর বেহুলা মনসার কাছে করজোড়ে তাঁর কৃপা ভিক্ষা করলেন। দেবতারা মনসাকে অনুরোধ জানালেন, 'স্বামী দান দেহ বেউলা যাউ নিজ গ্রামে'। তখন কবিকৃত বর্ণনা পাওয়া যায়—

বেহুলার স্তুতি শুনি দেবের আশ্বাস।
ক্রোধ দূরে ছাড়ি হৈল মনসার হাঁস॥ (পৃ ১২৯)

এমনি করে দু একটি ছত্র যোগ করে চলেছেন কবি আর মনসা ধীরে ধীরে

স্বাভাবিক হয়ে উঠছেন। অনুশোচনা আর সহানুভূতির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল, এবার সেই গুণাবলীর সঙ্গে যুক্ত হোল স্নেহপ্রবণতা।

লখিন্দর পুনর্জীবন লাভ করেছেন। বেহুলার দ্বিতীয় প্রার্থনা ছিল, 'ছ'ভাইশুরে দেহ দানে'। সে প্রার্থনাও পূর্ণ করলেন মনসা। বরুণের সঙ্গে লখিন্দরের ছ'জন অগ্রজ এলেন দেবসভায়, তখন—

> বেহুলা সুন্দরী তবে দেখিয়া ভাসুরে।
> লজ্জিত হইয়া বস্ত্র টানি দিল শিরে॥
> লাজে অধোমুখী রামা নেতুর পশ্চাতে।
> মনসা মনের মধ্যে লাগিল হাসিতে॥ (পৃ ১৪০)

চিত্রটি বড় মনোরম। যে বেহুলা কলার মান্দাসে অজস্র বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে স্বর্গে এসেছেন বা দেবসভায় অপূর্ব নৃত্য দেখিয়ে দেবতাদের প্রীত করেছেন, এমনকি যে বেহুলা আপন সতীত্বের তেজে মনসার সর্প হত্যা করে তাঁকে বিব্রত করে তুলেছেন, ইনি সে বেহুলা নন। ইনি সনাতন হিন্দু ললনা। ভাসুরদের সামনে শুধু অবগুণ্ঠনবতীই নন, লজ্জায়াবনতাননা, ও বটে। বেহুলার এই অপরূপ মূর্তি মনসাকে বড় পরিতৃপ্ত করেছে। সেই আন্তরিক তৃপ্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন কবি।

মনসাকে বর্বরতা আর নিষ্ঠুরতার প্রতীক না রেখে তাঁকে যে দৈবশক্তি-সমন্বিত জীবন্ত নারীচরিত্রে পরিণত করেছেন কবি, এর মধ্যে তাঁর মানস-বৈশিষ্ট্যের পরিচয়টিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মনসা মূলতঃ বিষনয়নী। সেই দৃষ্টি পতিত হলে মানুষের জীবনে মৃত্যুর করাল ছায়া নেমে আসে। আবার ইনি অমৃতনয়নীও বটে। সে দৃষ্টির কল্যাণে মানুষের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা লাভ করে। মনসামঙ্গল কাব্যটির পূর্বভাগে ইনি বিষনয়নী, উত্তরভাগে অমৃত নয়নী। পূর্বার্ধে তিনি নির্মমভাবে হরণ করেছেন, অপরার্ধে দান করেছেন পরম আন্তরিকতার সঙ্গে। এর ফলে মনসা চরিত্রটিও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

নেতু চরিত্রটি অংকনের মধ্যেও কবি প্রতিভার পরিচয় সুস্পষ্ট। সে বুদ্ধিমতী, সঞ্জীবনী মন্ত্রের অধিকারিনী, আবার সে স্নেহপরায়না এবং পরোপকারিনী ও বটে। আপাতদৃষ্টিতে কাব্যের মধ্যে নেতুকে গৌণ চরিত্র মনে হলেও, কাহিনীর গতি এবং পরিণতিতে তার অবদান প্রচুর। একদিকে নেতু ছাড়া মনসাকর্তৃক চাঁদের পীড়ন যেমনি সম্ভব হোতনা, তেমনি বেহুলার সফলতাও অর্জিত হোত না।

তাই একথা অসংকোচে বলা যায় যে, নেতু গৌণচরিত্র হলেও যথেষ্ট মূল্যবান।

চাঁদ বাণিজ্যে চলেছেন। মনসার মনে হোল চাঁদের বাণিজ্যতরীগুলিকে ডুবিয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার সুযোগ তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু কী ভাবে তা সম্ভব? নেতুর পরামর্শ প্রয়োজন হোল। আবার কাহিনীর অন্ত্য-পর্বে যখন সবগুলো নৌকো তুলে বেহুলার সঙ্গে পাঠাতে সম্মত হয়েছেন মনসা, তখনো নৌকো কী ভাবে তোলা যায়, তার পরামর্শও দিতে হয়েছে নেতুকেই। লখিন্দরকে দংশন করবার আদেশ পেয়ে একের পর এক সাপ লৌহবাসরে প্রবেশ করেছে আর বেহুলা তাদের বন্দী করে চলেছেন। বিষণ্ণ মনসা নেতুরই পরামর্শে কালনাগিনীকে আনিয়ে দংশনের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং সফল হয়েছেন। আবার ওদিকে লখিন্দরের জীবন ফিরে পাওয়ার চেষ্টায় বেহুলার একমাত্র সহায় নেতু। সে বেহুলাকে স্বর্গে নিয়ে গেছে, সভার আয়োজন করেছে, অনিচ্ছুক মনসাকে দেবতাদের সামনে হাজির করেছে এবং শেষ পর্যন্ত লখিন্দরের শরীর থেকে বিষ দূর করার কাজে মনসাকে সাহায্যও করেছে। তাই নেতু ছাড়া যেমনি মনসা অসম্পূর্ণ তেমনি নেতুর সহায়তা ছাড়া বেহুলার সাফল্যও ছিল অভাবিত। নেতুর এই দ্বৈতভূমিকাটি নিপুনভাবেই চিত্রিত হয়েছে।

তবু প্রশ্ন উঠতে পারে, কোন ভূমিকাটি মূল্যবান। মনসাকে সাহায্য বা পরামর্শ দেবার পেছনে দৈবশক্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু বেহুলাকে যে সাহায্য করেছে নেতু, তা একান্তই আন্তরিক স্নেহপ্রসূত, তাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। এই সহায়তা দিতে গিয়ে মনসার বিরাগ-ভাজন হতে চলেছিল নেতু, তার প্রমাণ কাব্যের মধ্যে আছে।

বেহুলার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু আনন্দের আতিশয্যে তিনি যথাযথ-ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভোলেননি। কবির বর্ণনায় আছে—

> বেহুলা বলেন মাতা তোমার প্রসাদে।
> রাখিলে আমার মান বাড়ায়্যা সম্পদে॥
> গর্ভধারী অধিক জননী তুমি মোর।
> কি গুন সাধিতে আমি পারিব তোমার॥ (পৃঃ ১৪৩)

এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পটভূমিতে নেতুর স্নেহময় উক্তি পাঠকের অন্তর স্পর্শ করে। কবি বর্ণনা করেছেন—

নেতু বলে অরে বাছা তুমি মোর প্রাণ।
শরীর থাকিতে তোর বাঞ্ছিব কল্যাণ ৷৷
দেখ গিয়া পরিজন স্বামীর সহিতে।
সুখে দিন যাউ তোমা জন্ম আয়ো হাতে ॥
চুম্বন করিল নেতু বদন মণ্ডলে।
পরিতে বসন দিল সিন্দুর কপালে ৷৷ (পৃঃ ১৪৩-৪৪)

অতএব একথা বলার যুক্তি আছে যে, বেহুলাকে সাহায্য করার ভেতর দিয়েই নেতু চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপটি পরিস্ফুট। এবং শুধু তাই নয়, গৌণ চরিত্র হয়েও কাহিনীর পরিণতিতে নেতুর অবদান যথেষ্ট মূল্যবান।

কাব্যটির মধ্যে আরও কয়েকটি গৌণ চরিত্র আছে। তারা আলোকিত রঙ্গমঞ্চে এসেছে স্বল্প সময়ের জন্যে, কিন্তু অভ্রান্তভাবে প্রমান রেখে গেছে যে বেহুলা-লখিন্দর কাহিনীর সম্পূর্ণতা বিধানে তাদেরও অবদান আছে। সায় সদাগর, কুল পুরোহিত জনার্দন, বেহুলার ভায়েরা, রাখালেরা, গোদা, চাঁদের প্রথম ছ'টি পুত্রের অবধায়ক বরুণ, এমন কি স্বয়ং মহাদেবও সীমিত পরিসরে অর্থপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

কাহিনীমূলক রচনার প্রতিটি চরিত্র কোন না কোন ভাবে কাহিনীর গতিশীলতায় সাহায্য করে। এর মধ্যে কোন কোন চরিত্র ব্যষ্টি চিহ্নিত, কোন কোনটি বা শ্রেণী প্রতিনিধিরূপে উপস্থাপিত। তবে ভূমিকা যাই হোক না কেন, কাহিনীর মূল সূত্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটি নিগূঢ় হওয়া উচিত। আলোচ্য কাব্যটির ক্ষেত্রে কবি দ্বারিকা দাস, চরিত্র সংযোজনের এই নীতি নিপুনতার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। কাহিনী এবং সর্ববিধ চরিত্রের মধ্যে এইভাবে অচ্ছেদ্য যোগসূত্র নির্মাণ প্রতিভার পরিচায়ক।

নাম-প্রসঙ্গ

ব্যক্তি বা বস্তুর নাম যে শুধুমাত্র তাদের পরিচয় বহন করে, এ কথা বলা সঙ্গত নয়। নামের অন্তরালে নামীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে থাকে। নাম বিশ্লেষণ করলে তাই নামীর সেই বৈশিষ্ট্যটি খুঁজে পাওয়া যায়। কাব্যে, সাহিত্যে, ধর্মশাস্ত্রে প্রাচীন ও মধ্যযুগে যে সব নাম ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি যথেষ্ট অর্থবহ। বিশেষ করে ধর্মকেন্দ্রিক কাব্যে নামের রূপকধর্মিতা সমালোচকরা স্বীকার করে নিয়েছেন।

মনসামঙ্গল কাব্যের চরিত্র-নামগুলি তাদের ব্যবহার বৈশিষ্ট্য এবং বৃত্তি-বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশ করে। চন্দ্রধর শিবের অন্যতম নাম। এরই সংক্ষিপ্ত রূপ 'চাঁদ'। চাঁদ সদাগর ছিলেন শিবভক্ত। এ ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় ও শ্রদ্ধাবান এক হয়ে গিয়েছেন। শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, 'শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ' (১৭/৩)। মানুষ শ্রদ্ধাময়, কারণ যিনি যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত তিনি সেইরূপই হন। চাঁদ সদাগর অন্তরে এবং বাহিরে শিবময়।

সন্ শব্দ সাধু বা পুণ্যাত্মা অর্থবোধক। সনকা নামটি ধর্মপরায়ণতার প্রতীক। অমলা চিত্তমালিন্যহীন নারীর নাম হিসেবে সার্থক। তাই বলা যায় যে সনকা এবং অমলা দুটি নারী চরিত্রই ধর্মপরায়ণা এবং সাধ্বী। সমগ্র কাব্যের মধ্যে এঁরা আদর্শ মাতৃমূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

লখিন্দর শব্দটি মূলতঃ লক্ষ্মীন্দ্র শব্দ থেকে উৎপন্ন। লক্ষ্মীন্দ্র শ্রী ও ঐশ্বর্যের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক শব্দ। কাব্যের মধ্যে লখিন্দরকে অতুলনীয় রূপ আর অশেষ ধনসম্পদের অধিকারী রূপেই দেখা যায়। বেহুলা এবং অপভ্রংশ বেউলা শব্দ দুটি সমার্থক। বেউলা শব্দের অর্থ বালবিধবা নারী। কাহিনীর মধ্যে বেহুলাকে বিবাহের রাত্রেই বিধবা হতে দেখা যায়। 'নেত' শব্দের অর্থ সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র। নেতাই বা নেতু ছিল দেবদেবীর পরিধেয় বস্ত্র পরিষ্কার করার বৃত্তি ধারিনী রমণী। কাহিনীর মধ্যে তাকে স্বর্গের রজকিনী এবং দেবী মনসার পরামর্শদাত্রীরূপে উপস্থিত করা হয়েছে।

'মনঃ ভক্তাভিষ্ট পূরণায় মননং অস্তস্যা ইতি মনসা'। ভক্তের মানস-অভিষ্ট পূরণ করেন বলেই ইনি মনসা। 'বিষং সংহর্তুমীশা সা তেন বিষহরীতি সা'- বিষসংহারে ইনি সমর্থা তাই ইনি বিষহরী। এর উপাসনায় চাঁদ সদাগর ধন-সম্পদ আর মৃত পুত্রদের ফিরে পেয়েছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে মনসোপাখ্যানে এ কথা ও বলা হয়েছে, ধনবান পুত্রবাংশ্চৈব কীর্তিংমাংশ্চ ভবেদ্ ধ্রুবম্'। এঁর নাম সম্পর্কে আরও বলা যায় যে ইনি মহাদেবের মানস চাঞ্চল্য সম্ভূতা, তাই মনসা। ভিন্ন কাহিনীর ভিত্তিতে আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে কশ্যপ মুনির মানসী কন্যা বলেই ইনি মনসা। ইনি মনে মনে পরমাত্মাকে ধ্যান করেন বলেও এঁর নাম মনসা। অতএব এ কথা অসঙ্কোচে বলা যায় যে মনসামঙ্গল কাব্যের নামগুলি অর্থবোধকই শুধু নয়, এ গুলি নামধারী ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ও পরিচায়ক।

সাতালি পর্বত নামটিও বিশেষ অর্থের ইঙ্গিত দেয়। সপ্ত তালবৃক্ষের উচ্চতার সমাহার সাতালি এই অর্থ একান্তই কল্পনা প্রসূত নয়। কাব্যের মধ্যে বিশ্বকর্মার লৌহবাসর নির্মাণের বর্ণনায় বলা হয়েছে—

বিশ্বকর্মা পাতে শাল অগ্নি উঠে সাত তাল
অস্ত্রাঘাতে লোহারে গলায়॥ (পৃঃ ৪০)

এখানে 'সাত তাল' এই উপমানটি অগ্নি কী পরিমান উচ্চ শিখা বিস্তার করেছিল, তারই পরিচয় দেবার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব সাতালি 'সপ্ততাল' শব্দেরই অপভ্রংশ এবং এক্ষেত্রে উচ্চতা বোঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে, অবশ্যই বলা যায়।

দ্বারিকা দাসের কাব্য-বৈশিষ্ট্য ও ভৌগোলিক জ্ঞান

চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য যাত্রার পথ আর কলার মান্দাসে বেহুলার সমুদ্র যাত্রার পথ বর্ণনা সব মনসামঙ্গলেই আছে। এ ছাড়া অন্যান্য প্রসঙ্গে ও কিছু স্থাননাম উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের সমস্ত সমালোচক এ বিষয়ে একমত যে এই নামগুলি কোন ভৌগোলিক সত্যের ইঙ্গিত দেয় না। এমন কি নামগুলি যে ক্রমপর্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে, তার মধ্যেও যুক্তিসঙ্গত পারম্পর্য নেই। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে, অধিকাংশ নামই বাস্তব অর্থাৎ সেগুলি পরিচিত স্থান নাম। কিছু কাল্পনিক নাম সেগুলির সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে অবশ্যই।

চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য তরীগুলি যে পথ দিয়ে অগ্রসর হয়েছে তার বর্ণনায় এসেছে নীলগিরি, সেতুবন্ধ, লংকা, বানপুর, খণ্ডদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের নাম। তার পর উল্লিখিত হয়েছে হাত্যাদহ, শংখদহ, কড়্দহ, কংকড়িদহ এবং কালীদহের নাম। বলা বাহুল্য যে 'দহ' যুক্ত নামগুলি স্থান নাম নয়, সমুদ্রের মধ্যে কতকগুলো ঘূর্ণাবর্তের নাম। এই কাব্য খানিতে স্থাননাম যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে এই অনুমানই সমীচীন যে, দ্বারিকা দাসের মতে চাঁদ সদাগর তাঁর বাণিজ্য তরীগুলোকে নিয়ে নীলগিরি পর্বতমালার পাশ দিয়ে গিয়ে সেতুবন্ধ পেরিয়ে লংকায় গিয়ে পৌঁচেছিলেন। এই পথে 'হারমাদ'দের উপদ্রবের কথা কবি উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ষোড়শ শতাব্দী থেকেই মগ আর পর্তুগীস্ জলদস্যুদের আক্রমণের ভয়ে সমুদ্রগামী নৌবহর সন্ত্রস্ত থাকত। বংশীদাসের কাব্যে 'মঘ ফিরিঙ্গী'র উল্লেখ পাওয়া যায়।

অনেকগুলি গ্রাম বা নগরের নাম একত্রে পাওয়া যায় লখীন্দরের বিবাহ

প্রসঙ্গে। কোন কোন জায়গা থেকে বণিকেরা বিবাহে যোগদানের জন্যে এসেছিল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে অনেকগুলি নাম কবি উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া বেহুলার জন্যে উপযুক্ত পাত্র কোথায় পাওয়া যেতে পারে তাঁর উল্লেখ করতে গিয়ে কুল-পুরোহিত জনার্দন ও বেশ কিছু জায়গার নাম বলেছে। সব মিলিয়ে যে নামগুলি পাওয়া যায় তা হোল উজানি, নিছানি, বর্ধমান। হুগলী, কাজলা, রামকুণ্ড, আম্বুআ, সপ্তগ্রাম, চাতরা, ত্রিবেনী, বালিয়া এবং ভূরসিট।

মান্দাস ভাসিয়ে বেহুলার যে যাত্রা তার পথবর্ণনায় কবি কতকগুলি স্থান, ঘাট এবং দহের নাম উল্লেখ করেছেন। কাব্যের বর্ণনা অনুসরণে নামগুলি উল্লেখ করলে দাঁড়ায়,—গাঙ্গুড়ির খাল, চাঁপাতলা, হাত্যাদহ, যুধিষ্ঠিরপুর-গোবিন্দপুর, বর্ধমান, খুড়পুর, কেদারঘাট রাখালঘাট, গোদারঘাট, হুগলী, ত্রিবেণী, কুকুর ঘাট, গোয়ালিনী ঘাট, বোদাল্যার দহ এবং নেতার ঘাট।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল সম্পাদনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য তাঁর ভূমিকায় এই স্থান-নাম-গুলির আলোচনায় বলেছেন যে, ঐ কাব্য যে বাইশটি জায়গার নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে চৌদ্দটি ঘাট বা গ্রাম দামোদর আর তার শাখানদীর উভয় তীরে এখনো বর্তমান। দ্বারিকা দাসের কাব্যে যে সব নাম পাওয়া যায় তার সঙ্গে কেতকাদাসের উল্লিখিত কিছু নামের সামঞ্জস্য আছে। এ অবস্থায় বহুনাম যে বর্জিত বা পরিবর্তিত হয়েছে তাতে মতপার্থক্যের অবকাশ নেই। এ বিষয়ে তাই বিশদ আলোচনা অন্তত কাব্যখানির রস-প্রতীতিতে যে সাহায্য করবে না তাতে সন্দেহ নেই।

সমাজ চিত্র

মধ্যযুগীয় সাহিত্যের বিষয়বস্তু অসংখ্য নয়। অল্প কয়েকটি মৌলিক কাহিনীকে অবলম্বন করে এ যুগের সাহিত্য গড়ে উঠেছে। তবুও যে এগুলি একই ঘটনার ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি হয়ে ওঠেনি বা বর্ণনাগুলি কোন একক রীতি অনুসরণ করেনি, তা আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যেরই কারণ। রাম-সীতার মৌলিক কাহিনীটি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপে বর্ণিত হয়েছে। এই রূপবিভিন্নতা কখনো কবি কখনো বা কালনির্ভর। এর ফলে প্রতিটি রামায়ণ বিশিষ্ট, সুখপাঠ্য এবং সমকালীন সমাজচিত্র হিসেবে অনেকখানি নির্ভরযোগ্য।

ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ—এই সুদীর্ঘ ছ'শ বছর ধরে বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি গড়ে উঠেছে। এগুলির কেন্দ্রগত কাহিনী এবং রচনাগত উদ্দেশ্য একই। তবু প্রযুক্তির বিচারে এগুলির প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত রচনা হয়েও যথেষ্ট পরিমানে কাব্যগুণান্বিত। যতদিন এগুলি মৌখিক রূপের সীমায় আবদ্ধ ছিল, অনুমানে বাধা নেই, তখনো ব্যক্তিচিহ্নিত বৈশিষ্ট্য তাদের প্রত্যেকটিকে আকর্ষণীয় করে রেখেছিল। তারপর শক্তিমান কবিদের লেখনীস্পর্শে ঐ সব পাঁচালী শ্রেণীর রচনাগুলি কাব্যে রূপান্তরিত হোল। কিন্তু এই পর্যায়ে এসে ও কাব্যগুলি স্থানবর্ণিমা, যুগচিত্র এবং কবিদের মানসস্বাতন্ত্র্য বহন করে বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে সমর্থ হোল। একই কাহিনীর কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ থেকেও কাব্যগুলির প্রত্যেকটি মৌলিক।

দ্বারিকা দাসের মনসামঙ্গলের কাহিনী এবং বিজয়গুপ্ত বা নারায়ণ দেব বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে বড় একটা পার্থক্য চোখে পড়ে না। তবু এঁদের প্রত্যেকের কাব্য যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে তার প্রধান কারণ ঐ স্থানবর্ণিমা, কালচিত্র এবং কবির ভাবনাবৈশিষ্ট্যের কাব্যিক প্রতিফলন। অবশ্য এ কথাও এই প্রসঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে, এই বৈশিষ্ট্যের ফলে কোন কাব্যের জনপ্রিয়তা এবং প্রচার বিশেষ অঞ্চলের মধ্যেই সুদীর্ঘকাল সীমাবদ্ধ থেকেছে।

দ্বারিকা দাস মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম অঞ্চলে গিয়েও যে উৎকল সংস্কৃতি-মণ্ডলের অন্তর্বর্তী ছিলেন, ঐ অঞ্চলের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করা হয়েছে। কাব্যটির মধ্যে যে সামাজিক রীতিনীতি ও লোকাচারের সন্ধান পাওয়া যায়, তা আমাদের পূর্বোল্লিখিত অভিমতকেই সমর্থন করে। পরিবারে সন্তান জন্মের বা সন্তানের বিবাহের সময় যে সব আচার অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় সেগুলির পেছনে শাস্ত্রীয় সমর্থন অল্প হলেও, সেগুলিকে কেন্দ্র করে লোকাচারগত সংস্কার প্রাধান্য পায়। এর দ্বারা কাব্য সাহিত্য ও সমাজের মধ্যে যে নিগূঢ় সম্পর্কটি আছে তারই প্রমাণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দ্বারিকা দাসের কাব্যে আঞ্চলিক সংস্কারাশ্রিত লোকাচারের প্রতিফলন যথেষ্ট পরিমানেই ঘটেছে। এর বিশদ আলোচনার সুযোগ পরে গ্রহণ করা যাবে।

হাস্যরস

বাঙালীর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ রসিকতা এবং রহস্যপ্রিয়তা দ্বারিকা দাসের কাব্যে যথোচিত মার্জিতরূপেই স্থান পেয়েছে। বেহুলা যখন নদীপথে চলেছেন

তখন রাখাল ঘাট আর গোদার ঘাটের ঘটনাগুলি হাস্যরসের উদ্রেক করে।

মনসার ভাসান গানটি মূলতঃ বেহুলা লখিন্দরের করুণ কাহিনীকে কেন্দ্র করেই রচিত। মনসার হাতে চাঁদ সদাগরের লাঞ্ছনা দিয়ে এর সূত্রপাত আর শোকাকুল চাঁদ পরিবারের উপস্থিতিতে বেহুলা-লখিন্দরের স্বর্গ প্রত্যাগমনে এর পরিসমাপ্তি। চাঁদ তাঁর মৃত পুত্রদের এবং নিমজ্জিত তরীগুলিকে ফিরে পেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু বেহুলা লখিন্দরের বিদায় দৃশ্য সমস্ত কিছুর প্রাপ্তিজনিত আনন্দকে বেদনাবিধুর করে তুলেছে। অতৃপ্তি আর নৈরাশ্যের ছায়া প্রাপ্তির সমস্ত গৌরবকে ম্লান করে দিয়েছে। অতি পরিচিত সংসারের চির আকাঙ্ক্ষিত সুখ শান্তিকে তুচ্ছতার স্পর্শে মূল্যহীন করে দিয়ে বেহুলা-লখিন্দরের যাত্রাপথ যেন নূতন সত্যের সন্ধান দেয়। যে বাণীটি পাঠকের অন্তরে ধ্বনিত হতে থাকে তা হোল, 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে'। বৈরাগ্যের গৈরিক আচ্ছাদনে পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ঢাকা পড়ে যায়, এক হয়ে যায় মৃত্যু ও অমৃত, আনন্দ ও বেদনা।

সমগ্র মনসামঙ্গল কাব্যে ব্যথা বেদনার প্রবল আঘাত আমাদের অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। কিন্তু তা যাতে শেষ পর্যন্ত আমাদের হৃদয়বৃত্তিগুলিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত না করে ফেলে, মূলতঃ সেই জন্যেই কাহিনীর মধ্যে সূক্ষ্ম হাস্যরসের অবতারণা করা হয়েছে। এতে সংবেদনশীল মনের ওপর থেকে বেদনার বোঝা কিয়ৎকালের জন্যে অপসারিত হয়েছে আর কয়েকটি হাস্যকর চরিত্র উপস্থিত হয়ে অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষুগুলিকে কৌতুকহাস্যে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

শোক, ধৈর্য এবং অটল সংকল্পের প্রতিমূর্তি বেহুলা পতির মৃতদেহ নিয়ে কলার মান্দাসে ভেসে চলেছেন। রাখালেরা নদীর তীরে গোচারণে ব্যাপৃত ছিল। সুন্দরী বেহুলাকে একা ভেসে যেতে দেখে তারা উৎসাহিত হয়ে উঠল। তারা আহ্বান জানালো—

বলে কোথা যাও ফিরাও মান্দাস
ভুবনমোহিনী রামা।
আস মোর ঘরে যে চাহিবে তোরে
তোষিব সে দ্রব্যে তোমা॥ (পৃ ১৫)

এরা রাখাল, এদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিশ্রুতিটিও তাই খাদ্য—নির্ভর। এরা বলেছে, 'দধি দুগ্ধ সর, খাবে গো বিস্তর, ঘৃত ভাতে নিরন্তর।' কিন্তু

এখানেও সুন্দরী রমণীকে কেন্দ্র করে সেই চিরন্তন প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রথম প্রার্থী যে নিতান্তই অযোগ্য তা প্রমান করবার জন্যে এগিয়ে এলো দ্বিতীয় রাখাল। সে ঘোষণা করল,

এ বড় কাঙ্গাল স্বভাবে রাখাল
আমি অতি ভাগ্যবান।
আস মোর বাদে দেখনা হরিষে
বিধির দুর্লভ স্থান॥ (পৃ ৯৫)

দ্বিতীয় এই রাখাল যে বেশ বুদ্ধিমান তাতে সন্দেহ নেই। তার প্রতিশ্রুতির মধ্যে তাই খাদ্যদ্রব্যের উল্লেখ রইল না। সে বলল, 'সুবর্ণের চুড়ি, দিব পাট শাড়ি, শয়ন পালঙ্ক পরে'।

এদের প্রস্তাবগুলি যে কোন নারীকে প্রলোভিত করার পক্ষে ছিল যথেষ্ট। এমন কি সাম্প্রতিক কালের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখলেও খাদ্য এবং ব্যবহার্য বস্তুর তালিকা পরম প্রার্থনীয় বলেই মনে হবে। কিন্তু বেহুলা তীব্রভাবে র্ভৎসনা করলেন, বললেন,

না জান সুশ্রব কথা।
ধেনু লয়্যা বনে ফির রাত্রি দিনে
নব নব তৃণ যথা॥
দেখি পরনারী শংকা দূর করি
লয়্যা যাতে চাহ বাসে।
যত বড় ধনী অনুমানে জানি
গোধন পালক আশে।
যদি ঘরে অন্ন থাকিত বসন
তবে কি এ দুঃখ বাস।
ভাল মন্দ কর্ম নাই জান ধর্ম
ভব্য সঙ্গে নাই বৈস॥ (পৃ ৯৬)

এই দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি ঘটল গোদার ঘাটে। সেখানে গোদ আর বিপুল কুঁজওয়ালা মানুষটি ও বেহুলাকে ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠল। ঘরে তার ছ'টি পত্নী বর্তমান। সে বেহুলাকে সপ্তম পত্নী হবার জন্যে আহ্বান জানালো। অবশ্য গোদা সেই সঙ্গে এ প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে যে—

দাসী করে দিব এ ছয় জনা।
মারকাট নাই করিব মানা ॥ (পৃ ৯৯)

তারা সবাই বেহুলার দাসী হয়েই থাকবে। গোদার দেওয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তালিকাটিও বেশ লোভনীয় করেই রচিত। সে বলেছে—

পালঙ্ক উপরে থাকিবে সুখে।
নানা আভরণ পরাবো তোকে ॥
দধি অন্ন ঘৃত প্রস্তর থালে।
পাকা পান দিব সিন্দুর ভালে ॥
হরিদ্রা চন্দন মাখিবি অঙ্গে।
তুলা জলে স্নান করিবি রঙ্গে ॥ (পৃ ৯৯)

বেহুলা গোদার প্রস্তাব শুনে তাকেও ভর্ৎসনা করেছেন, বলেছেন—

উঠিতে না পার গোদের ভারে।
নিদারুণ কন্যা দিলে কে তোরে ॥
পিঠে তিনি কুঁজ বিরল কেশ। .
তৈল বস্ত্র বিনু চণ্ডাল বেশ ॥
ভূত প্রেত তোর এ রূপ দেখি।
পালাইবে দূরে হৈয়া বিমুখী ॥ (পৃ ৯৯)

যাই হোক, গোদা শেষ পর্যন্ত নিজের অন্যায় আচরণের জন্য অনুশোচনা করেছে আর বেহুলাকে 'দেবকন্যা' স্বীকার করে নিয়ে তাঁর কাছে সুস্থ সুন্দর দেহ প্রার্থনা করেছে। বেহুলা তাকে আশীর্বাদ করে বলেছেন, 'সর্বাঙ্গে সুন্দর হৈয়া যাও নিজ পুরি'। সতী নারীর বরে গোদা অপূর্ব সুন্দর দেহের অধিকারী হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছে। কিন্তু সে বেচারা জানতো না যে তার এই বিজয়দৃপ্ত প্রত্যাবর্তন তার পক্ষে পরম ট্রাজেডীর কারণ হয়ে উঠবে।

গোদ-কুঁজ-বিহীন মনোরম দেহের জন্য আনন্দে উৎফুল্ল গোদাকে তার প্রথমা পত্নী 'মাধার মা' চিনতেই পারলো না। তাকে পর-পুরুষ মনে করে সে বলে উঠল—

বলে নারী কোথা হৈতে আইলি বাতুল।
ক্রোধভরে বাম হাতে ধরে তার চুল ॥
ঝাটামুণ্ডা গণ্ডা দশ মারে তার ঘাড়ে।
পড়শীরে বিপরীত গোদা ডাক ছাড়ে ॥ (পৃ ১০২)

পড়শীরা দৌড়ে এলো কিন্তু তারাও গোদাকে চিনতে পারলো না। বেচারার লাঞ্ছনা বেড়েই গেল তাতে। শেষ পর্যন্ত গোদা নদীর ঘাটে ফিরে এসেছে আর বেহুলার কাছে কাতর প্রার্থনা জানিয়ে পূর্বের গোদ কুঁজ ফিরে পেয়েছে। এর পর গোদার শান্তি ফিরে এসেছে। সে নিগ্রহের হাত থেকে বেঁচেছে।

গোদা আর রাখালদের নিয়ে যে কৌতুক আর আনন্দ তা যে অনেকখানি দুঃখেরই নিকটবর্তী, অস্বীকার করার উপায় নেই। আমাদের চিন্তাজগতে যে সুসঙ্গত ধ্যান ধারণা বর্তমান, তার মধ্যে ন্যায় অন্যায় সম্পর্কিত বিচার বুদ্ধি ও সুনির্দিষ্ট রূপেই অবস্থিত। কোন কারণে আমাদের সেই চিরাভ্যস্ত চিন্তার সমান্তরাল ক্ষেত্রে যখন নিতান্তই অসঙ্গত কোন দৃশ্যের অবতারণা ঘটে, আমাদের মনে মৃদু এক ধরণের বেদনাবোধ সৃজিত হয়। আমরা যে হাস্যরসের সন্ধান এই কাব্যের মধ্যে পাই তা মূলতঃ এই বেদনাবোধ থেকেই সৃষ্ট। দ্বারিকা দাস কৃত মনসামঙ্গলের মত ট্রাজিক কাব্যের মধ্যে এই বেদনাবোধসঞ্জাত হাস্যরস তাই কাব্যের মৌলিক ট্রাজিক অনুভূতিকে তীব্রতরই করে তোলে। তাছাড়া, কাব্যের মধ্যবর্তী এই কৌতুকপ্রদ চিত্রাবলী করুণরসের দীর্ঘকাল ব্যাপী আয়োজনের একঘেয়েমিটিকে সাময়িকভাবে কৌতুকরসে পরিবর্তিত করে বৈচিত্র্য সৃজন করেছে। সেদিক থেকেও এই পরিকল্পনার মূল্য যথেষ্ট।

জন্মান্তরবাদ ও রামায়ণের প্রভাব।

মঙ্গলকাব্যের প্রখ্যাত সমালোচক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এই কাব্যধারায় জন্মান্তরবাদের প্রভাব স্বীকার করে নিয়েছেন[১]। প্রকৃতপক্ষে, হিন্দুর ধর্মচেতনার সঙ্গে জন্মান্তর সংক্রান্ত বিশ্বাস ওতপ্রোতভাবেই বিজড়িত। বেদের মধ্যেই পুনর্জন্ম সম্পর্কে নানারকম আলোচনা আছে। উপনিষদগুলির মধ্যে বৃহদারণ্যকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ছায়া আর নীলাম্বরের বেহুলা-লখিন্দর হয়ে জন্মলাভ করার যে কাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছে, তাতে ঐ জন্মান্তরবাদের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাছাড়া বেহুলা, সনকা প্রভৃতি চরিত্রগুলির কথোপকথনের মধ্যেও এই বিশ্বাসের উল্লেখ আছে।

বেহুলা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে তাঁর অকালবৈধব্যের ঘটনায় প্রাক্তনেরই প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি বলেছেন,

> কারো আমি সুখ কর‍্যাছি বিমুখ।
> সেই হৈতে অল্প কালে নিদারুণ দুখ॥ (পৃ ৭২)

১। ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ৪র্থ সং, ১৯৬৪, পৃঃ ৭২

আবার এ কথাও বলেছেন,

পূর্বে আমি কার সুখ কর‍্যাছিখণ্ডন।
নিদারুণ দুঃখ মোর হৈল তে কারণ। (পৃ ৭২)

সনকার কথায় এর প্রতিধ্বনি শোনা যায়। লখিন্দরের মৃত্যুর জন্যে পুত্রবধূ বেহুলাকে র্ভৎসনা করে তিনি বলেছেন—

খণ্ডকপালিনী নারী খণ্ডতপ পূর্বে করি
খণ্ডাইলে আসি মোর সুখ। (পৃ ৭৬)

সনকা যখন নিজেকে নির্মমভাবে ধিক্কার দিচ্ছেন, তখনো তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'কত জন্ম পাপফলে, এ দুঃখ আমার কুলে'।

হিন্দুরা প্রাক্তনে বিশ্বাসী। কাব্যে, সাহিত্যে যখন সমাজমনের প্রতিফলন ঘটেছে তখন জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসটিও অভ্রান্তভাবে এগুলিতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

অগ্রজ রামায়ণের প্রভাবটিও লক্ষনীয়। মনসা যখনই কোন দুরুহ কাজের কথা ভেবেছেন, ঠিক তখনই স্মরণ করেছেন বীর হনুমানকে। হনুমানও প্রতিটি ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান সেবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সুষ্ঠুভাবেই ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেছে। রামভক্ত হনুমান কবে থেকে এবং সঠিক কী কারণে যে মনসাভক্ত হয়ে উঠল তার কোন ইঙ্গিত কাব্যের মধ্যে নেই। তবে হনুমান চীরজীব-সপ্তকের অন্যতম এবং অঘটনঘটনপটু একটি অতি পরিচিত চরিত্র। যেখানেই দুরুহ কর্ম সম্পাদনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, সেখানেই হনুমানকে স্মরণ করেছেন মনসা এবং সে এসে অবলীলাক্রমে কাজটি নিষ্পন্ন করেছে।

চাঁদের বাণিজ্য তরীগুলোকে নিমজ্জিত করার ইচ্ছে হোল মনসার। নেতুর পরামর্শে তিনি হনুমানকে স্মরণ করলেন। সে এসে অনায়াসে সাতটি নৌকো ডুবিয়ে দিয়ে চলে গেল। এর পরেও দু'বার হনুমানের আবির্ভাব ঘটেছে কাব্যের মধ্যে নির্বিবাদী আদেশপালকের ভূমিকায়। সব শেষে যখন বেহুলার প্রতি দয়া-পরবশ হয়ে মনসা চাঁদের সাতটি বাণিজ্যতরী প্রত্যর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তখন—

মনসা মনের মধ্যে করিলেন ধ্যান।
সমুদ্রের জলে গিয়া উলে হনুমান॥
হেইখানে চাঁদবাণ্যা ডুব্যাছিল নায়।
চরণ হিলায়্যা জলে দেখিবারে পায়॥

সপ্তডিঙ্গা জলে তুলে পবননন্দন।
আনিয়া নেতুর ঘাটে করিল বন্ধন॥ (পৃ ১৪২)

রামায়ণের প্রভাব ভিন্নতর ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। চাঁদ নৌকোডুবীর পর আশ্রয়হীন অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে পুরোনো বন্ধু ধর্মদাসের গৃহে উপস্থিত হলেন। এক বন্ধুর বিপদে সাহায্য করাই অন্য বন্ধুর কর্তব্য। তবুও ধর্মদাসকে তাঁর কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে চাঁদ বলেছেন—

যবে রঘুনাথ গেল বনে।
সঙ্গে লয়্যা জানকী লক্ষণে॥
সীতারে হরিল দশশির।
কান্দিয়া আকুল রঘুবীর॥
মৈত্র কৈল সুগ্রীবের সাথে॥
বালীবধ করি শরাঘাতে॥
মৈত্রে দিলা রাজ্য বল সুখ।
সে পুন হরিল তার দুখ॥
সঙ্গে লয়্যা নানা বীরগণ।
সমুদ্র বান্ধিয়া কৈল রণ॥
রাবনের বংশ বধ করি।
উদ্ধারিল জনক কুমারী॥
জটায়ু নামেতে পক্ষী ছিল।
মৈত্রের কারণে প্রাণ দিল॥ (পৃ ১৩)

আরও একটি ঘটনা বিচার করা যায়। লৌহবাসরের মধ্যে বেহুলা ক্ষুধার্ত লখিন্দরের জন্য অন্ন প্রস্তুত করেছেন। পরিতৃপ্তভাবে আহার করার পর লখিন্দর বেহুলাকে অবশিষ্টাংশ আহার করবার জন্যে অনুরোধ করলেন। বেহুলা বিবাহের রাত্রে কোনপ্রকার খাদ্য গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন, উপরন্ত দৈববাণী হোল, 'নারিবে বাঁচাতে কৈলে উচ্ছিষ্ট ভোজন' অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট ভোজন করলে বেহুলার পক্ষে লখিন্দরকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হবে না। অগত্যা বেহুলা করজোড়ে মাতা বসুন্ধরাকে অনুরোধ জানালেন তাঁকে ঐ সমস্যা থেকে রক্ষা করবার জন্যে। একদিকে স্বামীর আদেশ খাদ্য গ্রহণ করবার জন্যে, অন্যদিকে তা না করতে দৈবাদেশ। এই অবস্থায়, 'শুনিয়া তাহার স্তুতি, সন্তোষ হইল

ক্ষিতি, বিদীর্ণ হইল বসুন্ধরী'। বিদীর্ণ বসুন্ধরার অভ্যন্তরে অবশিষ্ট খাদ্য রেখে দিয়ে বেহুলা সমস্যাটির সমাধান করলেন। এই আখ্যানাংশটি রামায়ণের সেই অংশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেখানে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেবার প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ সীতা মাতা বসুন্ধরাকে আহ্বান জানিয়েছিলেন 'তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি'।

শুধু কি এই? ছোটখাটো এমন বহু উক্তি এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে যা থেকে রামায়ণের প্রভাব সম্পর্কে স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তে সহজেই উপনীত হওয়া যায়। বেহুলা কলার মান্দাসে মৃতপতিকে নিয়ে ভেসে চলেছেন। কবির মনে যে উপমানটি স্বাভাবিকভাবে জেগে উঠল, তা হোল যেন 'বনবাসে যায় জনক কুমারী'। অতএব রামায়ণের প্রভাব সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশই আর থাকে না।

পূর্ববর্তী মহৎ কাব্য থেকে প্রেরণা বা উদাহরণ সংগ্রহ রীতিসিদ্ধ। রামায়ণের প্রভাব বা উদাহরণ তাই কিছু মাত্র ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে না। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে চৈতন্যোত্তর যুগে উৎকল ও বঙ্গদেশের শিল্প ও সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব সুস্পষ্টভাবেই দেখা গিয়েছিল। যতদূর অনুমিত হয়, অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সেই প্রভাবকালের সীমা বিস্তৃত। দ্বারিকা দাসের মনসামঙ্গল এর ব্যতিক্রম নয়।

সাধারণভাবে মঙ্গলকাব্যগুলির কোন কোন অংশে গ্রাম্যতাদোষ লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গতঃ, ডঃ আশুতোষ দাস ও পণ্ডিত সুরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলের উল্লেখ করা যেতে পারে। এটির আখ্যানগ্রন্থন ও কবিত্ব বেশ উচ্চস্তরের কিন্তু লখিন্দরের কামুক রূপ এবং মাতুলানীর সঙ্গে তার গর্হিত সম্পর্ক নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় নয়। অথচ এটির রচনাকাল সপ্তদশ শতকের শেষ বা অষ্টাদশের প্রথম অংশ বলেই অনুমিত।

দ্বারিকা দাসের কাব্য এই শ্রেণীর স্থূলতা থেকে সম্পূর্ণরূপেই মুক্ত। অনুমানে বাধা নেই যে, এই সাধক কবির কাব্যে পূর্বকালীন মহাজীবনের এবং আপন সংযত ও ধর্মনিষ্ঠ জীবনের প্রভাব একত্রিত হয়ে একটি সুচিন্তিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত মানসিকতার পটভূমি সৃজন করেছে। বেহুলার যে সংসারের প্রতি অনাসক্তি, তার মধ্যেও এই দ্বৈতজীবনের প্রভাব সুস্পষ্ট। মার্জিত রুচি ও সেই সঙ্গে

উচ্চকোটির জীবনাদর্শ ও শালীনতাবোধ দ্বারিকা দাসের কাব্যটিকে যথেষ্ট পরিমানে মর্যাদাসম্পন্ন করেছে।

অভিজ্ঞতা ও প্রৌঢ়োক্তি

কবি দ্বারিকা দাসের পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে বলা হয়েছে যে উনি সাধু প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন। এ বিশ্বাস তাই অনায়াসে গড়ে ওঠে যে হিন্দুর বিভিন্ন শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর নিবিড় জ্ঞান ছিল। তাছাড়া সুদীর্ঘ জীবনে বহু মানুষের সংস্পর্শে আসার ফলে তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধিটিও নিশ্চয় যথেষ্ট পরিমাণে বর্ধিত হয়েছিল। তিনি যে শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন তার নিখুঁত পরিচয় ওড়িয়া কাব্যগুলির মধ্যে ধরা পড়েছে। শুধু মাত্র 'পরচে চূড়ামণি' কাব্য গ্রন্থের ভূমিকাটুকুই প্রমাণ করে যে তিনি শাস্ত্রজ্ঞ এবং দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন।

মানুষের ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে বহির্জগতের যে অবিরত মিথস্ক্রিয়া চলেছে, তারই ফলে প্রতিনিয়ত বর্ধিত হচ্ছে তার অভিজ্ঞতার বিচিত্র ভাণ্ডার। জগৎ ও জীবনসত্যের চিরন্তন স্বরূপটি এরই ভেতর দিয়ে বিস্ফারিত হচ্ছে। যাঁর জীবনযাপনের ক্ষেত্র যত বৃহৎ, তাঁর মিথস্ক্রিয়ার পরিমান তত বেশী এবং সত্যোপলব্ধির পরিমান এবং গভীরতাও তেমনি বেশী। প্রজ্ঞাদৃষ্টি সম্পন্ন কবিকে তাই যুগে যুগে মনীষী এবং স্রষ্টার সম্মান দেওয়া হয়েছে।

কবির মিথস্ক্রিয়া এবং প্রজ্ঞাদৃষ্টিসঞ্জাত জীবনদর্শনের প্রমাণ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে মণিমুক্তার মত ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে সেগুলি আহরণ করা এবং সেগুলির রসাস্বাদন করা শ্রদ্ধাবান পাঠক মাত্রেরই কর্তব্য। এগুলি প্রৌঢ়োক্তি এবং এগুলি শাশ্বত কালের সম্পদ। কয়েকটি উদাহরণ—

> প্রাণ বড় ধন প্রভু অর্থে কিবা করি। (পৃ ২৭)
> নাহি পায় প্রাণী কিছু অপাত্রের ফল।
> কূপজলে নষ্ট যেন হয় গঙ্গাজল॥ (পৃ ৩২)
> সমুদ্রে ভাসিয়া কিবা মরণের ভয়। (পৃ ৮৬)
> ভাই বিনা বন্ধু নাই সংসার ভিতরে। (পৃ ৯০)
> জন্ম হৈলে মরণ আছয় সভাকার।
> ছাড়িলে শরীরে প্রাণ না আসিবে আর॥ (পৃ ৯১)

পরকন্যা পরপুত্রে বিধাতা ঘটন।
একা পতি বিনে গতি নাই নারীজন। (পৃ ২১)
না ধরে শিশুর দোষ জননী কখন। (পৃ ১২৮)

কবি দ্বারিকা দাস যে জ্যোতিষী বিদ্যা জানতেন তার প্রমাণ কাব্যের মধ্যে পাওয়া যায়। বেহুলা আর লখিন্দরের বিবাহ প্রস্তাব চূড়ান্ত ভাবে চাঁদ কর্তৃক স্বীকৃত হবার পূর্বে হিন্দুরীতি অনুসরণে উভয়ের জাতক বিচার করানো হয়েছে। দৈবজ্ঞ জাতক বিচার করতে বসে দেবী মনসার প্রভাবে সত্য গোপন করেছেন। তিনি দেখেছেন, 'সপ্তমেতে শনি রাহু অষ্টমে মঙ্গল'। এতে দম্পতির জীবনে বিপর্যয় ঘটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। দৈবজ্ঞ কিন্তু 'দেবতার মায়া হৈতে বলে ভাল বটে'।

বেহুলা দেবসভায় নৃত্য করবার জন্য প্রস্তুত। শিবের আদেশে দেবতারা এক এক করে তাঁদের বাহনে আরূঢ় হয়ে সভায় উপস্থিত। এই বাহন-বর্ণনাটিও কবি নিখুঁত ভাবেই করেছেন।

লখিন্দরের বিবাহ উপলক্ষে যে সব আতসবাজী জ্বালানো হয়েছিল সেগুলির প্রকার বিচিত্র। এই দীর্ঘ তালিকাটি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে কবির পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল তীক্ষ্ণ। সে কালের বিবাহ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গই ছিল এই সব আতসবাজীর ব্যবহার। কবি লখিন্দরের বিবাহ বর্ণনা করতে গিয়ে এই অঙ্গটিকে বর্জন করেননি বরং যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে প্রত্যেকটি আতসবাজীর উল্লেখ করেছেন। কাব্যের মধ্যে এমনি কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলি কবির বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় দেয়। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিশিষ্ট উদাহরণের সাহায্য গ্রহণ করা যায়।

মনসা রাজী হয়েছেন লখিন্দরের পুনর্জীবন দান করতে। তাঁর আদেশে বেহুলা লখিন্দরের অস্থিগুলিকে এনে দিয়েছেন। এবার মনসা আর নেতু বিষহরণ এবং দেহ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত হলেন। কাব্যের মধ্যে চল্লিশটি ছত্রে এই প্রক্রিয়ার বর্ণনা করা হয়েছে। এই চল্লিশটি ছত্রে (পৃ ১৩১-৩২) বিষ-হরণের যে মন্ত্র বর্ণিত হয়েছে, সাধারণভাবে বলা যায় যে তা অত্যন্ত গোপনীয়। যে সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মন্ত্রসমূহের প্রচলন আছে তারা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে মন্ত্রের গোপনীয়তা রক্ষা করে চলে।

সাপের বিষ নামানোর মন্ত্র সম্পর্কে উল্লেখ অথর্ব বেদ, অগ্নি পুরাণ এবং গরুড়

পুরাণের মধ্যে পাওয়া যায়। নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত বিশ্বকোষ গ্রন্থের মধ্যে (১৩১৭, ২১ শ ভাগ, পৃ ৩০৮) একটি মন্ত্রের উল্লেখ আছে। মন্ত্রটি নিম্নরূপ—

ওঁ জল মহামতে হৃদয়ায় গরুড় বিরল শিরষে, গরুড়
শিখায়ৈ গরুড় বিষভঞ্জন, প্রভেদন প্রভেদন বিত্রাশয়
বিত্রাশয় বিমৰ্দ্দয় বিমৰ্দ্দয় কবচায় অপ্রতিহত শাসনং
বং হুং ফট্, অস্ত্রায় উগ্ররূপ ধারক, সর্ব্বভয়ংকর
ভীষয় সর্ব্বং দহ দহ ভস্মী কুরু কুরু স্বাহা নেত্রায়।'

কাব্যের মধ্যে যে মন্ত্রটি আছে তাতে গরুড়ের নামোল্লেখ আছে আর আছে বিষ ভস্ম হবার কথা। মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চল থেকে আদিবাসীদের ব্যবহৃত যে বিষনামানোর মন্ত্র সংগ্রহ করা গেছে তার মধ্যে 'চিয়ানেতে' শব্দটি আছে। ওরা এ শব্দের অর্থ বলতে পারেনি। শব্দটি দ্বারিকা দাসের কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে। সংগৃহীত মন্ত্রে 'উড়ান' শব্দের ব্যবহার আছে। কাব্যে এই শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে। আর একটি সামঞ্জস্য সংগৃহীত মন্ত্রের সংগে দেখা যায় সেটি হোল এই যে, ঐ মন্ত্রে বিষ 'পানি' হয়ে যাওয়ার কথা কয়েকবারই উল্লিখিত হয়েছে। এদিকে কাব্যে আছে, 'মনসা ডাকেন বিষ ক্রমে হয় জল'।

ডঃ সুকুমার সেন বিষ্ণু পালের মনসামঙ্গল কাব্যটির আলোচনা প্রসঙ্গে যে বিষ নামানোর মন্ত্রটি উদ্ধৃত করেছেন (* ১মখণ্ড অপরার্ধ, ১৯৬৩, পৃ ২৬৭) তার সঙ্গেও দ্বারিকা দাস কর্তৃক উল্লিখিত মন্ত্রের কোন মিল নেই। ওখানে 'পানকৌড়ি' শব্দটি দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে আর দ্বারিকা দাস দু'বার ব্যবহার করেছেন 'পাণিকর্ণ' নামক একটি শব্দ। এই শব্দ দু'টির মধ্যে সামঞ্জস্য সন্ধান কষ্টকল্পনার বিষয়। মনে হয়, কবি দ্বারিকা দাস ভিন্ন কোন সূত্র থেকে মন্ত্রটি সংগ্রহ করেছিলেন।

বেহুলার সঙ্গে তাঁর ছ'জন ভাসুরও পুনর্জন্ম লাভ করে ফিরে এসেছেন। তাঁদের মৃত্যু হয়েছিল লখিন্দরের জন্মের আগে। অতএব তাঁদের মৃত্যু আর পুনর্জন্ম লাভের মধ্যবর্তী কালবিচার করলে দেখা যায় যে যিনি সর্বকণিষ্ঠ তাঁর মৃত্যু হয়েছিল বারো বছরের অনেক বেশী সময় পূর্বে। ওঁদের ঘরে তোলবার জন্যে চাঁদকে আগে মনসা পূজা করতে হয়েছে এবং তারপর—

ইহার উত্তার চাঁদ সদাকর
নিমন্ত্রন দিল যত বণিকের ঘর।

আনি বন্ধুগণ সুজ্ঞানী ব্রাহ্মণ
সাতপুত্র পুনর্বার ঘরে বিবাহন ॥ —(পৃ ১৬৮)

মৃত বলে ঘোষিত কোন ব্যক্তি যদি পুনর্জীবন লাভ এবং সংসারাশ্রমে প্রত্যাবর্তন করে, তাকে চান্দ্রায়ণ এবং প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। যদি দ্বাদশ-বর্ষাধিক কালের জন্যে কোন ব্যক্তি নিরুদ্দেশ ও হয়, তাকেও এই বিধি পালন করে প্রায়শ্চিত্তাদির পর সংসারাশ্রমে প্রবেশ করতে হয়। যম সংহিতায় উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট বিধানটি নিম্নরূপ—

গতস্য ন ভবেদ্ বার্তা যাবদ্ দ্বাদশবার্ষিকী।
প্রেতাবধারণং তস্য কর্তব্যং সুতবান্ধবৈঃ ॥

দ্বাদশবর্ষ বা তদধিক কালের জন্যে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির জন্যে পারিবারিক কৃত্য মৃতব্যক্তিরই অনুরূপ। অতএব এদের পুনর্বিবাহের কথা উল্লেখ করে কবি দ্বারিকা দাস তাঁর গভীর শাস্ত্রজ্ঞানেরই পরিচয় দিয়াছেন।

আলোচ্য কাব্যখানিতে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের নাম ও সঙ্গীত সম্পর্কিত নানা প্রকার উপমার প্রয়োগ, এই বিষয়েও তাঁর অভিজ্ঞতা প্রমাণিত করে।

বেহুলা দেবসভায় নৃত্য করবার জন্যে উপস্থিত হয়েছেন। একে একে দেবতারা নিজেদের বাহনে আরূঢ় হয়ে বেহুলার নৃত্য দেখতে এলেন। তাঁরা বললেন, 'আরম্ভ করহ নৃত্য দেখিব সভায়'। এরপর কবি ছত্রিশটি পংক্তিতে (পৃ ১২৭) এই নৃত্যের বর্ণনা দিয়েছেন। এই অংশটি অত্যন্ত সুখপাঠ্য। বিভিন্ন বোল বা বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি অনুকরণে প্রযুক্ত শব্দসমষ্টির সঙ্গে কবিতার সাধারণ পংক্তির অবাধ মিলন দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন—

ঝুন ঝুন ঝুন নূপুর বলে।
বামা স্বরে গায় পঞ্চম তালে ॥
দ্রিমিকি দ্রিমিকি মৃদঙ্গ ধ্বনি।
তাথই তাথই নাচয়ে ধনি ॥
শূন্যে পাক ধরে চরণ রাখে।
মনসা মনসা রাখগো ডাকে ॥
ইয়া তাইয়া তাইয়া তাতা ধিন তা।
নেতা তাল রাখে না টলে পা ॥ (পৃ ১২৭)

বলা বাহুল্য যে কবি দ্বারিকা দাসের ছন্দ ও টলেনি পংক্তিগুলিতে। এখানে

কবি মৃদঙ্গ, ঝাঁঝর, করতাল, বীণা, প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের নামোল্লেখ করেছেন সব মিলিয়ে তাই অসংকোচে বলতে পারা যায় যে কবির অভিজ্ঞতা শুধু গভীরই ছিল না, বহু বিচিত্র বিষয়কে অবলম্বন করেও তাঁর বহুদর্শিতা গড়ে উঠেছিল। এবং এরই অবশ্যম্ভাবী ফল রূপে কবির বহু উক্তি প্রৌঢ়োক্তির পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

প্রতিপাদ্য বিষয়

মনসামঙ্গল কাহিনীর মূল উদ্দেশ্য যে মর্ত্যলোকে দেবী মনসার পূজা প্রচার, সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে তা কিন্তু প্রমানিত হয় না। প্রসঙ্গান্তরে আলোচিত হয়েছে যে, মর্ত্যে দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। অবশ্য এইটুকু স্বীকার করা যায় যে, মনসা শিবভক্ত চাঁদের হাতে পূজা পাওয়ার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন এবং সমগ্র কাব্যটি ঐ একটি উদ্দেশ্যের অভিমুখী। হয়ত এর কারণ এই যে, চাঁদের মত ধনবান ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির দ্বারা পূজিত হলে মনসার পক্ষে অন্যান্য সম্মানিত ও বহুপূজিত দেবদেবীর সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল উজ্জ্বল। কিন্তু এই পূজাটুকু লাভ করতে গিয়ে মনসার আত্ম-সম্মান কতখানি লাঘব হয়েছে, আর আনুপাতিক ভাবে তাঁর দেবীমহিমা কতখানি খর্ব হয়েছে তা অবশ্যই বিবেচ্য। এই প্রসঙ্গে সর্বশেষ বিষয় যেটি বিবেচ্য তা হোল চাঁদ কর্তৃক পূজার ধরণটি। সব মিলিয়ে তাই মনসার পূজা প্রচারটিকে কাব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতে দ্বিধা হয়।

মনসামঙ্গলটির মধ্যে কাহিনী যে ভাবে পরিবেশিত হয়েছে তাতে মনসার ক্রূরতার সঙ্গে চাঁদ সদাগর আর বেহুলার উদ্দীপ্ত আত্মসম্মাননিষ্ঠ সম্মিলিত সংগ্রাম এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে দৈবশক্তি, সতীত্বশক্তি, এবং স্নেহভালো-বাসার অমিত শক্তিরই অনিবার্যতা প্রমানিত হয়েছে।

সপ্তদশ শতক থেকেই বাঙ্গালীর মানসচেতনায় বৈষ্ণব-দর্শনকেন্দ্রিক ভাবপ্লাবনের অতিরেক মন্দীভূত হয়েছে। প্রেম-সাধনার পরিবর্তে শক্তি-সাধনার প্রয়াস সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রাধান্য লাভ করতে শুরু করেছে এই সময় থেকেই। মনসামঙ্গলের প্রথাসিদ্ধ রীতি দ্বারিকা দাস বহুলাংশে পালন করলেও, এঁর কাব্যে পুরুষকারবাদী প্রবল আত্মসম্মান সম্পন্ন নরনারী এবং নতুন সামাজিক মূল্যবোধের বিষয়টিই প্রাধান্য পেয়েছে। উনবিংশ শতকের নবজাগরণ বলতে আমরা যে বৈশিষ্ট্যগুলিকে একত্রিতভাবে চিন্তা করে থাকি, মঙ্গলকাব্য

ধারা বিশ্লেষণ করলে সেই সব বৈশিষ্ট্যের সন্ধান অনায়াসেই পাওয়া যাবে।

এই মনসামঙ্গল খানিতে মননহীন আবেগ বা যুক্তিবর্জিত সংস্কার প্রবণতা নেই। তার জায়গায় এসেছে যুক্তিবাদ, প্রবল আত্মসম্মানবোধ এবং সূক্ষ্ম পরিহাসপ্রবণতা। এর ফলে দ্বারিকা দাসের কাব্যটির বহু ছত্র সুভাষিতের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্যেই বিরোধের এবং ব্যাঘাতের পথে অগ্রসর হতে হয়। নিষ্ক্রিয়ভাবে, নির্বিরোধে এমন কি নিঃসংশয় স্বীকৃতির পথে সত্যকে লাভ করা যায় না। ক্ষুরধার পথে যাত্রা করে, সমস্ত প্রিয় ব্যক্তি ও বস্তুকে উৎসর্গ করে দিয়ে হৃদয়ের শোণিতমূল্যে সত্যকে বা অমৃতত্বকে লাভ করতে হয়। চাঁদ সদাগর আর বেহুলার সংগ্রাম সংসারে স্নেহ আর দৈবশক্তির অনিবার্যতাকে স্বীকার করে নিয়ে নিবৃত্ত হয়েছে। অতন্দ্র সংগ্রাম এই দু'টি চরিত্রের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয়টিও অভ্রান্তভাবে তুলে ধরেছে। আবার এটিও লক্ষনীয় যে, বেহুলার সতীত্বশক্তি দৈবশক্তিকেও ম্লান করে দিয়ে এই গুণটির মূল্যবত্তা প্রতিষ্ঠিত করেছে। অতএব একথা বলা যায় যে, দৈবশক্তি, সতীত্বশক্তি আর স্নেহপ্রেমের শক্তি কতখানি মূল্যবান সেইটি প্রমাণ করাই কাব্যখানির মৌল উদ্দেশ্য। এই শক্তিত্রয়ীর জয় ঘোষণাই কাব্যটির প্রতিপাদ্য বিষয়।

উল্লিখিতশক্তিত্রয়ীর মধ্যে সতীত্বশক্তির জয়গানই যে কাব্যটির মুখ্য উদ্দেশ্য তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। পরচৈতন্য যুগে সমাজমনে যখন নৈতিক আর আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ হ্রাস পেয়ে সমাজকে নিশ্চিত অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে দিচ্ছিল, সেই মধ্য-সপ্তদশ শতকে এই শক্তিত্রয়ীর জয়গান করা অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সমাজসচেতন শিল্পী সমাজের প্রতি আপন কর্তব্য প্রতিপালন করেছেন অথচ আপন প্রতিভার স্পর্শে কাব্যটির রসাবেদন অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। চিরাচরিত কাব্য ধারার অনুবর্তন করেও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার এই শক্তি নিঃসংশয়ে পরম শ্রদ্ধেয়।

মনসামঙ্গলের মধ্যে বেহুলা সতীত্বশক্তির মূর্ত প্রতীক। লোহার কলাই সেদ্ধ করা থেকে শুরু করে দেবসভায় মনসার কাছে আপন শক্তির পরিচয় দিয়ে সব ক'টি প্রার্থনা পূরণ করিয়ে নেওয়া পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করলে দ্বারিকা দাস যে

তাঁর কাব্যের সাহায্যে মূলতঃ 'সর্পভীতি নিবারণের উপায়'[১] প্রচার করতে চেয়েছেন তা বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে ওঠে। অবশ্য রীতিসিদ্ধ প্রথানুসরণে কবি আপন ভণিতাংশে একাধিকবারই বলেছেন,

মনসামঙ্গল শ্রবনে কুশল
সর্পভয় পীড়া দূরে নাশে অমঙ্গল। (পৃ ১৬৮)

কিন্তু এইটিই মৌল উদ্দেশ্য নয়। সেটি হোল, সমাজ মানসে সতীত্বের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাবোধ সৃজন করা।

এই প্রসঙ্গে মধ্যযুগীয় সমাজের সার্বিক বিপর্যয়ের ইতিহাস বর্ণনা বাহুল্য মাত্র। শুধু এইটুকু স্মরণ করাই যথেষ্ট যে, সে যুগের 'রাষ্ট্রিক পরাজয় নয়, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি সর্বোপরি ধর্মনীতি এবং যুগযুগবিলম্বী আচার-আচরণ-ঐতিহ্যের সর্বময় পরাভবের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য'[২] ঐক্য ধর্মী শক্তিচেতনার প্রয়োজন সব চাইতে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শুধু দৈবশক্তির ওপর অন্ধবিশ্বাসের ভিত্তিতে উন্নতমস্তকে দাঁড়ানোর অযৌক্তিক প্রচেষ্টা, সেদিন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে উঠছিল। সেই অসহায় কেন্দ্রচ্যুত সমাজজীবনে মঙ্গলসাহিত্যের, বিশেষ করে মনসামঙ্গলের প্রাণপ্রতিষ্ঠা যে বাঙালীসমাজকে আত্মরক্ষার পথনির্দেশ দিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এই মনসামঙ্গল কাব্যটির মধ্যেও একদিকে মনসার বিকৃত ঔদ্ধত্য এবং ক্ষমতালোলুপতা, অন্যদিকে সতীত্বের ও আদর্শের শক্তিতে আস্থাবান বেহুলা ও চাঁদ সদাগরের ক্ষুরধার পথে যাত্রা এবং অমৃতত্ব অর্জন সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অতএব এর কবি সর্পদেবী মনসার পূজা প্রচারের আন্তরিক ইচ্ছা নিয়েই কাব্য রচনা করেছিলেন, স্বীকার করা দুরূহ। মৃত্যুপুরী প্রত্যাগত পুত্রদের দূরে বসিয়ে রেখে, নিরপরাধিনী বিধবা পুত্রবধূদের এবং বেহুলা, সনকা ও পুরবাসীদের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে চাঁদ সদাগরের চারদিকে যে পরিবেশ সৃজন করা হয়েছিল, তাতে মনসার পূজায় সম্মতি দেওয়া ছাড়া চাঁদের গত্যন্তর ছিল না। শেষ মুহূর্তে যে অসম্মানজনক সর্ত তিনি আরোপ করেছিলেন, সে সর্ত স্বীকার করে মনসা বাম হাতের পূজা গ্রহণ করেই তৃপ্ত হয়েছেন। ট্রাজিক পরিণতি যদি কারোর হয়ে থাকে তবে তা মনসারই। এ ক্ষেত্রে চাঁদের 'নিষ্ফল পুরুষকার'[৩]

১। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, ৩য় সং, ১৯৬৭, পৃ ৭৩
২। ডঃ ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, ১ম পর্যায়, ৪র্থ সং, ১৯৬৫, পৃ ২২২
৩। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, ৩য় সং, ১৯৬৭, পৃঃ ৭৪

প্রমাণিত হয়নি। সুদীর্ঘকাল প্রবল আত্মশক্তিতে স্নেহপ্রেমের যে বহিঃপ্রকাশকে চাঁদ অবদমিত রেখেছিলেন, পরিবেশের নৈতিক পীড়নে তার কাছেই তিনি আত্মসমর্পন করেছেন। এতে তাঁর পরাজয় সূচিত হয়নি, শোভন আর সুসংহত ব্যক্তিত্বেরই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

প্রথম থেকেই একটির পর একটি পুত্রের মৃত্যু চাঁদ অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে চলেছিলেন। পুত্র শোকাতুরা মাতার হাহাকার আর ছ'টি বিধবা পুত্রবধূর দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রনাকে চাঁদ উপেক্ষা করে চলেছিলেন আপন আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে। সে আদর্শ পার্থিব ভোগ-বাসনার নয়, ব্যক্তিগত মান সম্মানের নয়, সে আদর্শ আপন ইষ্ট-দেবতাকে দুঃখে শোকে, আনন্দে উৎসবে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকড়ে থাকার আদর্শ। এই আদর্শের আবরণ চাঁদকে বাহ্যতঃ নিষ্ঠুর আর স্নেহ-মমতাহীন রূপেই উপস্থাপিত করেছে। কিন্তু অন্তঃ-সলিলা ফল্গুর মত অসীম স্নেহ ভালোবাসার যে স্রোতোধারা চাঁদের অন্তরে লুক্কায়িত ছিল, শেষে তারই কাছে তিনি মাথা নত করেছেন। মনসার পূজা এই পরাজয়েরই ফলশ্রুতি। কাব্য থেকে একটি ছত্র উদ্ধৃত করলেই এই বক্তব্য প্রমানিত হবে। মৃত্যুপুরী প্রত্যাগত পুত্রেরা চাঁদের দ্বারদেশে অপেক্ষা করে আছে। চাঁদ মনসা পূজা করলেই তারা আপন গৃহে প্রবেশাধিকার পাবে। এই অবস্থায়—

তবে সদাকর দেখিয়া কুমর
হৃদয়ে করুণা তার জন্মিল বিস্তর। (পৃ ১৬৫)

মূলতঃ এই 'করুণা'ই চাঁদকে মনসা-পূজায় বাধ্য করেছে।

অজস্র বিপত্তি আর পরীক্ষা-সংকুল সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বেহুলার একমাত্র পাথেয় ছিল আপন সতীত্ব-শক্তি। লোহার কলাই সেদ্ধ করে এই শক্তির পরিচয় দিতে হয়েছে তাঁকে আবার এই শক্তির সহায়তায় নিজেকে অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছেন তিনি। অতএব এ কথা অসঙ্কোচেই বলা যায় যে, দ্বিতীয় যে শক্তির জয় কাব্যটির মধ্যে ঘোষিত হয়েছে তা হোল সতীত্ব। এর মহিমা কীর্তন নানা চরিত্র নানা ভাবেই করেছে।

দ্বারিকা দাস শুধুমাত্র বেহুলা লখিন্দরের কাহিনীটি গ্রহণ করার ফলে প্রতিপাদ্য বিষয়টি সহজেই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। বেহুলার সতীত্ব তিনি শুধু বর্ণনা করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেননি, এই সতীত্বকে বহু দুরূহ পরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই করে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন।

সতী বেহুলার দীর্ঘ প্রশস্তি শোনা যায় বরুণের মুখে। লখিন্দরের অগ্রজ ছ'জন ভাইকে মনসা তাঁরই কাছে রেখেছিলেন। তাদের ফিরিয়ে আনবার সময় বেহুলা কাহিনীটি তার বর্ণনায় এই ভাবে পাওয়া যায়।

লক্ষীন্দর জন্ম হৈল তোমার ভুবনে।
পতিব্রতা নারী তার পূর্ব আরাধনে ॥
স্বামীর মরণে সতী তেজিল ভুবন।
ভাসিল সমুদ্র স্রোতে হৈয়া একমন ॥
ধন্য ধন্য জন্ম তার রমণীর কুলে।
মনুষ্য শরীর হৈয়া স্বর্গে আসি মিলে ॥ –
ধন্য মাতা ধন্য পিতা ধন্য তার স্বামী।
ধন্য দেশ ধন্য পৃথী সতী যেই ভূমি ॥
পিতাকুল মাতাকুল আপনার বংশ।
সপ্তকুল উদ্ধার পাতক কৈল ধ্বংস ॥
পশুপক্ষী কীট আদি কিবা নর্কঘোরে।
সতীর প্রতাপে সবে স্বর্গ ভোগ করে ॥
সতীর পবন লাগে যত যত দেশ।
পবিত্র ভুবন করে হরে নানা ক্লেশ ॥
সতীর মনের দুঃখ উঠে যেই কালে।
ব্রহ্মা ধ্যান ছাড়ি রহে পৃথী পাছে টলে ॥
হেন সতী উপনীত তোমার ভুবনে।
স্বধর্মে উদ্ধার করিল সাতজনে ॥ (পৃ ১৪৩)

এ ছাড়া

সনকা বলেন মাগো তুমি পতিব্রতা।
পৃথিবী ভিতরে রাখ ঘোষিবারে কথা ॥
দুর্গম তরিলে মাগো কলার মান্দাসে।
হারা ধনজন লৈয়া আইলে নিজ দেশে ॥
হেনকর্ম পৃথিবীতে করে কোন জন।
উদ্ধার পাইলু মোরা তোমার কারণ ॥ (পৃ ১৫৯)

এমনি করে বেহুলার সতীত্ব আর পাতিব্রত্যের কথা নানা ভাবে নানা জনের দ্বারা কীর্তিত হয়েছে কাব্যটির মধ্যে। চৈতন্যোত্তরকালীন সপ্তদশ শতকের নৈতিক অবক্ষয়ের সূচনামুহূর্তে এই সতীধর্ম প্রচারের প্রয়োজনীয়তা ছিল যথেষ্ট। সমাজদেহের সুস্থতা রক্ষার জন্যে লোকপ্রিয় কাব্যকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করাই ছিল প্রধান উপায়।

এ কথা ভাববার অবকাশ আছে যে, দ্বারিকা দাস তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যখানিতে গীতোক্ত জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও কর্ম—এই যোগচতুষ্টয়ের গুণকীর্তন করেছেন। বেহুলাই এই উপদেশগুলি পালন করেছেন বলা যায়। অনাসক্ত ভাবে স্বধর্ম পালনে নৈষ্কর্ম সিদ্ধিই এই উপদেশের মূল কথা। এ কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, বেহুলা মৃতপতির প্রাণ ফিরে পাওয়ার জন্যে যে অবিশ্রান্ত কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন, যে ভাবে ছ'টি ভাসুর আর শ্বশুরের সাতটি বাণিজ্যতরী ফিরিয়ে এনেছেন, তাতে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সংসারাসক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু মূলতঃ বেহুলা আপন ভক্তি আর জ্ঞানের সংযোগে যোগযুক্ত হয়েই কর্মসাধনা করেছেন। এক মুহূর্তের জন্যেও বিস্মৃত হননি যে সংসার অনিত্য। এর ফলে প্রাপ্তির পরিপূর্ণতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করতে পেরেছেন, 'এ সব সংসার, মায়ার সঞ্চার, ইহাতে আমার চিত নাহি ডুবে আর'।

প্রকৃতপক্ষে এ বক্তব্য কবিরই। বেহুলার জবানীতে হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ওড়িয়া ভাষায় গীতার প্রসিদ্ধ টীকাকার ('পরচে গীতা' বা গীতা পরিচয়) সাধক কবি দ্বারিকা দাসের আপন মনোভাবটিই এতে প্রকাশিত।

কাব্যভাষা

দ্বারিকা দাসের কাব্যভাষার বৈচিত্র্য বিশেষভাবেই লক্ষণীয়। তিনি মধ্য-বাংলার সঙ্গে অবলীলাক্রমে সমকালীন বেশ কিছু ওড়িয়া শব্দকে মিলিয়ে নিয়েছেন। সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে মনে হয় যে, ওড়িয়া শব্দগুলি প্রয়োজনীয় বাংলা শব্দের অভাবজাত নয়, ধ্বনি ও ছন্দের সৌন্দর্য বিধানের উদ্দেশ্যেই সেগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। কবির বাংলা শব্দভাণ্ডার যথেষ্ট পরিমাণে পরিপুষ্ট এবং বৈচিত্র্য সম্পন্ন ছিল, এর প্রমাণ কাব্যের মধ্যে অজস্র পরিমাণেই বর্তমান।

মূলতঃ বাংলা ভাষার সঙ্গে ওড়িয়া শব্দের মেলবন্ধন কাব্যের দ্যুতি ও দীপ্তিগত মূল্য অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। এ যে শক্তি সাপেক্ষ তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে না।

কাব্য রচনার ক্ষেত্রে শুধু ব্যঞ্জনাধর্মী শব্দচয়ন এবং গ্রন্থনই যথেষ্ট নয়। বিশেষ প্রয়োজনে কিছু কিছু শব্দ নির্মাণের দরকার হয় এবং শব্দ গ্রন্থনের কোন কোন ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম মাত্রাবোধের পরিচয়ও দিতে হয়। এই কবির কাব্যে উভয় শক্তিরই সন্ধান মেলে। দ্বারিকা দাস সংস্কৃতজ্ঞ কবি ছিলেন, তাই তাঁর কাব্যে তৎসম বা অর্ধ তৎসম শব্দের অভাব ঘটেনি। কাদম্বরী, পিঙ্গল, পয়োধর, নিতম্ব, যাবক, অঙ্গনা প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে ঝুরে, ভেল, হুঁহ, আজু, উভরায় এবং ওড়িয়া শব্দ মূআঁশ, সড়ে, নিশ, লদিয়া, থাবাড়, উলে প্রভৃতির অকল্পনীয় সহাবস্থান ঘটেছে। আবার এও দেখা যায় যে ছন্দের প্রয়োজনে পাঞ্জি, পঞ্জিকা; গুয়া, গুবাক, প্রবোধ, পরিবোধ—শব্দের উভয়বিধ রূপ ও ব্যবহৃত হয়েছে।

শব্দনির্মাণ ও শব্দগ্রন্থনের বৈশিষ্ট্যটিও এই প্রসঙ্গে বিচার্য। কবি করপুটে অঞ্জলি ধারণ বোঝানোর জন্যে 'পুটাঞ্জলি' শব্দ ব্যবহার করেছেন আবার 'করপুট' শব্দের ব্যবহারও কাব্যের মধ্যে আছে। 'বৈরি' শব্দের সমান্তরাল 'ঐরি' শব্দ নির্মিত হয়েছে, আবার 'সর্ব হবে নাশ', 'হৈলা কার্য্য' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছও নিপুণ ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে কবির ভাষা ব্যবহারের প্রকৃত দক্ষতা প্রকাশিত হয়েছে বাংলা ভাষার সঙ্গে ওড়িয়া শব্দের মেলবন্ধনে। কয়েকটি উদাহরণ দেখা যেতে পারে—

> সুপাকে কলাই হেল সিজনা। (পৃ ৩৮)
> কপাট দিলেক কিলি লোকে থুইল দ্বারে। (পৃ ৫৪)
> সরিল সংসার মোর কি আর মু আঁশ। (পৃ ৮১)
> তিলে মাত্র দেড়ি হৈলে সর্ব হবে নাশ। (পৃ ১১৪)
> সে হেন গুণের কন্যা করিল নিরাশ।
> হৃদে সে লদিয়া গেল শূন্য করি বাস॥ (পৃ ১৫০)

কবির ভাষাব্যবহার সংক্রান্ত দক্ষতা আলোচনা প্রসঙ্গে একটি বিশেষ কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সমস্ত কাব্যটিতে 'নিদান' এবং 'করুণা' শব্দদ্বয় যে ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তা প্রায় মুদ্রাদোষের পর্যায়ে পড়ে। বহুব্যবহৃত এই দুটি শব্দের প্রয়োগ কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থহীন হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে 'করুণা' শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে এই অভিযোগ অবশ্যই করা যায়।

ভাষা কাব্য-সাহিত্যের চিৎ শক্তি। এরই আধারে ভাববস্তু বিধৃত থাকে।

এর উৎকর্ষ বা অপকর্ষ তাই কাব্য-সাহিত্যের রসোত্তীর্ণতার সহায়ক বা বাধা অবশ্যই হতে পারে।

দ্বারিকা দাসের ভাষা দুর্বল বা অপপ্রযুক্ত নয় মোটেই। বাংলা ভাষার মধ্যে কিছু ওড়িয়া শব্দের প্রয়োগ কাব্যের অর্থবোধে কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি করেনি। তাছাড়া কয়েকটি আপাত-অপরিচিত শব্দ বর্ণিত বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে ও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই মধ্যযুগীয় কাব্যটিতে সমকালীন ওড়িয়া শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাই সেগুলির ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। পরবর্তী একটি অনুচ্ছেদে সেই ব্যাখ্যা দেওয়া হোল। একটু সহানুভূতি এবং সতর্কতা এই যুগের কাব্য-পাঠের অপরিহার্য সর্ত। এই সর্ত পূরণ করে বিচার করলে এবং বর্ণিত কাহিনীটির গতিপথ অনুসরণ করলে ওড়িয়া ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষেও অর্থবোধে অসুবিধে হয় না। অবশ্য এর যে ব্যতিক্রম নেই, তা বলা যায় না। তবে সাধারণভাবেই বলা যায় যে, ওড়িয়া শব্দ দুরূহতা সৃজন করেনি এবং এ যে করেনি এইখানেই কবির কৃতিত্ব।

অলংকার

অলংকৃত বাক্যই যে কাব্য নয় এই সত্যটি স্বীকার করে নেওয়ার পর ও মধ্য-যুগীয় কাব্যে এর উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। শুধু বিচার্য এইটি যে, অলংকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে কবির শক্তি অবসিত হয়েছে, না কি কাব্য অলংকৃত এবং ব্যঞ্জনাধর্মী দুইই হয়েছে।

কাব্য-ভাষার আলোচনা প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে যে, এটি দীপ্তি আর দ্রুতি উভয়বিধ গুণের সমন্বয়ে রসোত্তীর্ণ হয়েছে। মননপ্রধান এবং অনুভূতিপ্রধান কাব্য সাধারণ দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী। কিন্তু ক্লাসিক্যাল কাব্যে এই দু'টি গুণের যে সার্থক অন্বয় ঘটতে পারে তার উদাহরণ প্রচুর। প্রকৃতপক্ষে, মহৎ সৃষ্টির মধ্যে এ দুয়ের সীমারেখা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

অর্থোপলব্ধি থেকে জন্ম নেয় রম্যবোধ আর এই রম্যবোধ থেকে আনন্দলোকে পাঠকের অনুভূতি উত্তীর্ণ হয়। দীপ্তিকাব্য আমাদের মস্তিষ্ককে আশ্রয় করে পরম রমনীয়ের সন্ধান দেয়, অন্য পক্ষে দ্রুতিকাব্যের আবেদন আমাদের হৃদয়ের কাছে হলেও পাঠককে সেও উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করে সেই এক এবং অভিন্ন আনন্দলোকে। শ্রেষ্ঠ কাব্যের মধ্যে মননশীলতা এবং অনুভূতিপ্রবণতার সংমিশ্রন এমন সাবলীল এবং স্বচ্ছন্দ যে হৃদয় এবং মস্তিষ্কের বিবাদ সেখানে একেবারেই

অনুপস্থিত। এই জন্যেই আমাদের রসবেত্তা সমালোচকেরা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, ধ্রুপদী সাহিত্য একই কালে মননপ্রধান এবং অনুভূতি প্রধান, একই কালে ক্লাসিক এবং রোমান্টিক। এই স্তরে কাব্যকে উত্তীর্ণ হতে অলংকারের সুপরিকল্পিত প্রয়োগ প্রচুর পরিমাণে সহায়তা করে।

আলোচ্য কাব্যে শব্দালংকার এবং অর্থালংকার উভয় শ্রেণীর অলংকারই প্রযুক্ত। কয়েকটি উদাহরণ—

তাহাতে বেসর উপরে মতি।
হিমাদ্রিতে যেন গঙ্গার গতি ৷৷ (পৃ ৩৬)
সিংহ জিনি কটি বেড়িয়া ভালে।
রসনা বাজিছে পঞ্চম তালে ৷৷ (পৃ ৩৬)
তুমি নয়নের তারা দরিদ্রের যেন হীরা
অন্ধলার যেন হাতনড়ি। (পৃ ৭৫)
ভাসিল সমূদ্র জলে বেহুলা সুন্দরী।
যেন বনবাসে যায় জনককুমারী। (পৃ ৮৪)
আনন্দ সাগরে কিবা ভাসিল কামিনী।
শোক অগ্নি উপরে ঢালিল যেন পানি ৷৷ (পৃ ১৫২)
আনন্দ অপার কি কহিব আর।
অন্ধ যেন লোচন পাইল পুর্নবার ৷৷ (পৃ ১৬৭)

শব্দালংকার হিসেবে অনুপ্রাসের প্রয়োগই প্রাধান্য পেয়েছে এই কাব্যে। কয়েকটি উদাহরণ দেখা যেতে পারে—

খণ্ডে দূরে দৃষ্টি সকল অরিষ্টি
ছয়দিনে যথোচিত পূজা কৈল ষষ্ঠী। (পৃ ২৪)
স্বামী দান দেহ মোরে দুঃখ কর দূর। (পৃ ১২৮)
তুমি মাতাপিতা দুইলোক ত্রাতা
ধৈরজ ধারিণী ধাতা। (পৃ ১৪৫)
সমুদ্রের জল তরঙ্গ প্রবল
কল্লোলে হিল্লোলে করে নৌকা টলমল। (পৃ ১৪৮)

লখিন্দরের বিবাহে যে বণিকেরা যোগদান করেছিল তাদের বর্ণনায় অনুপ্রাসের বাহুল্য সহজেই চোখে পড়ে। আর উদাহরণের সংখ্যা না বাড়িয়েও

বলা যায় যে উভয় প্রকার অলংকারের প্রয়োগ কাব্যের শোভা এবং অর্থগৌরব দুইই বৃদ্ধি করেছে।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল সম্পাদনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বলেছেন যে, তাঁর কাব্যে অলংকারের প্রয়োগ মোটেই আয়াসসাধ্য নয়। সে সবই অত্যন্ত সাবলীল ভাবেই এসেছে। দ্বারিকা দাসের অলংকার প্রয়োগ সম্পর্কে সেই মন্তব্যেরই প্রতিধ্বনি করে বলা যায় যে, এঁর কাব্যেও কোন অলংকার কষ্টকল্পিত নয় বা অপপ্রযুক্ত নয়। তারা এসেছে তাদের বর্ণচ্ছটা এবং রসের ব্যঞ্জনা নিয়ে অত্যন্ত সহজ ভঙ্গীতে। কোথাও কোন আড়ষ্টতা চোখে পড়ে না। পাঠকের অন্তরে রসপ্রতীতি সৃষ্টিতে এদের অবদানও তাই সুপ্রচুর।

ছন্দ

ছন্দোবিচারে সমগ্র কাব্যটিকে অক্ষরবৃত্তাশ্রয়ী বলা যায়। এর মধ্যে প্রাধান্য পয়ারের, তার সঙ্গে আছে ত্রিপদী আর একাবলী। কবি একাবলীকে একপদী রূপে চিহ্নিত করেছেন। রাগের উল্লেখ নেই বললেই হয়। কয়েকটি অধ্যায়ের শীর্ষে 'করুণা' আর 'মঙ্গল' রাগের উল্লেখ আছে।

পয়ার এঁর কাব্যে শুধু একটি ছাদেরই পাওয়া যায় এবং সেটি হোল ৮+৬=১৪ মাত্রার। পয়ারের শোষণশক্তি সম্পর্কে কবি যে অবহিত ছিলেন তার প্রমাণ একাধিক ক্ষেত্রে আছে। একটি উদাহরণ—

দেখ নারিকেল আছে লোহার বাসরে।
মঙ্গল হাণ্ডিতে তণ্ডুল আছে ঘরে॥
ঘৃত তৈল অগ্নি রামা আছে বিদ্যমান।
নেতের আঞ্চল জ্বালি বসাঅ রন্ধন॥ (পৃ ৬৫)

বৈচিত্র্য এসেছে ত্রিপদীর ব্যবহারে। কাব্যের মধ্যে ৬+৬+৮, ৬+৬+১৪, ৭+৭+৯, ৮+৮+১০ এই চার ছাদের ত্রিপদী পাওয়া যায়। ক্রমপর্যায়ে এগুলির উদাহরণ—

ক। চাঁদ সদাকর প্রবেশি সে ঘর
দেখে মনসার বারা।
গলে কিয়াপাতা সিন্দুরে শোভিতা
উপরে লম্বিছে ঝরা॥ (পৃ ১৪)

খ। নামেতে মন্নাল আইল তৎকাল
অতি উচ্চ তনু তার উভে সাততাল। (পৃ ৬০)

গ। গণেশ রুদ্র হরি শিবের পূজা করি
দুর্গায় করি আবাহন।
মৃত্তিকা গন্ধ শিলি বেদোক্ত মন্ত্র বলি
কপাল কৈল বিভূষণ॥ (পৃ ৪৬)

ঘ। প্রথমে ডুকরপুটে বিষহরী উর ঘটে
কৃপা কর সাগর দুহিতা।
রাখিয়া সংগীতে মন ডাকে তোমা অভাজন
বর্ণিবারে তব কিছু কথা॥ (পৃ ১)

কাব্যের মধ্যে ৬+৫ মাত্রার একাবলীও পাওয়া যায়। একটি উদাহরণ—

চিন্তিয়া মনসা চরণতলে।
স্নান করিবারে বেহুলা চলে॥
মধুর মূরতি গজেন্দ্রগতি।
পদ্মিনীর অংশে জন্মিছে সতী॥ (পৃ ৩৫)

আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, কবির ছন্দজ্ঞান ছিল নিপুন। এই নিপুনতার উদাহরণ হিসেবে বেহুলার নৃত্যবর্ণনামূলক কয়েকটি ছত্র আগেই উদ্ধৃত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বাদ্য যন্ত্রের নানাপ্রকার বোল বা ধ্বনির অনুকৃতি-বোধক শব্দগুচ্ছ নিয়ে রচিত পংক্তির সঙ্গে সাধারণ পংক্তির মিলন বিশেষ দক্ষতার সঙ্গেই কবি ঘটিয়েছেন। কোথাও মাত্রার কম বেশী দেখা যায় না। এ যে বিশেষ পারদর্শিতারই লক্ষণ তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

অবশ্য দ্বারিকা দাসের ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে যে বিশেষ তথ্যটি স্মরণীয় তা হোল এই যে, কবি এই মনসামঙ্গল রচনার পূর্বে বহু কাব্য ওড়িয়া ভাষায় রচনা করেছিলেন। এই কাব্যের ভাষা, অলংকার এবং ছন্দ প্রভৃতি ধীর ভাবে বিচার করলে সুদীর্ঘ অনুশীলনলব্ধ পটুতা সহজেই অনুভূত হয়।

প্রাচীন আর মধ্য-যুগীয় কবিগণের কাব্য সমালোচনা প্রসঙ্গে কোন কোন সমালোচক এই মত প্রকাশ করেছেন যে, তাঁদের অনেকের ছন্দোরীতি ত্রুটিপূর্ণ। আলোচ্য কাব্যের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সমগ্র রচনাটিকে খুঁটিয়ে বিচার করলে ত্রুটিবিচ্যুতির সন্ধান অবশ্যই পাওয়া যাবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি

কথা মনে রাখা উচিত বলে বিবেচনা করি। কোন কবির স্বহস্ত লিখিত পুথি আমরা কোন দিনই পাইনি। যা আমাদের হাতে এসে পৌচেছে তা লিপিকরদের অনুলিখিত কাব্য। এই লেখকেরা পুথি লেখার ব্যাপারে পারদর্শী ছিলেন এবং কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিকের পরিবর্তে তালপাতায়, হাতেতৈরি কাগজ প্রভৃতিতে কবির মূল রচনার অনুলিপি প্রস্তুত করতেন। এই অনুলেখকেরা কবিত্বশক্তি সম্পন্ন বা সুশিক্ষিত মানুষ ছিলেন, এ অনুমানের সমর্থন মেলেনা। অতএব প্রতিলিপি তৈরি করবার সময় ভুলভ্রান্তি ঘটাই স্বাভাবিক। আবার বহু পুথি মূলের অনুলিপিরূপে এসে পৌছয়নি, এসেছে প্রতিলিপির অনুলিপি হয়ে। এই অবস্থায় প্রতিলিপিগুলি সামনে রেখে কবির ভাষা এবং ছন্দোনৈপুণ্য সম্পর্কে কোন অভিমত প্রকাশ করা দুরূহ।

ছন্দের যে বিচিত্র ব্যঞ্জনাশক্তি আধুনিক কালে আমাদের মুগ্ধ করে, মধ্যযুগের কাব্যে সেই নৈপুণ্যের প্রত্যাশা করা কতখানি সঙ্গত তাও অবশ্যই বিচার্য।

বাংলা ছন্দোরীতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন ছন্দোবন্ধের মধ্যে হ্রস্ব ও দীর্ঘের যে তারতম্য প্রতিপালিত হোত' চর্যাপদের মধ্যে তার অনেকখানি পরিবর্তন ঘটেছে। মধ্যযুগে এই পরিবর্তন আরও স্পষ্ট। মূলতঃ দীর্ঘ স্বরের ব্যবহারে উণতাই এই পরিবর্তন।

এখানে পয়ার ৮+৮ এর পরিবর্তে ৮+৬ এবং ত্রিপদী ৮+৮+১২ বদলে গিয়ে ৮+৮+১০ এ দাঁড়ালো। দ্বারিকা দাসের ব্যবহারে তার মাত্রা আরও কমে গিয়ে ৭+৭+৯, ৬+৬+১৪ এবং ৬+৬+৮ এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সংস্কৃত এমন কি প্রাকৃত ছন্দোবন্ধের মধ্যে যে শক্ত কাঠামো ছিল, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে তার প্রত্যাশা করা সম্ভব নয়। তবুও আলোচ্য কাব্যের মধ্যে কবি ছন্দোনির্ভর ঐক্য এবং সৌষম্য যে অনেকখানি বজায় রেখেছেন, তা অনস্বীকার্য।

মনসামঙ্গল কাব্যবৃত্ত ও দ্বারিকা দাস

পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যেই মনসামঙ্গল শাখাটি শক্তিমান কবিদের অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্রপাত ঘটে দীনেশ চন্দ্র সেন প্রণীত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে। পরে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাগণ এই বিষয়ের ওপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য

সম্পাদনা প্রসঙ্গে ডঃ তমোনাশ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য, জয়ন্ত কুমার দাশগুপ্ত, ডঃ আশুতোষ দাস প্রভৃতি গবেষকের আলোচনায় এবং সর্বোপরি ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' ও 'বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল' প্রভৃতি গ্রন্থে এই কাব্যধারা ও এর বিভিন্ন কবি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা পাওয়া যায়।

মনসামঙ্গলগুলির কুলবিচারে ডঃ সুকুমার সেন সেগুলির যে শ্রেণীবিভাগ[১] করেছেন, তারই ভিত্তিতে বলা যায় যে দ্বারিকা দাস রচিত মনসামঙ্গলটি রাঢ় শাখার অন্তর্ভুক্ত। বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী পূর্বভারতের অন্যতম জনপ্রিয় কাহিনী। তবু ভৌগোলিক অঞ্চল এবং কবির মানসিকতার তারতম্যে এই অতি পরিচিত কাহিনী প্রতিটি কাব্যে বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে। দ্বারিকা দাসের কাব্যবৈশিষ্ট্যটি এ ক্ষেত্রে তাই প্রথম বিচার্য বিষয়।

কবি কাব্যের নামকরণ করেছেন মনসামঙ্গল। কিন্তু এর সঙ্গে নিয়মানুগ 'দেবখণ্ড' যুক্ত হয়নি। 'নরখণ্ড'টিও অন্যান্য মনসামঙ্গলের তুলনায় বেশ সংক্ষিপ্ত। এতে চাঁদ সদাগরের সাতটি তরী সহ বাণিজ্য যাত্রা, মনসা কর্তৃক তরী নিমজ্জন, বহু লাঞ্ছনার পর চাঁদের গৃহ প্রত্যাবর্তন, বেহুলা লখিন্দরের পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত ও মর্ত্যে জন্মগ্রহন, তাদের বিবাহ ও লৌহবাসরে লখিন্দরের মৃত্যু, মৃতদেহ নিয়ে কলার মান্দাসে বেহুলার স্বর্গযাত্রা, নেতুর সহায়তায় দেবসভায় নৃত্য ও লখিন্দর সহ অন্যান্য ভ্রাতাদের পুনর্জীবন লাভ, সাতটি বাণিজ্যতরী ও পুনর্জীবিত স্বামী এবং ভাসুরদের নিয়ে বেহুলার প্রত্যাবর্তন, চাঁদের মনসাপূজা এবং বেহুলা লখিন্দরের স্বর্গ পুনঃপ্রাপ্তি বর্ণিত হয়েছে।

এই কাহিনীর মধ্যে প্রধান পার্থক্যটি হোল বেহুলা ও লখিন্দরের পূর্বজন্ম বর্ণনা করতে গিয়ে কবি উষা-অনিরুদ্ধের পরিবর্তে ছায়া-নীলাম্বর কাহিনীর অবতারণা করেছেন। এঁর নীলাম্বর ছিলেন নৃত্যপটু। তিনি দেবসভায় নৃত্য করে দেবগণকে এতই মোহিত করেন যে ভোলানাথ—

গলে ছিল হাড়মালা শিব কৈল হাতে।
হাড়মালা দিল ইন্দ্রসুতের গলাতে।। (পৃ ১৯)

শিবের কাছে এ মালা যত মূল্যবানই হোক না কেন, 'ভুবনমোহন রূপ ইন্দ্রের কুমার' এই মালা গলায় পরে থাকতে বেশ অস্বস্তি বোধ করলেন এবং

১। ডঃ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ; ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ ১৯৭০, পৃঃ ২৩৩

'না রাখিব গলে বলি নামাল তুরিতে'। শিব ভয়ানক ক্রুদ্ধ হলেন এবং অভিশাপ দিলেন।

আভরণে সুখভোগ বাসনা তোমার।
পৃথিবীতে জন্ম লভ বণিকের ঘর ॥ (পৃ ১৮)

নীলাম্বর ভস্ম হলেন এবং তাঁর পত্নী ছায়া শোকে প্রাণত্যাগ করলেন। এরপর দেবরাজ ইন্দ্র এবং শচীর বিলাপে তুষ্ট হয়ে শিব সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—

ভস্ম হৈল যার তনু পুনর্বার জন্ম বিনু
না পাইবা আপনা নন্দন।
একমাস গেলে পুন যাইবে আপনা স্থান
পুত্র বধূ পাবে দুইজন ॥ (পৃ ২২)

এই অংশটি ছাড়া সমগ্র কাব্যটিতে খুব বেশী কাহিনীগত পরিবর্তন নেই। তবে মনসামঙ্গল কাব্যধারার অনেকগুলি রীতি এই কাব্যে যে অনুসৃত হয়নি তা বেশ চোখে পড়ে।

দ্বারিকা দাস বারোমাস্যা বর্ণনা, কাঁচলি নির্মান বা টোপর নির্মান বর্ণনা করেননি। রূপবান পুরুষদর্শনে আপন পতির নিন্দা দ্বারিকা দাসের কাব্যে নেই। সাধারণভাবে বলা যায় যে, রঙ্গরসিকতার যে প্রাচুর্য মঙ্গলকাব্যগুলির অপরিহার্য অঙ্গরূপেই পাওয়া গিয়েছে, দ্বারিকা দাসের কাব্যে তার অভাব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাখালদের এবং গোদার উপকাহিনীতে কিছু পরিমানে রসিকতার স্পর্শ আছে কিন্তু তার মধ্যে স্থূলতা নেই। ইতিপূর্বে লখিন্দর চরিত্র চিত্রনের ক্ষেত্রে দ্বারিকা দাস এবং জগজ্জীবন ঘোষালের পার্থক্যটি আলোচিত হয়েছে।

বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব বা কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত কাব্যের সঙ্গে আলোচ্য কাব্যখানির তুলনামূলক বিচারে বাহ্য অনৈক্য বহু ক্ষেত্রে দেখা গেলেও এগুলির মধ্যে বা সামগ্রিকভাবে সমস্ত মনসামঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে আন্তরিক সাদৃশ্য অবশ্যই লক্ষ্য করা যায়। দেবী মনসার পূজা যাতে মর্ত্যে অন্যান্য দেব-দেবীর সমপর্যায়ে প্রচলিত হয় এবং শৈব চাঁদ সদাগর কর্তৃক পূজিতা হয়ে তিনি যাতে বিশেষ সম্মানিতা দেবীতে পরিণত হন, সে জন্যে সচেষ্ট হতে গিয়ে চাঁদের সঙ্গে মনসার বিরোধটিকে সমস্ত মঙ্গল কাব্যের প্রথমাংশ বলে চিহ্নিত করা যায়। দ্বিতীয়াংশে মৃতপতি সহ কলার মান্দাসে বেহুলার স্বর্গপুরী যাত্রা, সাতটি বাণিজ্য তরী ও পুনর্জীবিত পতি এবং ভাসুরদের নিয়ে প্রত্যাবর্তন, চাঁদের মনসা পূজা

এবং বেহুলা লখিন্দরের স্বর্গে ফিরে যাওয়া। কাহিনীর এই মৌলিক কাঠামো সর্ব মনসামঙ্গলের মধ্যে কমবেশী একই রকম কিন্তু প্রত্যেক কবির কাব্যে কিছু কিছু গ্রহণ-বর্জন ও রচনাশৈলীগত পার্থক্য আছেই। এই পার্থক্যগুলিকে তাঁদের মানসিক বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করতে হয়।

কানা হরিদত্ত মনসার সর্পসজ্জা বর্ণনা করতে গিয়ে যেখানে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের সঙ্গে আঠারোটি অলংকারের উল্লেখ করেছেন, সেখানে দ্বারিকা দাস দিয়েছেন মাত্র বারোটির বর্ণনা। আপাতদৃষ্টিতে এই পার্থক্য মূল্যহীন মনে হলেও এর মধ্যে বিশেষ মানসিকতার ইঙ্গিত আছে।

মধ্যযুগের কাব্যগুলিতে অলংকরণ এবং অতিরঞ্জন প্রায় সমার্থক। যে সব কারণে সে যুগের কাব্য আধুনিক পাঠকের মনোরঞ্জনে অসমর্থ হয়, এটি তার অন্যতম। বিশ্লেষণাত্মক বাস্তব বুদ্ধি এবং যুক্তিবাদ আধুনিক মনোভঙ্গীর বিশিষ্ট লক্ষণ। উড়িষ্যার চিরাচরিত কাব্যধারার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত মনসামঙ্গল কাব্যশাখার ঐতিহ্য দ্বারিকা দাস নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন ঠিকই কিন্তু মাত্রাজ্ঞান আর যুক্তিবাদের দুর্লভ গুণাবলীর সমন্বয়ে এঁর কাব্য সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য।

মনসার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনায় কেতকাদাস ও জগজ্জীবনের মধ্যে ঐক্য আছে কিন্তু দ্বারিকা দাসে সে বর্ণনা ভিন্নরূপ নিয়েছে। নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে বেহুলার ভায়ের নাম নারায়ণী। ষষ্ঠীবর এবং বিজয় গুপ্তের কাব্যে তার নাম হরি সাধু। এদিকে দ্বারিকা দাসের বেহুলার সাত ভাই যাদব, মাধব, হরি, মুকুন্দ, মুরারি, সুলোচন ও শ্রীনিবাস। বিপ্রদাস পিপিলাই চাঁদের বাণিজ্য তরী নিমজ্জিত হবার পর তাঁকে নিয়ে গিয়েছেন তাঁর বন্ধু চন্দ্রকেতুর কাছে। চন্দ্রকেতু মনসার পূজা করেন জেনে চাঁদ বন্ধুগৃহ ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন। কেতকাদাস এবং দ্বারিকা দাসের কাহিনী এই ক্ষেত্রে একই রকম কিন্তু এঁদের বেলায় সেই বন্ধুর নাম যথাক্রমে চন্দ্রকেতু এবং ধর্মদাস।

কাহিনীগত সাদৃশ্যের ক্ষেত্র ব্যাপকতর। বংশীদাসের কাব্যে চাঁদের বাণিজ্য যাত্রা প্রসঙ্গে 'মঘ ফিরিঙ্গি'র উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বারিকা দাস বলেছেন 'হারমাদের' কথা। লখিন্দরের মৃত্যুর পর নারায়ণ দেবের চাঁদ সদাগর বেহুলার জন্মে মান্দাস বানাতে কলাগাছ কাটার ব্যাপারে অস্বীকৃত হন। তিনি বলেন—

চান্দো বলে এক দুঃখ মৈল সাত বেটা।
তাহা হৈতে অধিক দুঃখ কলা জাইব কাটা॥

দ্বারিকা দাসের চাঁদ বলেছেন—

পুত্রশোক যত মোর মনে নাই ধরে।
রামরম্ভা কাটিবারে হৃদয় বিদরে॥

লখিন্দরের মৃতদেহ তাড়াতাড়ি বাসরের বাইরে নিয়ে যাবার আদেশ দিয়ে বংশীদাসের চাঁদ সদাগর বলেছেন, 'কানীর উচ্ছিষ্ট পুত্র শীঘ্র কর পার'। দ্বারিকা দাসের চাঁদ বলেছেন—

চেঙ্গমুণ্ডি বিষহরী উচ্ছিষ্ট করিল পুরী
পবিত্র করহ শীঘ্র হয়্যা।

বিপ্রদাস, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি কবির কাব্যে হনুমানের সাহায্যে চাঁদের বাণিজ্যতরী ডোবানোর বর্ণনা আছে, দ্বারিকা দাসে ও তাই আছে। এই সব বাহ্য ঐক্য বা অনৈক্য যদি বিশেষ কোন মানসিকতার পরিচয়বাহী না হয়, এ সবের আলোচনা অবান্তর। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, এই সব গ্রহণ বর্জনের আপাতমূল্যহীন অংশগুলির মধ্যেই সংশ্লিষ্ট কবির মানসবৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে।

দ্বারিকা দাসের রচনায় গ্রহণবর্জনের যে সব সাক্ষ্য বর্তমান তার সাহায্যে কবির মাত্রাজ্ঞান আর যুক্তিনির্ভর মনোভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। অলংকরণ, অতিরঞ্জন এবং অলৌকিক ঘটনাবলীর সমাবেশ মধ্যযুগীয় কাব্যধারার অপরিহার্য অঙ্গ বলেই স্বীকৃত। আলোচ্য কাব্যে এ সবের উদাহরণ নেই, এমন নয়। এ সবই বর্তমান কবির কাব্যে আছে কিন্তু সেগুলি মাত্রাবোধ আর বিচারবুদ্ধির দ্বারা সীমিত। এ থেকে এই অনুমানেই উপনীত হওয়া যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দীর মানুষ হলেও কবির দূরদৃষ্টি আধুনিকতাকে আয়ত্ত করে নিতে সহায়তা করেছিল।

দ্বারিকা দাসের মাত্রাবোধ কতখানি প্রখর ছিল তার পরিচয় দান প্রসঙ্গে মনসার সর্পসজ্জার কথা উল্লিখিত হয়েছে। এই মাত্রাবোধ ও যুক্তিবাদের আর কিছু উদাহরণ বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

চাঁদের বাণিজ্যতরীগুলির মাঝি মাল্লারা ছিল সবই পূর্ববঙ্গীয়। নদনদীর দেশ পূর্ববঙ্গ। নৌচালনা বিদ্যায় পারদর্শিতা তদ্দেশীয় মানুষদের প্রায় সহজাত। এখনো সমুদ্রগামী জাহাজগুলিতে তাদের সংখ্যাধিক্যতা সেই সহজাত দক্ষতারই প্রমাণ দেয়। পশ্চিমবঙ্গীয় কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ পূর্ববঙ্গীয় মাঝি মাল্লাদের 'বাঙ্গাল' বলে উল্লেখ করেছেন আর কয়েকটি শ্লেষাত্মক ছত্র যোগ করেছেন। তাঁর কাব্যে আছে—

বাঙ্গাল কাঁদে হুড়ুর বাফৈ বাফৈ (ধ্রু)

* * * *

মাথায় হাত দিয়া কান্দে যতেক বাঙ্গাল।
সকল ডুবিল জলে হৈনু কাঙ্গাল ॥
পোস্তের হোলা ভাঙ্গা গেল ছাকনার কানি।
আর বাঙ্গাল বলে গেল ছেঁড়া কাঁথাখানি ॥
ধূলায় লুটায়্যা কান্দে আর বাঙ্গাল বলে।
সাত গাঁট্যা টেনা মোর ভাস্যা গেল জলে ॥[১]

কবি দ্বারিকা দাস এই মাঝি মাল্লাদের 'বাঙ্গাল' বলেই উল্লেখ করেছেন। 'গুমগড় নন্দীগ্রামে এ গীত বর্ণন' অতএব রাঢ় বাংলার এই কাব্যে পূর্ববঙ্গীয়দের 'বাঙ্গাল' বলেই দ্বারিকা দাস উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এঁর বর্ণনায় শ্লেষের ইঙ্গিত-মাত্রও নেই। দ্বারিকা দাসের বর্ণনাটি এই রকম—

মনসা করিল বল সাতডিঙ্গা গেল তল
মরিল বাঙ্গাল কর্ণধার।
সর্বস্ব ভাসিল জলে চাঁদ বাণ্যা কোপে বলে
মনসারে নিন্দয়ে অপার ॥
বলে কানি চেঙ্গ মুড়ি ভরা নৌকা খাইল বুড়ী
প্রাণে মাইল সকল বাঙ্গালে।
ছ পুত্র আমার খায়্যা আছিল ভরসা পায়্যা
আজু ডিঙ্গা ডুবাইল জলে ॥ (পৃ ৮)

যে কোন পাঠকের কাছে দু'টি বর্ণনার পার্থক্য অনায়াসেই ধরা পড়বে। দ্বারিকা দাস তাঁর মার্জিত রুচি আর সংযত বাচনভঙ্গীর পরিচয় সমগ্র কাব্যের মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবেই রেখে গিয়েছেন।

মাত্রাজ্ঞান আর যুক্তিবাদ বলে যে দুটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে, তা যে সব সময় সংক্ষিপ্ত রচনানির্ভর, বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে যুক্তিবাদী হয়ে ওঠার ফলে কোথাও কোথাও কবিকে বর্ণনা বেশ বড় করেই দিতে হয়েছে। একটি উদাহরণ তুলনামূলকভাবে বিচার করে দেখা যেতে পারে।

বেহুলা-লখিন্দরের বিবাহ নিষ্পন্ন হয়েছে। পুত্র আর পুত্রবধূকে বিলম্ব না করেই চাঁদ নিয়ে গিয়ে সাতালি পর্বতের চূড়ায় লোহার বাসর ঘরে তুলতে চান।

১। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল; কঃ বিঃ, ১৯৪৯, পৃঃ ১৯৮

বেহুলার আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনায় বেহুলার পিতৃগৃহে সকলেই কাতর। এই পরিপ্রেক্ষিতে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের বর্ণনায় পাই—

বেহুলা নাচনী প্রবোধিয়া সভাকারে।
শুভক্ষণে যায় রামা দোলার উপরে ॥[১]

বাঙ্গালী পরিবারের সদ্যবিবাহিতা কন্যা এত সহজে বিদায় নিতে যে পারে না, এ সত্য আমাদের অজ্ঞাত নয়। নবোঢ়া বালিকার অবিরত অশ্রুমোচনে যে করুণ পরিবেশ রচিত হয়, সমগ্র পরিবারের অন্তর্বেদনা ধারা-শ্রাবনের অজস্র বর্ষণের মত সমগ্র পরিবেশটিকে যেভাবে আবিষ্ট করে তোলে, তার মাঝখান থেকে কন্যার বিদায় এত সহজ আর এত সংক্ষিপ্ত কখনোই হতে পারে না। কেতকাদাসের অতিসংক্ষিপ্ত ভাষণ আমাদের মানসচক্ষে কন্যার বিদায়দৃশ্যটিকে পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরতে পারে না। কোথায় যেন তালভঙ্গ হয়। সেদিক থেকে দ্বারিকা দাসের বর্ণনা অনেকখানি সঙ্গতি রক্ষা করতে পেরেছে, বাঙ্গালী পরিবারের বেদনাকাতর অনুভূতিকে যথার্থ মূল্য দিতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর বেহুলা বলেছেন—

ছাড়গো আমার আশা শুনগো জননী।
এতদিনে বিচ্ছেদ করিল বিধি আনি ॥
সাতপুত্র সাতবধূ লয়্যা কর ঘর।
চিতে আইলে দয়া কৈলে নহে দূরান্তর ॥
সায় বাণ্যা বলে মাগো কেন কান্দ আর।
প্রতিমাসে তোমায় আনিব একবার ॥
চম্পা নগ্র নিছানি সে বহু নহে দূর।
তবু শূণ্য হবে মোর তোমা হৈতে পুর ॥
বেহুলা বলেন বাপা তুমি ভাগ্যবান।
সাতপুত্র সাতবধূ ঘরে বিদ্যমান ॥
তেজিয়া সকল যাই দেহ পদধূলি ॥
কেবল পরের ভাগ্যে মোরে দিলে তুলি ॥
ভ্রাতৃবধূ গণে বেহুলা প্রবোধে অপার।
পাঠাও ভাইরে মোর লইতে সমাচার ॥

১। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সং কেতকা দাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, কঃ বিঃ, ১৯৪৯, পৃঃ ২৪৬

বেহুলার সাথে কান্দে সাত সহোদর।
হেনকালে ঘরে আইল চান্দ সদাকর॥
দেখিল আসিয়া ঘরে সভার ব্যাকুল।
চাঁদবাণ্যা ডাক পাড়ে কর অনুকূল॥
হরষে বিরসবোধ দিয়া সভাকারে।
বরকন্যা বসে গিয়া দোলার উপরে॥ (পৃ ৫৩-৫৪)

বলাবাহুল্য যে, দ্বারিকা দাসের বর্ণনা দীর্ঘ বলেই বিদায়দৃশ্যটি সম্পূর্ণতা পেয়েছে, সুসঙ্গত হয়ে উঠেছে।

এ অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই আছে যে, বিবাহের শাস্ত্রীয় বিধান পালনে যতটুকু সময় লাগে, তার অনেক বেশী সময় লাগে লোকাচার আর স্ত্রীআচার পালনে। ফলে বিবাহের সমগ্র অনুষ্ঠানের পালনেই একটি রাত্রি অতিবাহিত হয়। লখিন্দরের বিধিলিপি, বিবাহের রাত্রেই সর্পদংশনে তার মৃত্যু হবে। অথচ এদিকে বিবাহের অনুষ্ঠানেই সমস্ত রাত্রি অতিবাহিতপ্রায়। রাত্রের মধ্যে সর্পদংশন এবং মৃত্যু না হলে কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষিত হয় না। উভয় কূল রক্ষার জন্যে দ্বারিকা দাস কাহিনীর মধ্যে নূতন সূত্র সংযোজন করলেন। তিনি বললেন—

চিন্তিল মনের মধ্যে দেবী বিষহরী।
অল্পরাত্র পুহাইলে কি করিতে পারি॥
সূর্য্যে আজ্ঞা কৈল মাতা চিন্তিয়া হৃদয়।
তিনি দিন তিনি রাত্র না হবে উদয়॥
আমার বিনয় রাখ শুন দিনকর।
আচ্ছাদনে যাও তুমি গগন উপর॥
লক্ষিতে না পারে যেন পৃথিবীর জন।
রাত্রসম হউ দিন রাখ নিবেদন॥ (পৃ ৫১)

লৌহবাসরের মধ্যে বেহুলা যখন একটির পর একটি সাপকে বন্দী করে চলেছেন, লখিন্দর তখন নিশ্চিন্ত নিদ্রায় অভিভূত। এই প্রসঙ্গে কেতকাদাস বললেন, রাত্রি তিন প্রহরের সময় লখিন্দরের নিদ্রাভঙ্গ হতেই বেহুলা তাঁকে মনসার অভিশাপের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বেহুলা বলেছেন—

হের দেখ তিন সর্প উঠেছে পর্বতে।
বাসরে আসিয়াছিল তোমারে খাইতে॥

সাপিনী দেখিয়া মোর নিদ্রা হৈল ভঙ্গ।
সুবর্ণ সাঁড়াশি দিয়া বান্ধিল ভুজঙ্গ ॥
এতেক শুনিলা যদি বেহুলার ঠাঁই।
ক্ষুধায় আকুল হৈল দুর্ল ভ লখাই ॥[১]

এই বর্ণনার মধ্যে অসঙ্গতি একাধিক। বেহুলা বলছেন, সাপ দেখে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হোল, অথচ ঐ পরিচ্ছেদেরই গোড়ার দিকে কেতকাদাস বলেছেন, 'বেহুলার নিদ্রা নাহি দেবীর কৃপায়'। আবার একটু পরেই বলেছেন, 'কপাটের আড়ে দেখে ভীষণ ভুজঙ্গ, চমকি বেহুলা উঠে নিদ্রা হৈল ভঙ্গ'। যাই হোক, যে বর্ণনাটি এর চাইতেও অসঙ্গত ঠেকে তা হোল, সর্পদংশনের আশংকার কথা স্মরণ করিয়ে দেবার ঠিক পরেই লখিন্দরের ক্ষুধার্ত হবার কথা বলা।

দ্বারিকা দাসের বর্ণনায় এ অসঙ্গতি নেই। এখানে লখিন্দরের নিদ্রিতাবস্থায় বেহুলা সাপেদের বন্দী করেছেন। ক্ষুধার তাড়নে লখিন্দর জেগে উঠে যখন তাঁর ক্ষুধার কথা বেহুলাকে জানিয়েছেন, বেহুলা কিন্তু সাপের কথা একেবারেই উল্লেখ করেননি। কেতকাদাসের বর্ণনায় আছে, রান্না করার পর বেহুলা এবং লখিন্দর উভয়েই নিদ্রিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু দ্বারিকা দাসের বেহুলা খাইয়ে স্বামীকে তুষ্ট করেছেন এবং অনেক পরে নিদ্রিত হতে বাধ্য হয়েছেন।

সর্পদংশনের পরবর্তী ঘটনা দ্বারিকা দাস কেতকাদাসের মত সংক্ষিপ্ত করেন নি। এঁর লখিন্দর মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে নিজের অকাল মৃত্যুর জন্যে ক্ষোভ প্রকাশই শুধু করেননি, মাতাপিতা এবং সদ্যোবিবাহিতা বেহুলার জন্যেও অজস্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন—

আকুলে পরাণ যায় কেহ নাই সাথা।
মাতাপিতা কার সনে না হইল দেখা ॥
উত্তর না দেঅ রামা কালনিদ্রা ভরে।
অকারণে তোর জন্ম গেল মোর তরে ॥
অর্ধঅঙ্গ দিলাম তোরে বিভার দিবসে।
মৃত্যুকালে দেখ রামা উঠে বৈস পাশে ॥
সুশীতল দেঅ জল সায়ের কুমারী।
বিষের বিষম জালে তনু গেল ঘারি ॥

১। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল : কঃ বিঃ, ১৯৪৯, পৃঃ ২৫২

লিখিল আমার মৃত্যু বিধি বাসঘরে।
দিবেগো সভায় লজ্জা অতিশয় তোরে ॥
যথা তোর বাপভাই যাও তার ঘর।
তোমা আমা যেই এই সংসার ভিতর ॥ (পৃ ৭০)

বিলাপটি দীর্ঘায়িত কিন্তু অসঙ্গত নয়। নিজের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে মৃত্যুর পর বেহুলার ভবিষ্যত চিন্তাও মৃত্যুপথযাত্রী লখিন্দরকে কাতর করে তুলেছে। তার কাতর বিলাপের স্পর্শ পাঠকের অন্তর আলোড়িত করে, চক্ষু অশ্রুসজল করে তোলে।

বিজয় গুপ্তের চাঁদ চৌদ্দখানি নৌকো নিয়ে বাণিজ্যে বেরিয়েছিলেন। মনসা সেগুলি ডোবানোর জন্যে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন পিতা মহাদেবের। তিনি প্রথমে সাহায্য করতে রাজী হননি। শেষে সম্মতি দিলেও বলে দিয়েছিলেন—

প্রাণে না মারিয় তারে শোনহ বচন।
ধনে জনে ডুবাইয়া কর বিড়ম্বন ॥[১]

যখন চাঁদ কুলে উঠবার জন্যে সাত দিন 'সাত রাত্র' প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছেন, তখন—

তার পাছে পদ্মাবতী কলস ভাসাইল।
হেতালের বাড়ি দিয়া কল (স) ভাঙ্গিল ॥[২]

কেতকাদাসের মনসামঙ্গলে দেখা যায় যে, চাঁদের প্রাণরক্ষার জন্য—

সাধুর দুর্গতি দেখি জগতী কমলা।
রামকলা কাটিয়া তাহারে দিল ভেলা ॥[৩]

দ্বারিকা দাসের এই অংশের সঙ্গে কেতকাদাসের সামঞ্জস্য অনেকখানি। কিন্তু যে অল্প পরিমান পার্থক্য তিনি সৃজন করেছেন, তার মূল্য যথেষ্ট। কবির বর্ণনায় পাওয়া যায়—

সাধুর দুর্দশা দেখিয়া মনসা।
ফেল্যা দিল জবা পুষ্প দূরে তেজি ঘোষা ॥

১। শ্রীজয়ন্ত কুমার দাসগুপ্ত সং কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরান ; কঃ বিঃ, ১৯৬২, পৃঃ ২৭৯
২। ঐ — — —পৃঃ ২৮৯
৩। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সং কেতকা দাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল , কঃ বিঃ ১৯৪৯,পৃঃ ১৯৯

মনসার মায়া কে জানিবে তাহা।
জলমধ্যে পড়ে এক রম্ভাতরু হয়্যা ॥ (পৃ ৮)

বলা বাহুল্য, মনসার স্বয়ং রামকলা কেটে ভেলা দেওয়া আর ফেলে দেওয়া ফুল দৈবশক্তিতে ভেলা হয়ে যাওয়ার মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য আছে।

লখিন্দরের মৃত্যুর খবরে চাঁদ যে ভেঙ্গে পড়েননি, এমন বর্ণনা বিজয় গুপ্তের একটি পুঁথিতে পাওয়া যায়। সেই পুথির সংশ্লিষ্ট পাঠটি হোল—

তপের প্রভাবে চাঁদ যোগমন্ত্র জানে।
কারণ জানিয়া শোক পাসরে আপনে ॥
চান্দ বলে প্রিয়া তুমি না কান্দিয় আর।
মনেতে ভাবিয়া দেখ সকল অসার ॥
গেল গেল সাতপুত্র স্থির কর মন।
না পাইবা লখিন্দর করিলে রোদন ॥[১]

কেতকাদাসের চাঁদ বলেছেন—

ভাল হৈল পুত্র মৈল কি আর বিবাদ।
কানি চেঙ্গমুড়ি সনে ঘুচিল বিবাদ ॥
ক্রোধ হৈয়া নাড়ারে বলিছে চাঁদ বাণ্যা।
কানির উচ্ছিষ্ট মড়া ফেল নিয়া টান্যা ॥
ঝাট কর‍্যা কাট নাড়া, রামকলার পাত ;
মৎস্য পোড়া দিয়ে আজি খাব পান্তাভাত ॥[২]

দ্বারিকা দাসের বর্ণনায় পাওয়া যায়—

রজনীর শেষভাগে দংশিল কালিনী নাগে
বুঝিয়া সকল সমাচার।
হেন্তালের বাড়ি কান্ধে নাচিতে লাগিল চান্দে
আনন্দিত হাসিয়া অপার ॥
বলে মোর ভাল হৈল পুত্র লক্ষীন্দর মৈল
ঘুচিলেক কানির বিবাদ।
শিব বিশ্বনাথ বলি নাচে দুই বাহু তুলি
বড়ই নিষ্ঠুর তনু চাঁদ ॥

১। শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত সং কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, ক: বি: ১৯৬২, পৃ: ৪৩৫ পা: টী:
২। যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য সং কেতকা দাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, ক: বি: ১৯৪৯ পৃ: ২৫৮

হাসি বলে চাঁদ বাণ্যা মড়া ফেল দূরে টান্যা
সনকা কান্দয়ে কি লাগিয়া।
চেঙ্গমুড়ি বিষহরী উচ্ছিষ্ট করিল পুরী
পবিত্র করিব শীঘ্র হয়্যা ॥ (পৃ ৭৮)

বিজয় গুপ্তের চাঁদ সদাগর উচ্চকোটির জীবনদর্শন সঞ্জাত উদাসীনতায় পুত্রগণের মৃত্যুকে স্বাভাবিক জাগতিক নিয়ম বলে গ্রহণ করেছেন। তিনি কিন্তু এ কথাও বলেছেন—

তুমি আমি থাকি যদি শতেক বৎসর জিয়া।
আর জত পুত্র মোর জন্মিবে আসিয়া॥
না কান্দিঅ অগ সোনাই কহিলাম তোমারে।
কত পুত্র হবে মোর মহাদেবের বরে। [১]

কেতকাদাসের বর্ণনায় সেই অত্যুচ্চ দার্শনিকতা নেই বরং তার কোন অংশ আমাদের সন্তান সম্পর্কিত সূক্ষ্ম অনুভূতিকে পীড়িত করে। দ্বারিকা দাসে দার্শনিকতা আছে ('জন্ম হৈলে মৃত্যু দেখ আছে সভাকার, তার লাগি দুঃখ রামা না করিহ আর') আবার 'ভাল হৈল, পুত্র লক্ষীন্দর মৈল' ও শোনা যায়। দ্বারিকা দাস কিন্তু পরের ছত্রে এমন একটি ব্যঞ্জনাধর্মী শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার সাহায্যে চাঁদের প্রকৃত মানসিকতাটি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। কবি বলেছেন—

দারুণ পুত্রের শোকে নানা কথা কহে মুখে
অভিমানে নিন্দে বিষহরী। (পৃ ৩৯)

মনসা চাঁদের কাছ থেকে পূজা আদায় করবার জন্যে তাঁর একটির পর একটি পুত্রের মৃত্যু ঘটিয়ে চলেছেন। বাধ্য সর্পকুলের সাহায্যে মনসার এই গোপন শত্রুতা বোধ করবার শক্তি পৃথিবীবাসী মানব চাঁদ সদাগরের নেই। দৈবশক্তির এই ক্রুরতার কাছে তাঁর পরাজয় অনিবার্য হয়ে পড়েছে তাই পুত্রের মৃত্যুতে 'ভাল হৈল' বলা ছাড়া তাঁর গত্যন্তরও ছিল না। কিন্তু সে যে অভিমানাহত অন্তরের খেদোক্তি, এই পরম সত্যটি দ্বারিকা দাস সংক্ষিপ্ত ভঙ্গীতে সুস্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ করেছেন। চাঁদের চরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

১। শ্রীজয়ন্ত কুমার দাসগুপ্ত সং কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, কঃ বিঃ ১৯৬২, পৃঃ ৪৩৫ পাঃ টীঃ

লখিন্দরকে পুনর্জীবন দান করার পর বিষ্ণুপালের বেহুলা ছ'জন ভাসুরের প্রাণ ভিক্ষা করেছেন কিন্তু এর জন্যে কোন যুক্তি উপস্থাপিত করেন নি। বিষ্ণুপালের বর্ণনায় পাওয়া যায়—

বেউলা বলে বিষহরী এক নিবেদন করি
মোর কথা কর অবধান।
শুন মাতা বিষহরী এক নিবেদন করি
ছয় ভাসুর দাও জীও দান॥

বিজয় গুপ্তের বেহুলা অনেক বেশী সতর্ক। তিনি বলেছেন—

সব নষ্ট হৈছে মোর শ্বশুরের বাদে।
স্বামী লইয়া ঘরে যাই তোমার প্রসাদে॥
ছয়ে জায়ে কান্দিয়া দেখিব মোর সুখ।
সে সব দেখিয়া মোর বিদরিব বুক॥[১]

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের পুথিতে পাওয়া যায়, বেহুলা এক একটি বর প্রার্থনার আগে এক বার করে নৃত্য করে দেবদেবীদের সন্তুষ্ট করেছেন। তাঁর মনসা বেহুলাকে প্রশ্ন করেছেন—

কিসের কারণে আর নাচ বাণ্যা বেটী।
তোরে আমি জানি ভাল সাধু বাণ্যার ঝি॥
বেহুলা বলেন মাতা কোপ কর দূর।
জিয়াইয়া দেহ মোর ছয়টি ভাসুর॥
ভাল ভাল বলি দেবী দিলেন আশ্বাস।
তা সভা আনিতে যাই যমের আবাস॥[২]

উল্লিখিত বর্ণনাগুলির সঙ্গে দ্বারিকা দাসেরটি মিলিয়ে দেখলে এর যুক্তিবত্তা সহজেই অনুভূত হবে। এঁর বেহুলা একবারই নৃত্য করেছেন আর তারপর তিনবার তিনটি বর প্রার্থনা করেছেন। এঁর বেহুলার মুখে শুনি—

পূজিবে শ্বশুর ক্রোধ কর দূর
যদি নিবেদন রাখ।
যাইতে বল দেশ বলি যে বিশেষ
ধর্মপথ নহে দেখ॥

১। শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত সং কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, ক: বি: ১৯৬২, পৃ: ৪১১
১। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, ক: বি: ১৯৪৯, পৃ: ৩০১

জিয়াইয়া স্বামী সুখে যাব আমি
আপনার কর্ম সাধি।
ছয় জায়া মোরে দেখি নিরন্তরে
তুলিবে দুঃখের নদী ॥
অঝোর করুণা করিবে শোচনা
সহিতে নারিব প্রাণে।
কীর্তি যুগে যুগে থাকু ভূমিভাগে
ছ ভাইশুরে দেহ দানে ॥ (পৃ ১৪১)

ধার্মিক দ্বারিকা দাসের বেহুলা বার বার নৃত্য করে নিজেকে খাটো করেননি শুধু নয়, নিজের পুনর্জীবিত স্বামীকে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করা যে 'ধর্ম পথ' নয় সে কথা ও উল্লেখ করেছেন। এঁর বেহুলা ব্যক্তিত্বের বিচারে যে উচ্চ স্থানাধিকারিনী, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে ডঃ সুকুমার সেনের বর্গীকরণ মেনে নিয়ে দ্বারিকা দাসের কাব্যটিকে রাঢ়ের মনসামঙ্গল বলা অত্যন্ত যুক্তিসম্মত। অতএব এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে কবি দ্বারিকা দাস তাঁর পূর্বসূরী বিষ্ণুপাল, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, সীতারাম দাস, রসিক মিশ্র এবং বানেশ্বর রায়ের সমগোত্রীয়।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে অন্যান্য কয়েকটি মনসামঙ্গলের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে দ্বারিকা দাসের রচনাংশের সঙ্গে কেতকাদাসের বর্ণনাগত সাদৃশ্য পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই স্বাভাবিক। এই সাদৃশ্য সম্পর্কে তাই বিস্তৃততর আলোচনা সমীচীন বলেই মনে হয়।

ঝড়জলের মধ্যে নিজের বাণিজ্য তরীগুলি নিয়ে চাঁদ সদাগর যখন রীতিমত বিপন্ন, তখন চাঁদের সেই সময়ের মনোভাব বর্ণনা করছেন কেতকাদাস—

যে করেন শিবশূল এবার পাইলে কূল
মনসার বধিব পরাণ।
এত বলে বাণিয়া কটু কথা শুনিয়া
কোপেতে জলে হনুমান ॥
করিয়া হড়মড় মহাবেগে বহে ঝড়
হনুমান বাড়িল যে বলে।

মতিগতি মনসা   মারিয়া পদের ঘা
সাতডিঙ্গা ডুবাইল জলে ॥১

এই দৃশ্যের বর্ণনা দ্বারিকা দাসে পাওয়া যায়—

শীতে থরহর চান্দ সদাকর।
মনসারে গালি দেয় স্মরে বিশ্বেশ্বর।
কোপে হনুমান সদাকরে চান।
সাতডিঙ্গা একেবারে ডুবায়্যা ফেলান॥ (পৃ ৭)

নৌকো ডোবার পর চাঁদের দুর্দশা, কেতকাদাসের ভাষায়—

চক্ষু রাঙ্গা পেট বড় খাইয়া চুবানি।
চাঁদ বলে দুঃখ দিল চেঙ্গ মুড়ি কানি॥ (পৃঃ ১৯৮)

ঐ অবস্থার বর্ণনা দ্বারিকা দাসের ভাষায়—

ভাসিল বিস্তর চান্দ সদাকর।
জল খায়্যা পেট তার হইল ডাবর॥ (পৃ ৭)

মনসার নিজের প্রয়োজনেই চাঁদ সদাগরকে বাঁচিয়ে রাখার কথা ভেবেছেন তিনি, চাঁদের প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে নয়। সেই অবস্থার উল্লেখ কেতকাদাসে আছে—

সাধুর দুর্গতি দেখি বিদরয়ে হিয়া।
বস্ত্যা ছিল শতদলে দিল ফেলাইয়া॥ (পৃঃ ১৯৮)

দ্বারিকা দাসে আছে—

নেতৃ যে বলিল মনসা চিন্তিল।
বস্যো ছিল পদ্মপুষ্পে জলে ফেল্যো দিল॥ (পৃ ৭)

কালনাগিনীকে প্রেরণ করেছেন মনসা। লৌহবাসরের মধ্যে সে লখিন্দরকে দংশন করেছে। এই কথাটি কেতকাদাসে আছে—

বিষদন্ত দিয়া কালী দংশে তার পায়।
দুর্লভ লখাই জাগে বিষের জালায়॥

দ্বারিকা দাসে আছে—

ছুটিল মুখের বিষ লাগিল চরণে।
দংশন করিল কালী বিষদন্ত সনে॥ (পৃ ৬৯)

১। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, কঃ বিঃ ১৯৪৯, পৃঃ ১৯৭

লখিন্দরের মৃত্যুর পর কেতকাদাসের সনকা বেহুলাকে র্ভৎসনা করে বলেছেন—

সনকা কান্দিয়া দেয় বেহুলারে গালি।
সিঁথায় সিন্দুরে তোর না পড়িল কালি।
পরিধান বস্ত্রে তোর না পড়িল মলি।
পায়ের আলতায় তোর না পড়িল ধুলি॥
খণ্ডকপালিনী বেহুলা চিরল দাঁতি।
বিভাদিনে পতি মৈল না পোহাল রাতি॥

দ্বারিকা দাসের সনকাও র্ভৎসনা করেছেন—

বেহুলারে হেনকালে সনকা চাহিয়া বলে
কোথা ছিল বধূ কুলক্ষনী।
বাসঘরে বিভারাত্রে নাশিতে আমার পুত্রে
এত কর্মে আস্থা ছিল জানি॥
খণ্ডকপালিনী নারী খণ্ডতপ পূর্বে করি
খণ্ডাইলে আসি মোর সুখ।
দ্বারিকা দাসেতে বলে সনকা চরণ তলে
অধিকে দুগুনে বাড়ে দুখ॥ (পৃ ৭৫-৭৬)

কেতকাদাস বেহুলাকে বলেছেন 'মনসার ব্রতদাসী'। তাঁর কাব্যে পাই—

চিরণ চিরণ দন্ত উচ্চ কপালিনী।
মনসার ব্রতদাসী জনমিলা তিনি॥

দ্বারিকা দাসের মনসা বেহুলাকে সম্বোধন করে বলেছেন—

ব্রতকন্যা তুমি মোর সংসারের মাঝে।
উদ্ধারিয়া দুইলোকে যাবে নিজ তেজে।। (পৃঃ ১৪৬)

উভয় কাব্যের মধ্যে এই ধরণের বর্ণনা পদ্ধতিতে বা শব্দপ্রয়োগে কিছু সামঞ্জস্য চোখে পড়ে। দ্বারিকা দাসের কালবিচার প্রসঙ্গে যে সব তথ্য উল্লিখিত হয়েছে, তা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধা নেই যে, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ তাঁর অগ্রজ ছিলেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কালব্যবধান যে বেশী ছিল না সে কথাও ঠিক। আমরা যে যুগের কথা ভাবছি, তখন কোন কবির রচনা খুব তাড়াতাড়ি বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল না। ভেবে দেখা যেতে পারে, গুমগড় এবং নন্দীগ্রাম এলাকায় সঙ্গীত চর্চার যে ধারা

প্রবাহিত ছিল তাতে যোগ করবার জন্যে কেতকাদাসের পুথি মেদিনীপুরে আনীত হয়েছিল কিনা এবং যখন দ্বারিকা দাস কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে নন্দীগ্রাম যান তখন তিনি এই পুথির বিষয়বস্তু গীত হতে শুনেছিলেন কিনা।

এই বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে দুটি তথ্যের কথা উল্লেখের প্রয়োজন আছে মনে করি। প্রথমতঃ, দ্বারিকা দাসের দু'খানি পুথির সঙ্গে কেতকাদাসের একখানি পুথি (বি-৬৩) ও একই সংগ্রাহক উড়িষ্যা রাজ্য প্রদর্শশালায় দিয়ে গিয়েছেন। কেতকাদাসের দ্বিতীয় পুথিখানি মেদিনীপুরের সন্নিহিত অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত চণ্ডীপুর গ্রাম নিবাসী জনৈক শ্যামাপদ দাস সংগ্রহশালায় দিয়ে যান। দ্বিতীয় এই পুথিখানি (বি-১৪৮) পূর্বোল্লিখিত পুথির মত খণ্ডিত হলেও, এতে অনেক বেশী পাতা আছে।

দ্বিতীয়তঃ, দ্বারিকা দাস কর্তৃক উল্লিখিত নন্দীগ্রাম ও শুমগড় এলাকায় পুরুষানুক্রমে একশ্রেণীর মানুষ বাস করে আসছেন যাঁরা 'পটিদার' নামে পরিচিত। এঁরা নিজেদের আঁকা মনসার পট দেখিয়ে ও স্বরচিত গান গেয়ে জীবিকার্জন করে থাকেন। এঁদের পদবী 'চিত্রকর'। নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে এঁরা বলেন যে এঁরা হিন্দুই ছিলেন কিন্তু মুসলমান আমলে ধর্মচ্যুত হন। এঁরা মুসলমানদের আচার পরম যত্নে পালন করেন এবং বিবাহ মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু এঁদের নামগুলি সবই হিন্দুর মত।

নন্দীগ্রাম অঞ্চলে এই পটিদারগণ মনসার ভাসান গান গেয়ে আসছেন কয়েক শতাব্দী ধরে। এখন যে গানটি লোকপ্রিয়, সেটি পরিশিষ্টে সংযোজিত হোল। এই গানে কেতকাদাসের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়।

দ্বারিকা দাস যে মূলতঃ আসরে গীত হবার তাগিদে কাব্য রচনা করেন তার প্রমান কাব্যের মধ্যে প্রচুর। কবি তাঁর গানে 'আসরের' কথা বহুবার উল্লেখ করেছেন। অতএব দ্বারিকা দাস যখন মেদিনীপুর যান তার পূর্বেই নন্দীগ্রাম অঞ্চলে কেতকাদাসের কাব্য প্রচলিত ছিল কিনা এবং ঐ কাব্যের সঙ্গে দ্বারিকা দাসের পরিচয় সম্ভব ছিল কিনা, এ প্রসঙ্গ ভেবে দেখার অবকাশ আছে। তবে দু'টি কাব্যের মধ্যে কোথাও কোথাও যে সামঞ্জস্য আছে তা অনস্বীকার্য।

মনসামঙ্গল কাব্যবৃত্তে দ্বারিকা দাসের অবদান তুলনামূলক ভাবে আলোচিত হোল। এই প্রসঙ্গে কবির বাস্তবতাধর্মী মাত্রাজ্ঞান এবং সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির আলোচনাও করা হয়েছে। মূল বক্তব্যের সমান্তরাল ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য

বিষয় যেটি ছিল, তা হোল এই যে কবির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল প্রকৃতপক্ষে আধুনিক।

সেই যুগে সমষ্টিগত চিন্তার মধ্যেই শুরু হয়েছিল আত্মানুসন্ধান। সেদিন দেবতা আর মানুষের সহাবস্থান ঘটলেও, দেবতাই স্থান জুড়েছিলেন অনেকখানি। তবু মঙ্গলকাব্যগুলিকে আধুনিকতার সূতিকাগার বলার পেছনে যুক্তি আছে। অবশ্য বৈষ্ণব এবং অনুবাদ সাহিত্যে কোথাও কোথাও এ লক্ষণ অবশ্যই দেখা যায়।

সাম্প্রতিক কালের উপন্যাস মানুষের স্বাতন্ত্র্য আর মর্যাদাবোধ, জীর্ণ সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের প্রতি অনাস্থা আর নবীন সমাজসৃষ্টির প্রতিশ্রুতি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এই সামগ্রিক চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে দেখি ব্যক্তি মানুষকে। দেবতা আর মানুষের রাজ্য এখানে সুনির্দিষ্টভাবেই পৃথকীকৃত। অধিকারের সীমা-রেখা সুনির্ণিত। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—এ প্রশ্ন আজ আর নতুন করে তোলার প্রয়োজন নেই।

মঙ্গলকাব্য সমূহের মধ্যে যে উল্লিখিত মনোভঙ্গীগুলি দানা বেঁধে উঠেছিল, এবিষয়ে বাংলা সাহিত্যের সমালোচকেরা মতৈক্যে উপনীত হয়েছেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসের বীজ আবিষ্কার করতে গিয়ে মঙ্গলকাব্যের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, উজ্জ্বল বাস্তবচিত্র, জীবন্ত চরিত্র, কাহিনী ও চরিত্রের নিগূঢ় সম্পর্ক ইত্যাদির সুস্পষ্ট পূর্বাভাস মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে পাওয়া যায়।

চাঁদ ও বেহুলার চরিত্র আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে এঁদের অনমনীয় ব্যক্তিত্ব দেবী মনসার দৈবশক্তিকে ম্লান করে দিয়েছে। মনসাকে এঁদের সঙ্গে আপস করতে হয়েছে। তাতে তাঁর কতখানি সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে তা অবশ্যই বিচার করে দেখা দরকার। ফলতঃ, এই যুগ থেকেই মানুষ আপন চিন্তাগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে, আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে, চিরাচরিত কুসংস্কার থেকে মুক্তিলাভ করতে চেয়েছে।

তুলনামূলক বিচারে দ্বারিকা দাসের কাব্যে এই আধুনিকতার প্রকাশ যে বেশী, এইটিই ছিল প্রতিপাদ্য বিষয়। এখানে কাহিনী শুধু ঐতিহ্যানুসরণ নয় বা চরিত্রগুলি কাহিনীর প্রয়োজনে ক্রীড়নক মাত্র নয়। কাহিনীর স্তরে স্তরে কার্য-কারণ সম্পর্কের বন্ধন এত দৃঢ় যে কোথাও মধ্যযুগসুলভ শিথিলতা বেশী চোখে পড়ে না। শুধু তাই নয়, এঁর মাত্রাজ্ঞানও লক্ষনীয়। কোথাও সংক্ষিপ্ত

আবার কোথাও দীর্ঘ বক্তব্য এঁর কাব্যটিকে এক ধরণের সুষমায় মণ্ডিত করে রেখেছে। তাই এ কাব্যটি শুধু সুখপাঠ্যই নয়, সাম্প্রতিক কালের মনোবৃত্তিকেও তৃপ্ত করে।

অন্যান্য মনসামঙ্গল কাব্য থেকে যে সব ছত্র উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলিও দ্বারিকা দাস সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। এই সম্পর্কে আরও একটি বিষয় বিচার করে দেখা উচিত মনে করি। এই বিচারে বর্তমান কবির শ্রেষ্ঠতা প্রমানিত হবে।

মধ্যযুগীয় ভাবাত্মক কাব্যধারায় অতিরঞ্জন এবং অলৌকিক বিষয়-বস্তর অসপত্ন অধিকার প্রতিষ্ঠিত আছে। বৈষ্ণব ও মঙ্গলকাব্যগুলিতে এর অজস্র প্রমান পাওয়া যায়। কবি দ্বারিকা দাস এই দু'টি বিষয়ের প্রতি আগ্রহশীল না থাকায় এমন বহু অংশ তাঁর কাব্যে স্থান পায়নি, যেগুলি মঙ্গলকাব্যধারার বিশিষ্ট অংশ বলেই পরিগণিত। এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। এখানে অত্যন্ত সংক্ষেপে আর দু'একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাচ্ছে।

লোহার কলাই সেদ্ধ করতে যাবার আগে বৃদ্ধা বেশধারিণী মনসা স্নানের ঘাটে বেহুলার সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন কেতকাদাস বলেছেন দু'জনেই স্নান করতে নেমেছিলেন এবং মনসা তুলেছিলেন 'শংখ চন্দন' আর বেহুলা, 'সুবর্ণ কংকণ'। এই অপরাধে মনসা বেহুলাকে শাপ দিলেন, 'বাসরে খাইবে পতি পাবে মনস্তাপ'। কিন্তু বেহুলার অপরাধটি কোথায় তা স্পষ্ট নয়।

দ্বারিকা দাসের কাব্যে জলে ডুবে বিভিন্ন বস্তু সংগ্রহের কথা নেই। তিনি বলেছেন যে বেহুলা যখন স্নান করতে নামলেন তখন বৃদ্ধাবেশিনী মনসা ঘাটের পাশেই বসেছিলেন। তার ফলে—

> চরণের জল বিস্তার হৈয়া।
> লাগে মনসার শরীরে গিয়া॥
> ক্রোধে থরহর ভূজঙ্গ মাতা।
> বেহুলারে বলে শুনলো কথা॥ (পৃ ৩৬-৩৭)

মনসার ঐ 'কথা'টি হোল, 'বাসর ঘরেতে বিভার রাতি, অনাথিনী হবে হারায়্যা পতি'। দ্বারিকা দাস শুধু অলৌকিক অংশটুকু বর্জন করেছেন কিন্তু এতেই কাব্যের মূল্য অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে।

দ্বারিকা দাসের কাব্যে কোথাও কিছু অতিরঞ্জন নেই, এ বক্তব্য আমরা প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করিনি। কিছু অতিরঞ্জন আছে স্বীকার করে নেবার

পরও বলতে হয় যে সে অতিরঞ্জন সীমাতিক্রান্ত অবস্থায় পৌছে হাস্তকর হয়ে ওঠেনি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে লখিন্দরের বিবাহে 'এগার হাজার আর সাতশ পঁচাশ' জন বণিক বরযাত্রী হয়ে গিয়েছিল, এ অবশ্যই অতিরঞ্জন। কিন্তু তাই বলে 'সাত দিন সাত রাত্রি জলের মধ্যে ভাসে, দাড়ির মধ্যে বাসা করিল বড় বড় মৎস্তে' (বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, পৃ ২৮৯), দ্বারিকা দাসের কাব্য থেকে উদ্ধৃত অংশের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

মনসামঙ্গল কাব্যধারায় দ্বারিকা দাসের কাব্যখানি একটি মূল্যবান সংযোজন এবং এটির কাব্যমূল্য তুলনামূলক বিচারে যথেষ্ট বেশী।

ভাষাতাত্ত্বিক বিচার

এই মঙ্গলকাব্য খানির সাধারণ পরিচয় দান প্রসঙ্গে এর ভাষাগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এঁর কাব্যটি মূলতঃ মধ্য বাংলায় লিখিত কিন্তু তার সঙ্গে সমকালীন ওড়িয়া শব্দের স্বচ্ছন্দ মিলন ঘটেছে। এ তথ্যও উল্লিখিত হয়েছে যে, এই তুটি ভাষার মিলিত রূপের সঙ্গে কিছু ব্রজবুলির মিশ্রণও ঘটেছে।

মধ্যবাংলার স্থিতিকাল ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ডঃ সুকুমার সেন মধ্য-বাংলাকে আদি-মধ্য এবং অন্ত্য-মধ্য এই তুই স্তরে ভাগ করে বাংলা ভাষার বিবর্তনের রূপটি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। একটি তথ্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রাচীন বা মধ্য বাংলার মূল পুথি আমরা পাইনি। আমরা যে সব পুথি পেয়েছি বা এখনো সংগ্রহ করছি এগুলির অধিকাংশই অষ্টাদশ শতক বা উনবিংশ শতকের পূর্বার্ধে লিখিত। ফলে মূল পুথির ভাষা এই অনুলিখিত পুথিগুলিতে প্রত্যাশা করা অনুচিত। এ বিষয়টি পূর্বেও আলোচিত হয়েছে।

দ্বারিকা দাসের যে তু'খানি পুথি পাওয়া গেছে তার মধ্যে আদর্শ পুথিটি প্রাচীনতর। তু'খানিরই লিপিরূপ ওড়িয়া। ওড়িয়া লিপি বিশেষজ্ঞের মত গ্রহন করেই আদর্শ পুথি নির্বাচনের পর এই পুথির বাংলা ভাষা বিচার করে দেখা গেছে যে, এটির ভাষারূপ দ্বিতীয় পুথির তুলনায় প্রাচীনতর।

তৎসম এবং অর্ধ-তৎসম শব্দ সমূহের রূপ সব পুথির মধ্যে শুদ্ধভাবেই থাকা উচিত, এই বহুমানিত রীতি এ ক্ষেত্রেও অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু মূল পুথিতে শব্দের যে রূপগুলি ছিল সেগুলির মধ্যে উচ্চারণানুযায়ী বানানের প্রবণতা সুস্পষ্ট। এই শ্রেণীর শব্দগুলি হোল-আগ্যা (আজ্ঞা), দৈবগ্য (দৈবজ্ঞ),

যগ্যসূত্র (যজ্ঞসূত্র), জিগ্যাসা (জিজ্ঞাসা), বস্র (বস্ত্র), অস্র (অস্ত্র) পুষ্প (পুষ্প) ইত্যাদি।

বস্র এবং পুষ্প শব্দযুগলে সমীভবনের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। দুটি ক্ষেত্রে যথাক্রমে স+ত>স+স এবং ষ+প>ষ+ষ হয়েছে। অস্র শব্দেও এই রীতি দেখা যায়। দৈবগ্য, জিগ্যাসা প্রভৃতি শব্দগুলি অর্ধতৎসম। উচ্চারণানুসারী বানান এগুলির ক্ষেত্রেও অনুসৃত হয়েছিল। পুথির পাঠে এই সব বানানের শুদ্ধরূপই দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কাব্যের মধ্যে কিছু শব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। সেগুলির ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নিম্নরূপ—

দেহ, রাখহ, শুনহ, করহ ইত্যাদি→বর্তমান কাল, অনুজ্ঞা ভাব, মধ্যম পুরুষ। সং-থ (নির্দেশক বর্তমান, বহুবচন)-হ

লয়্যা, পায়্যা, খায়্যা, হারায়্যা→সন্ধির অথবা লোপের পর অভিশ্রুতি>লইয়া>লয়া>লয়্যা, পাইয়া>পায়া>পায়্যা ইত্যাদি, অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ।

বিদুরে→(সং বিদর) নামধাতু। সংস্কৃত তৎসম শব্দের নামধাতু হিসেবে ব্যবহার ষোড়শ শতকের পুথিগুলিতে প্রচুর পরিমানে পাওয়া যায়।

অন্ত্য-মধ্য বাংলায় কিছু কিছু এই ধরণের ব্যবহার ও পাওয়া যায়।

খিয়াল→তদ্ভব (সং ক্ষেপক) নামধাতুনিষ্পন্ন শব্দ।

কোথাকারে→কোথা (সং কুত্রক*)+কা (বিশেষণাত্মক প্রত্যয় ক্রিয়া-বিশেষণে প্রযুক্ত হয়) -রে (সপ্তমী বিভক্তি)

জিয়াইয়া→নিজন্ত শব্দ। সং জী/জি *জীবাপয়—

রঞ্চে→সাধারণ বর্তমান কাল, প্রথম পুরুষ। রচন, বর্ণবিপর্যয়ের ফলে নাসিক্য বর্ণ চ—এর পূর্বে বসে বর্গনাসিক্যে পরিণত হয়েছে। নামধাতু নিষ্পন্ন পদ।

করিলু, পাইলু, দেখিলু→মধ্য বাংলায় ল—কারান্ত অতীকালে অনেকগুলি বিভক্তি দেখা যায়। প্রাচীন থেকে মধ্য বাংলায় পৌছবার সময় তিনপুরুষেই (—আ) এই অতিরিক্ত বিভক্তি যুক্ত হয়েছিল। তারই মধ্যে (-লুঁ)<ল+উ (<-ওঁ), করিলুঁ>করিলু

(তুলনীয় প্রাচীন ওড়িয়াতে 'আস্তে পাইলুঁ')

কৈল, হৈল→কৃদন্ত অতীত কাল, প্রাচীন বাংলা, কএলা>আদিমধ্য, কৈল, কৈলে>অন্ত-মধ্য কৈল, কৈলে

হউ>হউক, অনুজ্ঞা

কাঁচুলি→সং কঞ্চুলিকা>কঞ্চুলিআ>কাঁচুলি

মেলানি→মিল (মিলনে)-অর্থ বিস্তারে বিদায় অর্থে প্রযুক্ত।

পয়ান→সং প্রয়ান, প্রস্থান-পথ অর্থে ব্যবহৃত।

গমিতে→অসমাপিকা ক্রিয়া, <গমন। নামধাতু নিষ্পন্ন পদ।

ঝারা→সং ধারা শব্দজাত, বস্থধারা অর্থে ব্যবহৃত।

বাণ্যা→সং বণিক > বণিঅ > বাণিয় > বাণিয়া > বাণ্যা

কাদম্বিনী→কাদম্ব + সমূহার্থে ইন্, স্ত্রী-ঈ, মেঘশ্রেণী।

গড়িলেক→অতীত কাল, প্রথম পুরুষ, স্বার্থে-ক প্রত্যয় যুক্ত।

উভা→সং উর্দ্ধ > উদ্ভ > উভ, উভা, উঁচু অর্থে।

উভরায়→সং উর্দ্ধরাব > উভরাব > উভরাঅ > উভরায়

দহ→হ্রদ > দহ, বর্ণবিপর্যয়।

সভার→সর্ব > সব্ব > সভ, পূর্ববর্তী স্বর হ্রস্ব হওয়ায় পরবর্তী অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন-বর্ণ মহাপ্রাণে পরিণত।

মান→ওড়িয়া-মানে, বহুত্ববোধক প্রত্যয়, মানে > মান।

আজু ইঃ→ব্রজবুলি শব্দ, মূলতঃ অবহট্‌ঠ এবং প্রাচীন মৈথিলীর সমন্বয়।

সাণ্ডাসি→ সং সংদংশিকা > সণ্ডংসিয়া > সাণ্ডাসি, সাঁড়াশি

পলা→সং প্রবাল, > পবাল বা পোয়াল, ব-শ্রুতি না থাকায় পলা।

অঞ্চাশ→ > উন (প) ঞ্চাস < একোনপঞ্চাশৎ।

অন্ধলা→অন্ধনারী অর্থে। < *অন্ধল, তৎসম শব্দ। স্ত্রীলিঙ্গে-আ

অবয়া→ < অবয়ব

উচাটে→চাঞ্চল্যে অর্থে। < *উৎ-চট্ট Cf. উচ্চাটন

উৎসর্গ→দেশজ শব্দ। উচ্চতা অর্থে ব্যবহৃত।

উছুর→ < উৎসর, তদ্ভব শব্দ। (সময়) উত্তীর্ণ হওয়া অর্থে প্রযুক্ত।

উজাগর→তদ্ভব শব্দ। < উৎ-জাগর (ণ)

উঞ্চে→উঁচুতে। < উচ্চে। বর্গীয় নাসিক্য ধ্বনির সাহায্যে বিষমীভবন।

উত্তারে→কোন নদী বা স্থানের বিপরীত দিকে। < উত্তর 'afterwards' অর্থ সম্প্রসারিত হয়েছে।

উভা→উবুঅর্থে। < উর্দ্ধক, তদ্ভব শব্দ।

উলি→নেমে পড়া (উল্‌হি-উচ্চারণে ব্যবহৃত) সং অবতর/অব-লভ্-

কষণ→দুঃখ অর্থে ব্যবহৃত। < কৃষ্ণ, অর্থ পরিবর্তন ঘটেছে। কালো > অন্ধকার > দুঃখ

কাঁড়ার—তাঁবু, <কাণ্ডার<কাণ্ডাবার

কিলিল→(কপাট) বন্ধ করল। <কীলক 'bolt', নামধাতু নিষ্পন্ন শব্দ।

কুচিয়া→টোপের জন্য ব্যবহৃত ছোট মাছ। <সং কুচিক (কুঁচে মাছ) কুচিঅ>কুচিয়া

খণ্ট→দেশজ শব্দ। লুঠেরা, ছিনতাইবাজ অর্থে ব্যাহৃত। বাংলা 'খাণ্ট' —ডাকাত।

ক্ষুরি→খোদাই করে। <ক্ষুর-'razor'. নামধাতু নিষ্পন্ন শব্দ।

খরে→দ্রুতবেগে। <প্রখর-তৎসম শব্দ। ক্রিয়া বিণ।

খাবাড়→গজাল জাতীয় বস্তু। দেশজ শব্দ।

গণ্ডী→শরীরে মধ্য ভাগ। <গণ্ডি 'the trunk of a tree' তৎসম শব্দ

গার→চিহ্ন,সীমা। <গাড় 'গর্ত' <গড্ড Cf. গর্ত

গুজুরিয়া→(সময়) পার করে দেওয়া, কাটিয়ে দেওয়া।<পারসিক 'guzar' 'passing by'

গুমান→অহংকার। পারসিক গুমান

ঘারা→(বিষে, নিদ্রায়) আচ্ছন্ন হওয়া। <ঘোর, নামধাতু নিষ্পন্ন শব্দ।

ঘোষা—→ক্রোধ।—আরবীয় ঘুস্‌স্‌ 'ghussa', বাংলা গোসা / গোঁসা

চহাট—→তাড়াতাড়ি। দেশজ শব্দ। অনুকারসূচক 'চট্'—এর দেশজ রূপ।

চাতর—→বাহাদুরী। <চাতুর্য্য, তর্দ্ধতৎসম শব্দ।

ছিঞ্চিল—→(জল) ছড়াল। <√সিঞ্চ্

ঝুলা—→ঝোলা। (১) √ঝুল্—(২) <ঝৌলিক, 'ছোট ব্যাগ'।

ডংক—→ছোবল মারার জন্যে সাপের উদ্যত ফনা।<*ডংক 'drum' >a poison doctor's wand>hood>shake-bite.
অর্থ পরিবর্তন ঘটেছে।

ডিঙ্গর—→(পেট) ফেঁপে যাওয়া, বড় হয়ে যাওয়া। <*ডিঙ্গর 'হৃষ্টপুষ্ট' বড় >ফাঁপা। অর্থ পরিবর্তন ঘটেছে।

তুট—→ধোপার কাপড় কাচার জায়গা। <তট

থিলে—→থাকলে। <স্থিত, নামধাতু নিষ্পন্ন শব্দ।

থোট—→ঠোঁট। (<*trota, 'beak') স্বতঃ নাসিক্যভবন। ওড়িয়া ভাষার

একটি বিশেষ প্রবণতা এই যে এর মধ্যে দু'টি মূর্ধন্য ধ্বনি পাশাপাশি থাকেনা, একটি দন্ত্য ধ্বনিতে পরিণত হয়।

দাড়ে—→দৃঢ়তায়। <দাঢ্যে

দাও—→ছিপ (মাছ ধরার) অর্থে ব্যবহৃত। <সং দণ্ড, অর্ধতৎসম শব্দ।

পাস্থলি—→পায়ের গয়না। <*পাসলি <*পাদসরিক, তদ্ভব শব্দ।

বলন, বল্যানি—→সুপুষ্ট গঠন। <valana, *vallanika

বলন—তৎসম শব্দ। বল্যানি—অর্ধতৎসম শব্দ।

বাঞ্ছি—→কামনা করে। তৎসম √বাঞ্ছ—

বারা—→বারিপূর্ণ ঘট। <বারক 'a kind of vessel'

ভলে—→ভালো করে। <ভাল<ভল্ল<ভদ্র, ক্রিয়া বিশেষণে—এ

ভাউজ—→ভ্রাতৃজায়া অথবা ভ্রাতুর্জায়া, তদ্ভব শব্দ।

ভাঁতি—→প্রকার। <ভ্রান্তি lit 'illusion' অর্থ পরিবর্তিত হয়ে, 'উপায়', 'প্রকার'।

ভূখিলা—→ক্ষুধার্ত। <*ভুক্ষিলক √ভুজ্—,তদ্ভব শব্দ।

ভেড়্যা—→কাপুরুষ অর্থে। <*ভেড্ডিক>ভেড়িয়া>ভেড়্যা, অপিনিহিতি

মঞ্জা—→(কলার) থোড়। <*মজ্জক (মজ্জা), পূর্ববর্তী ম—এর প্রভাবে জ্জ>ঞ্জ, তদ্ভব শব্দ।

মলি—→ময়লা। <*মলিক<মল

মান—→(দ্রব্যমান)—সকল। বহুবচনবোধক প্রত্যয়, <মান, তৎসম, a quantity, mass, all

মুঁআশ—→আকর্ষণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তদ্ভব শব্দ। <মোহপাশ

মুকায়—→(দরজা) খোলে। প্রথম পুঃ বর্তমান কাল। √মুকা <*মুকাপয় —নামধাতু নিষ্পন্ন। <মুক—মুক্ত।

মেলানি—→বিদায়। তদ্ভব শব্দ<*মেলাপনিক lit. meaning 'meeting' Euphemistic.

যুড়া—→কেশগুচ্ছ। <জুট Cf. জটাজুট

রসনা—নূপুর, <তৎসম রশনা, 'girdle of woman' Cf Beng রসন 'a waist band with tiny bells.'

লদিয়া—চাপিয়ে। অসমাপিকা ক্রিয়া। <লর্দয়তি। তু হিন্দী-লাদনা

লাঞ্জ, লাঙ্গুড়, লেঙ্গুড়—লেজ। লাঙ্গুড়, লেঙ্গুড় <তৎসম, লাঙ্গুল, লাঞ্জ, লেঞ্জ লেজ—পারসিক linj, lanj, 'hanging'

হট—জিদ। অর্ধতৎসম। <তৎসম হঠ-

হাবাই—হাউই।<আরবীয় hawa—

সম্ভারে, সম্ভালে—সামলে নেয়। (১) অর্ধতৎসম,<সম্ভার 'arrangement' নামধাতু নিষ্পন্ন। (২) তদ্ভব,<সংবারয়তি

সাখা—বন্ধু, সহায়ক। অর্ধতসম, <সখা

সান—ছোট। তদ্ভব, <সন্নক 'dwarfish'

সিজায়—সেদ্ধ করে। তদ্ভব শব্দ।<√সিধ্য-

কাব্যটির মধ্যে যে আপাত—অপরিচিত শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, ভাষাতাত্বিক ব্যাখ্যা অনুসরণ করলে সেগুলির অর্থবোধ সহজতর হবে। অবশ্য এই শব্দগুলির অর্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাদটীকায় উল্লিখিত হয়েছে। তবু শব্দগুলির ব্যুৎপত্তিবোধে সহায়তার জন্যে যে যে অর্থে এগুলি কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে, তাও লিপিবদ্ধ হোল।

উপসংহার

ওড়িয়া যাঁদের মাতৃভাষা, উড়িষ্যা যাঁদের মাতৃভূমি এমন কয়েকজনের সাহিত্যিক অবদান বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বীকৃত। 'দিনমণি চন্দ্রোদয়' রচয়িতা মনোহর দাস এবং 'জগৎমঙ্গল' (নামান্তর জগন্নাথমঙ্গল) রচয়িতা গদাধর দাস তাঁদের অন্যতম। সনাতন বিদ্যাবাগীশ ভাগবতের অনুবাদকরূপে সুপরিচিত। তিনি কিছুকাল কটকে বসবাস করেছিলেন বলে অনুমিত হয়। তিনি বাংলা এবং ওড়িয়া দুটি ভাষায় সমান দক্ষ ছিলেন। তাঁর ভাষাবদ্ধ ভাগবতের মধ্যে একই সঙ্গে ওড়িয়া এবং বাংলা ভাষার ব্যবহার এই দু'টি সহোদর ভাষার ভাষাতাত্বিক সামীপ্য প্রমান করে।

পূর্বভারতীয় রাজ্য চতুষ্টয়—বাংলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা ইংরেজ শাসনকালেও একত্রিত ছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা প্রেসিডেন্সীকে প্রথমে ভাগ করা হয়, পরে ১৯১২ এবং ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বিভাগের পর বাংলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা পৃথক পৃথক রাজ্যে পরিণত হয়। এর আগে শিক্ষা, দীক্ষা, ধর্ম, সাহিত্য শিল্পকলা প্রভৃতির মধ্যে এই চারটি প্রদেশের ঐতিহ্য মূলতঃ পরম রমনীয় একই

ঐক্যসূত্রে বিধৃত ছিল। ভারতীয় সাধনার এই পূর্বাঞ্চলীয় প্রকাশকে আজ আমরা নতুন করে উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হয়েছি।

সাহিত্যের মধ্যে সমন্বয়ের এই স্বরূপটি সুস্পষ্ট। চর্যাপদগুলি এর সর্বস্বীকৃত দলিল। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের বাংলাদেশ যখন নবাগত তুর্কীদের সঙ্গে আত্মরক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত, তখন বিহার-উড়িষ্যা-আসামে শিল্প সাহিত্যের চর্চা চলেছে অব্যাহতভাবে। ধীরে ধীরে বাংলার সমাজ জীবনে এসেছে স্থিতিশীলতা আর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পূর্বাঞ্চলে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্র ব্যাপকতা আর গভীরতা অর্জন করেছে।

আবির্ভূত হলেন শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁকে কেন্দ্র করে যে ভাবতরঙ্গ উদ্বেলিত হয়ে উঠল, তাতে এবার রাঢ়-বঙ্গ এবং উড়িষ্যা প্লাবিত হয়ে গেল। প্রেমধর্মকে অবলম্বন করে যে মহৎ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হোল, তাতে এই দু'টি প্রতিবেশী রাজ্যের সম্পর্ক সম্পূর্ণ নতুন ভিত্তিভূমির ওপর রচিত হোল। ষোড়শ শতাব্দী থেকে সেই নবীন সম্পর্কের সূত্রপাত, সপ্তদশ আর অষ্টাদশ শতাব্দীতে তার দৃঢ়বদ্ধরূপ পরিস্ফুট। সমাজ জীবনে সুশৃংখলতা এবং সুরুচিপূর্ণ মানসিকতার প্রতিষ্ঠা ঘটেছে সপ্তদশ শতক থেকেই। একদিকে সহজিয়া তান্ত্রিক, বীরাচারী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় সমূহের বিদ্রোহাত্মক ক্রিয়াকলাপের প্রভাববিলুপ্তির সূত্রপাত ঘটল এই সময়, অন্যদিকে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমধর্ম তাঁরই পরিকরগোষ্ঠীর দ্বারা প্রচারিত হয়ে এক অপূর্ব সুষমামণ্ডিত জীবনাদর্শরূপে বাংলা ও উড়িষ্যার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গৃহীত হোল। প্রকৃতপক্ষে প্রাক্ আধুনিক পর্যায়ে ঐ সময়টিই বৃহত্তর বঙ্গের স্বর্ণ যুগ।

এই 'বৃহত্তর বঙ্গ' অভিধাটি একান্তই সংস্কৃতি নির্ভর। যে মানসিক নৈকট্য বাংলা—বিহার—আসাম আর উড়িষ্যাকে শিল্প-সাহিত্য-গত সাযুজ্য এনে দিয়েছিল, তারই ভিত্তিতে কল্পিত হয়েছে বৃহত্তর বাংলার রূপ। প্রধানতঃ বৈষ্ণব পদাবলী, মনসার ভাসান, চৈতন্য ও চৈতন্যপরিকর জীবনী প্রভৃতি ধর্মাশ্রিত গোষ্ঠী-সাহিত্যেই শোনা যায় বৃহত্তর বঙ্গসংস্কৃতির হৃদ্স্পন্দন। কখনো রাধাকৃষ্ণ, কখনো পৌরাণিক দেবদেবী আবার কখনো নবদ্বীপচন্দ্রকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়েছে এই সুবৃহৎ অঞ্চলবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা আর আনন্দবেদনা।

দ্বারিকা দাস বৃহত্তর বঙ্গের ঐক্যধর্মী ভাবসমন্বয়ের অগ্রদূত। ভাষাশ্রয়ী সাহিত্য যে কোন একটি ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ জনসমাজের একান্ত আপন অধিকারভুক্ত নয়, সাহিত্য যে বৃহৎ মানবসম্প্রদায়ের চিৎপ্রকর্ষের ফল

এবং ভাষার সঙ্গে সুপরিচিত যে কোন প্রতিভাধর ব্যক্তির অবদানে সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে, তার উদাহরণ শুধু ভারতবর্ষেই নয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সুপ্রচুর।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে উড়িষ্যার প্রখ্যাত কবি অনন্ত দাস আর জগন্নাথ দাস থেকে শুরু করে উনিশ শতকের দ্বিজ গৌরচরণ, কবিচন্দ্র জগন্নাথ, নারায়ণ মর্দরাজ প্রভৃতি ওড়িয়া কবিরা বাংলা ভাষায় প্রচুর কাব্য রচনা করেছেন। কাব্যের সংখ্যা বিচারে কবি কর্ণের সঙ্গে অবশ্য অন্য কোন কবি তুলনীয় নন। সপ্তদশ শতকের কবি দ্বারিকা দাস বিষয় নির্বাচনে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বাংলা কাব্যের স্রোতোধারায় নতুন কোন শাখা সংযুক্ত করেননি ঠিকই কিন্তু সমকালীন ওড়িয়া কবিদের অনুসৃত বিষয়বস্তুগুলির সাহায্যে বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা না করে, সম্পূর্ণ পৃথক পথ অনুসরণ করেছেন। তিনি প্রতিবেশী রাজ্যের শুধু ভাষাই নয়, জনপ্রিয় একটি কাব্যধারার সঙ্গে আপন চিন্তাবৈশিষ্ট্যটিকে মিলিয়ে দিয়েছেন। ওড়িয়া কাব্য জগতের এই অন্যতম দিক্‌পাল বাংলায় মনসামঙ্গল রচনা করে বাঙালী মঙ্গলকাব্য রচয়িতাদের অন্যতম হয়ে রইলেন। সাহিত্য যে দেশ, কাল আর পাত্রের অতীত হতে পারে, তা যে মানব সম্প্রদায়ের শাশ্বতকালের সম্পদ হতে পারে, তার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন দ্বারিকা দাসের মনসামঙ্গল। সমপ্রাণতা এবং উদার ভাবসংহতির ক্ষেত্রে এঁর অবদান তাই সশ্রদ্ধ উল্লেখের দাবী রাখে।

মঙ্গলকাব্যের কথাবস্তু পূর্বভারতীয় সম্পদ। কাব্যে, নাটকে, কথা-সাহিত্যে এ কাহিনী আজও সমান জনপ্রিয়। চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ—এই দীর্ঘ অর্ধ সহস্র বৎসর কালের মধ্যে বহু শক্তিমান কবির লেখনীস্পর্শে এই কাব্যধারায় অপরিমিত লাবণ্য সংযোজিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, মঙ্গলকাব্য জাতীয় সাহিত্য হিসেবেও বাঙালীর গর্বের বস্তু।

মঙ্গলকাব্যগুলির প্রসঙ্গ এবং প্রযুক্তির বিশদ আলোচনা করার পর এগুলিকে মহাকাব্যের শ্রেণীভুক্ত করা সম্ভব নয়। মনসামঙ্গল সম্পর্কেও সেই একই মন্তব্য প্রযোজ্য। চাঁদ ও বেহুলার চরিত্র যথেষ্ট আকর্ষণীয়। কোন কোন কবির মূল কাব্যের সঙ্গে অন্যান্য বহু পালা যুক্ত হয়ে ওঁদের মনসামঙ্গলকে মহাকাব্যোচিত বিস্তৃতি দিয়েছে, এ কথাও স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এর মধ্যে মহাকাব্যের অখণ্ড ঐক্য বা গগনস্পর্শী মহিমময়তা নেই। তা ছাড়া মহাকাব্যের প্রযুক্তিগত বৈচিত্র্যও নেই মনসামঙ্গলের মধ্যে। ঐতিহ্যাশ্রিত কাহিনীর গ্রন্থনই মহাকাব্য—

এমন কি 'এপিক্ অব গ্রোথ.' এরও তা কিন্তু লক্ষণ নয়। জাতীয় জীবনের কাহিনীকে অবলম্বন করে শৃঙ্গার, বীর ও শান্ত—মূলতঃ এই তিনটি রসাশ্রিত গাম্ভীর্যব্যঞ্জক একান্তভাবে বস্তুনিষ্ঠ কাব্যই মহাকাব্যরূপে স্বীকৃতিলাভের যোগ্য। সর্গবিভক্তি, ওজস্বিনী ভাষা, বিচিত্র ছন্দ, মনোহর অলংকরণ সবকিছু একত্রিত হয়ে মহাকাব্যকে এমন এক বিরাটত্ব দান করে, যার ব্যঞ্জনায় সহানুভূতিশীল পাঠকের চিত্তবিস্ফার ঘটে এবং অনুভূতি বিশালতাধর্মী হয়ে ওঠে।

এই সব গুণাবলী যে মনমামঙ্গলের মধ্যে নেই, তা বলাই বাহুল্য। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য অত্যন্ত নিপুনভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, মনসামঙ্গল কাব্যে ব্যালাড্ বা গীতিকবিতার সমস্ত লক্ষণই দেখা যায়, নেই শুধু তার গতিশীলতাটি। তিনি তাই এগুলিকে এপিক্ অব গ্রোথ্ বলে চিহ্নিত করেছেন।

মঙ্গলকাব্যগুলির শ্লথগতির কারণ একাধিক। প্রথমতঃ মূল কাহিনীর সঙ্গে স্বল্প-প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক বহু উপকাহিনীর সংযোজনে এবং দ্বিতীয়তঃ বিষয়বস্তুর অতিরঞ্জনে ও বাগ্‌বাহুল্যে এগুলি ভারাক্রান্ত। ফলে ডঃ ভট্টাচার্যের মত অস্বীকার করার পথ থাকেনা।

আলোচ্য কাব্যটি সম্পর্কে কিন্তু এ কথা অসঙ্কোচেই বলা যায় যে, উপকাহিনীর ভারলেশহীন বেহুল'-লখিন্দর উপখ্যানটি এখানে অত্যন্ত দ্রুতগতিময়।

চাঁদ সদাগরের নৌকাডুবি থেকে শুরু করে বেহুলা লখিন্দরের স্বর্গ প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত কাহিনীর কোথাও প্রায় কোন বিরাম নেই। বর্ণনা শুধু একটি ক্ষেত্রেই বাহুল্যধর্মী—সেটি হোল লখিন্দরের বিবাহযাত্রা। কিন্তু সে ক্ষেত্রে বর্ণনাটি এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ যে কোনক্রমেই তাকে ক্লান্তিকর বা গতিহীন বলা সম্ভব নয়।

প্রয়োজন আর অপ্রয়োজনের বিচার দ্বারিকা দাস অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবেই করেছেন। তাঁর মাত্রাজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনায় এ বিষয়ে আলোকপাত করা গিয়েছে। দ্বারিকা দাস মূলতঃ বাহুল্যবর্জন নীতি গ্রহণ করেছিলেন, ফলে তাঁর কাব্য অবাধগতিতে পূর্বনির্দিষ্ট পরিণতি লাভ করেছে। অতএব ডঃ ভট্টাচার্যের বিশ্লেষণ অনুসারেই দ্বারিকা দাসের মনসামঙ্গলখানি ব্যালাড্ বা গীতিকা হিসেবে স্বীকৃতি লাভের যোগ্য।

মনসামঙ্গলের চরিত্রগুলির মধ্যে আধুনিক কালের উপন্যাসগুলির চরিত্র নির্মানের ইঙ্গিত ছিল, এ আলোচনা করা হয়েছে। তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং আত্মবিশ্বাসনিষ্ঠ চরিত্র চাঁদ এবং বেহুলা এ বিষয়ে পরবর্তী কালের উপন্যাসের

চরিত্র হয়ে ওঠবার দিক থেকে যে সার্থক আদর্শ, এতে বাংলা সাহিত্যের সমালোচকেরা এক মত। একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে মনসামঙ্গলে নাটকের লক্ষণও দেখা যাবে। আলোচ্য কাব্যটি পঞ্চাশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এটিকে পঞ্চাঙ্ক নাটকের কাটামোর মধ্যে অনায়াসেই ফেলা যায়।

চাঁদ সদাগরের নৌকোডুবি এবং চাঁদের লাঞ্ছনার যে বর্ণনা প্রথম ছ'টি অধ্যায়ে আছে, এই অংশটিকে 'প্রারম্ভ' বা প্রথম অঙ্করূপে চিহ্নিত করা যায়। এই অংশ থেকে কাহিনীর ভবিষ্যত গতি—প্রকৃতি অনায়াসেই অনুমিত হয়। এর পরের তিরিশটি অধ্যায়ে বেহুলা ও লখিন্দরের জন্ম, বিবাহ, লৌহবাসরে লখিন্দরের মৃত্যু এবং কলার মান্দাসে বেহুলার যাত্রা বর্ণিত হয়েছে। একে দ্বিতীয় অঙ্ক বা 'প্রবাহ' বলে চিহ্নিত করা যায়। 'উৎকর্ষ' বা তৃতীয় অঙ্ক হোল পরবর্তী চারটি অধ্যায়। এখানে বেহুলার স্বর্গে উপস্থিতি, নৃত্যে দেবতাদের প্রীতি উৎপাদন এবং মনসার সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। চতুর্থ অঙ্কের 'গ্রন্থিমোচন' অংশ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে পরবর্তী আটটি অধ্যায়। এতে আছে স্বামী, ভাসুর এবং শ্বশুরের সাতটি বাণিজ্যতরী নিয়ে বেহুলার প্রত্যাবর্তন। সব শেষের দুটি অধ্যায়ে চাঁদের মনসাপূজা, বেহুলা লখিন্দরের স্বর্গ প্রত্যাবর্তন বর্ণিত হয়েছে। অতএব এটিকে 'উপসংহার' অঙ্ক বলা যায়। এই আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয় হোল, কাব্যটির মধ্যে পঞ্চাঙ্ক নাটকের বীজও নিহিত আছে এবং এই শ্রব্য কাব্যটিকে অনায়াসেই দৃশ্য কাব্যে রূপান্তরিত করা সম্ভব। ফলতঃ এই কাহিনী অবলম্বন করে বহু নাটক রচিত হয়েছে পরবর্তী কালে।

আমরা এখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, গীতোদ্দেশ্যে রচিত সমাজনির্ভর, তন্ময়তামুখ্য, আখ্যানমূলক আলোচ্য কাব্যটি সর্বতোভাবেই ব্যালাড, বা গীতিকা। এর মধ্যে সংলাপ, নাট্যধর্মিতা, বলিষ্ঠ চরিত্রচিত্রন এবং দু'একটি উপকাহিনীর সমাবেশ ঘটেছে, ফলে সূক্ষ্ম বিচারে মনসামঙ্গলগুলির মধ্যে ভাবী-কালের সাহিত্যের সব ক'টি শাখার বীজই নিহিত ছিল বলা যায়।

আতিশয্য বর্জন ও সুষমাময় পরিমিতিবোধ দ্বারিকা দাসের বৈশিষ্ট্য। তাঁর কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয় সতীত্ব এবং পাতিব্রত্যের ঐহিক ও পারত্রিক মূল্য। বেহুলা চরিত্রটিকে অবলম্বন করেই কবি তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আধুনিক যুগের মানবতাবাদ দেববাদের প্রতিস্পর্ধী। মনসামঙ্গলের মধ্যে চাঁদের চরিত্র সেই অদম্য পৌরুষ আর দুর্বার পুরুষকারের প্রতীক। তিনি

শৈব অর্থাৎ দেবদ্বেষী নন। কিন্তু কর্মবিমুখ দৈবনির্ভরতা তাঁর মধ্যে নেই। বেহুলা চরিত্রের অনমনীয় ব্যক্তিত্ব অথচ বিনয়মণ্ডিত ব্যবহার আকর্ষণীয়। আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে ক্ষুরধার পথ উত্তীর্ণ হওয়ার সাধনায় তিনি সফলকাম। আপন সতীত্বের এবং সততার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তিনি মনসার সঙ্গেও দ্বন্দ্বে অবতীর্ণা। অতএব নিঃসংশয়ে বলা যায়, বিবর্তনের ধারাপথ অতিক্রম করে বেহুলা—চাঁদ সদাগরই আধুনিক যুগের সাহিত্যে তীব্র ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নরনারী সৃজনে প্রেরণা দান করেছেন।

ভারতীয় ঐতিহ্য ধারায় কতকগুলি পৌরাণিক এবং মধ্যযুগীয় কাব্যচরিত্র অমর হয়ে আছে। এগুলি এক একটি আদর্শের প্রতীক। এই সব আদর্শের এক বা একাধিক দিক নিয়ে চিন্তা করতে গেলেই অঙ্গীকৃত ঐতিহ্য নির্ভর স্মৃতিমঞ্জুষা উন্মোচিত হয়। আদর্শান্বিত চরিত্রগুলি চেতন মনের পর্দায় জীবন্ত রূপ নিয়ে দেখা দেয়। রাধাকৃষ্ণের প্রেম, রামচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা, ভরত আর লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতা, দুর্যোধনের তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ, সীতা-সাবিত্রীর পাতিব্রত্য প্রভৃতির সমান্তরাল আদর্শ চরিত্র বেহুলা। যে সব কাব্য-সাহিত্যকে আমরা সাম্প্রতিক কালে অতিবাস্তব সৃষ্টি বলে চিহ্নিত করে থাকি, তার মধ্যে ও রূপকের আধারে এই সব চরিত্র বিশিষ্ট ভাবদ্যোতনা সৃজন করে। স্রষ্টা যে যুগেরই মানুষ হোন না কেন, জাতীয় ঐতিহ্যকে স্বাঙ্গীকরণের মধ্যেই নিহিত থাকে তাঁর সাফল্যের গুপ্ত ইঙ্গিত। এই ঐতিহ্য ধারার মধ্যেই জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে স্রষ্টার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে।

মনসামঙ্গল কাব্যধারার মধ্যে যেমন রামায়ন-মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র-তাদের অতিপরিচিত ভাবমূর্তি নিয়ে উপস্থিত থেকে এই ধারার কাব্যগুলিকে মর্যাদাসম্পন্ন করেছে, তেমনি আধুনিক কালের নবীন সাহিত্যকেও এরা সমাদৃত স্তরে উন্নীত করতে পেরেছে। চাঁদের অনমনীয় ব্যক্তিত্বের বা বেহুলার অতুলনীয় পাতিব্রত্যের উল্লেখে নবীন সাহিত্য যে জাতীয় ঐতিহ্যকে স্বীকার করে নিয়েছে, তারই প্রমান দেয়। এর মধ্যে অভিনবত্ব নেই।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলকাব্যের মধ্যে বাঙালীর রুচিবিকৃতির পরিচয় পেয়েছেন। তাঁর মতে, এগুলির মধ্যে এক শ্রেণীর ইতর অমার্জিত 'হাস্যরস' এবং বাস্তব জীবনের অপূর্ণতা ও অসঙ্গতি—জাত স্থুল কৌতুকপ্রিয়তা দেখা যায়।

দ্বারিকা দাসের মনসামঙ্গলখানি ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লিখিত স্থুলতা বা গ্রাম্যতাদোষ থেকে সম্পূর্ণভাবেই মুক্ত। বরং একথাই বলা যায়, এ কাব্যটি

সম্পর্কে কবি অতিমাত্রায় সংযত ও শালীন। দ্বারিকা দাসের ব্যক্তিজীবনের পরিচয় মনে রাখলে এই শালীনতা এবং পরিমিতিবোধের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই কবির জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ আর্তবল্লভ মহান্তী বলেছেন যে, 'তিনি যোগ-তন্ত্র-যন্ত্র ও মন্ত্রের সাধক ছিলেন'। যে কবি ভাগবত, পুরাণ, ঈশ্বরতত্ত্ব এবং গীতার ব্যাখ্যাতা, যিনি রামায়ণের অনুবাদক তাঁর রুচি ও নৈতিক আদর্শ যে উচ্চকোটির, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। অন্যান্য মনসা-মঙ্গল পাঠের পর দ্বারিকা দাসের কাব্যখানি পাঠ করলেই এর মধ্যে যে একটি মার্জিত ও সুষমামণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় ওতপ্রোত হয়ে আছে তা সহজেই চোখে পড়ে।

একাধিক ভক্তিমূলক সাহিত্যের রচয়িতা এই কবির মনসামঙ্গলে অতিপরিচিত কাহিনীর অন্তরালে একটি গূঢ় জ্ঞানমার্গীয় ইঙ্গিত অনুভূত হয়। বেহুলার চরিত্র আলোচনা করতে গিয়ে সেই চরিত্রটিতে গীতার আদর্শ কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে তার উল্লেখ করা হয়েছে।

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করায় আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক ক্লেশভোগের শেষে মানবাত্মা স্বল্পকালীন জীবৎকালের মধ্যে ভক্তি ও কর্মসাধনার সাহায্যে কী ভাবে মুক্তিলাভ করতে পারে, বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনীটি মূলতঃ সেই তত্ত্বেরই ইঙ্গিত বহন করছে। সাধনার ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বেহুলার অনাসক্তি উপর্যুক্ত ইঙ্গিতকেই সমর্থন করে।

সঙ্গীত শাস্ত্রের মধ্যে প্রতিটি রাগ-রাগিনীর নিজস্ব ঠাট বা সুনির্দিষ্ট রূপ বিশদভাবেই বর্ণিত আছে। তারই পরিসীমার মধ্যে সেগুলির প্রত্যেকটি স্ব-তন্ত্র এবং স্বরাট। তবুও এই সব রাগ রাগিনী নিয়ে গড়ে ওঠে ঘরাণা বা গোষ্ঠীগত ঐতিহ্য। এতে তখন সংযুক্ত হয় গায়কী বা গায়কের ব্যক্তি-চিহ্নিত বৈশিষ্ট্য। তাল, লয়, মীড়, গমকের বৈশিষ্ট্য এই সব ঘরণাকে সৃজনধর্মী কলাকৃতির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। গায়কী স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি পায়।

মনসামঙ্গল কাহিনীর একটি পূর্বনির্দিষ্ট কাঠামো আছে। মধ্য যুগে বঙ্গদেশ, বিহার এবং আসামে এই কাঠামোর মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন কাব্য গড়ে উঠেছিল। সমগ্র বঙ্গদেশ নিয়ে বিচার করলেও দেখা যায় যে পূর্ববঙ্গ এবং রাঢ়ের ঘরাণা ছিল পৃথক। একটি ছোট উদাহরণ নিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে। চাঁদ বাণিজ্যতরী নিয়ে যাত্রা করেছিলেন, এর উল্লেখ মূল কাহিনীর মধ্যেই আছে।

পূর্ববঙ্গের কাব্যে তরীগুলির সংখ্যা চৌদ্দ আর রাঢ়ের কাব্যে সাত। দ্বারিকা দাস রাঢ়ের অনুগামী তাই তাঁর কাব্যে তরীগুলির সংখ্যা সাত।

ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর দীর্ঘ চারশ' বছর উড়িষ্যার কবিকুল তাঁদের আপন মাতৃভাষায় কাব্যরচনার অবসরে বাংলা ভাষায়ও যে বহু কাব্য রচনা করেছেন, এর প্রমান আজ আমাদের হস্তগত। এই সব রচনা প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ এবং পৌরাণিক দেবদেবী নিয়ে গড়ে উঠেছে। দ্বারিকা দাসের সমকালীন কবি লোকনাথ যখন রচনা করছেন 'শারদ রাস,' জগন্নাথ মিশ্র 'নারদ গীতা', মাধব দাস 'কৃষ্ণ লীলা', মাধব রথ, চৈতন্য বিলাস' আর কবি কর্ণ ব্যস্ত আছেন অজস্র 'পালা' রচনায়, ঠিক তখনই কবি দ্বারিকা দাস 'ব্রহ্মমুদ্গার', ব্রহ্মজ্ঞানপটলমালিকা', 'তত্ত্বচূড়ামণি'; 'গীতাতত্ত্ব ভাগবত' শিবপুরাণ' প্রভৃতি ধর্মাশ্রিত কাব্য রচনার ক্ষেত্র থেকে সরে এসে রচনা করেছেন 'মনসামঙ্গল'। 'মঙ্গল' অভিধা যুক্ত বহু কাব্য ওড়িয়া ভাষায় রচিত হয়েছে কিন্তু সেগুলি বাংলা মঙ্গলকাব্যের সমান্তরাল নয়। দ্বারিকাদাস সে ধরণের কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হননি, হয়েছেন বাংলায় প্রকৃত মঙ্গলকাব্য রচনায়। এর একটিই ব্যাখ্যা সম্ভব এবং সেকথা উল্লিখিতও হয়েছে। কবি মেদিনীপুরে সাময়িকভাবে বসবাস শুরু না করলে তাঁর লেখনীপ্রসূত মনসামঙ্গল যে আমাদের হস্তগত হোত না, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

রাঢ়ের মনসামঙ্গলে সাতটি বানিজ্যতরীর উল্লেখটিকে বহু সমালোচক চণ্ডীমঙ্গলের প্রভাব বলেই নির্দেশ করেছেন। এ অভিমত অন্ততঃ দ্বারিকা দাসের ক্ষেত্রে স্বীকার করতেই হয় ছায়া নীলাম্বরের দিকে তাকিয়ে। এঁর কাব্যে অন্য কোন মঙ্গলকাব্য রচয়িতার প্রভাব সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও, চণ্ডীমঙ্গলের প্রভাব নিয়ে ভিন্নমত পোষণের সুযোগ নেই। কিন্তু যেটি বিশেষভাবেই লক্ষণীয় তা হোল এই যে, অন্য একটি কাব্যের প্রভাব অশক্তের অন্ধ অনুকরণে পর্যবসিত হয়নি। দ্বারিকা দাসের স্বকীয়তা কাব্যের প্রসঙ্গ এবং প্রযুক্তির স্তরে স্তরে সুস্পষ্ট রূপেই প্রকাশিত। তিনি আপন কল্পনার মাধুরী মিশিয়ে, রুচি ও শালীনতাবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে এবং সর্বোপরি বিস্ময়কর যুক্তিবাদ এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে তাঁর কাব্যখানি রচনা করেছেন। এটি স্বল্পায়তন হলেও ভাবে-ভাষায়, শালীনতা-আধুনিকতায় একটি নতুন সৃষ্টি। মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের, সমকালীন

সমাজতত্ত্ব এবং চিরকালীন সৃষ্টিতত্ত্বের এমন অপূর্ব সমন্বয় মধ্যযুগীয় কাব্যে কদাচিৎ চোখে পড়ে।

রীতিসিদ্ধ মনসামঙ্গল কাব্যধারার বহু অংশই যে দ্বারিকা দাসের কাব্যে নেই এর উল্লেখ একাধিকবার করা হয়েছে। সাধ ভক্ষণের জন্য দীর্ঘ খাদ্যতালিকা, টোপর তৈরি, পথে আঠারো বেকতা পড়া, পতিনিন্দা, লখিন্দরের মোহ, লৌহবাসরে পাশাখেলা—এমনি বহু অংশ আলোচ্য কাব্যে বর্জিত। অনুমান করা যায় যে, যা মহত্তর আদর্শ প্রণোদিত নয়, সমাজ সংস্থিতি এবং আদর্শ জীবন গঠনের পরিপোষক নয়, তার প্রতি এই কবির ছিল সহজাত অনীহা। সমাজমানস উৎসারিত কাহিনীকে সাধকসম্মিত মানসের আনুকূল্য দিয়ে দ্বারিকা দাস তাঁর কাব্যটিকে একটি বিশেষ শ্রেণীতেই পরিণত করেছেন। একে তাই বাংলা সাহিত্যের মনসামঙ্গল কাব্য-শাখায় একটি মূল্যবান সংযোজন বলেই গ্রহন করা বিধেয়।

উৎকল—বঙ্গ সংস্কৃতি সমন্বয়ের অগ্রদূত দ্বারিকা দাস, এই ঘোষণার মধ্যে অতিরঞ্জন নেই। বাংলা কাব্যধারায় ওড়িয়া শব্দের সাবলীল সংযোজনে এবং মনসামঙ্গলের পটভূমিতে সীমান্তবঙ্গের সমাজচিত্র অঙ্কনে দ্বারিকা দাসের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

সাহিত্যে সমাজচিত্রের প্রতিফলন বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে সহজেই ধরা পড়ে। দ্বারিকা দাস যে সমাজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে সে যুগে দক্ষিণ-মেদিনীপুরের সামাজিক রীতিনীতির কোন পার্থক্য প্রায় ছিলই না বলা যায়। রাঢ়ের প্রখ্যাত মনসামঙ্গল কেতকাদাসের কাব্যে যে সমাজচিত্র তার সঙ্গে দ্বারিকা দাস অঙ্কিত সমাজচিত্রের পার্থক্য অনেকখানি। পরিবারে শিশু জন্মের পর এবং বিবাহের সময় পালনীয় বিধি-বিধানের দিকে নজর দিলেই এ পার্থক্য সহজে বোঝা যাবে। এই কাব্য যখন তমগড়-নন্দীগ্রাম অঞ্চলে গীত হয়েছিল তখন সেখানকার শ্রোতৃবৃন্দ কাব্যবর্ণিত সমাজচিত্রের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন অসঙ্গতি খুঁজে পাননি। তা থেকে থাকলে তখনই তা অবশ্যই সংশোধিত হয়েছে। কাব্যখানি যে জনপ্রিয় হয়েছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমান এই যে, এটির একাধিক অনুলিপি প্রস্তুত হয়েছিল। এ পর্যন্ত সংগৃহীত প্রাচীন পুথির বৃহৎ অংশ হোল রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির অনুলিপি। চৈতন্য চরিতামৃতের অনুলিপি-সংখ্যা কল্পনাতীত। যাইহোক, সীমান্তবাংলার সার্থক সমাজ

অংকনের কৃতিত্বও যে দ্বারিকা দাস অর্জন করেছিলেন তা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নেওয়া যায়। একাধিক অনুলিপিই এর প্রমান।

ভাষা ও সাহিত্য যে ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বসবাসকারী নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের পুরুষানুক্রমে অর্জিত এবং, উপভোগ্য সম্পদ নয়, এখানে শ্রদ্ধা এবং প্রতিভাবন ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ উন্নতশীর্ষে প্রবেশ করে ন্যায়সঙ্গত প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেন, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দ্বারিকা দাস। কাব্যের প্রসন্নতায় কবির মার্জিত ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত। সংযত হাস্য, বুদ্ধিদীপ্ত চিত্রাংকন এবং ভাবানুভূতির প্রগাঢ়তা ও দ্বারিকা দাসের কাব্যখানিকে একটি বিশেষ শ্রেণীতে উন্নীত করেছে।

মনসামঙ্গল কাব্য-শাখার আদি কবি কানা হরিদত্ত। হরিদত্ত এবং তাঁর উত্তরসূরীদের অনুসৃত পথে যে ভিন্ন ভাষাভাষী সাধক কবি দ্বারিকা দাস যাত্রা করেছিলেন এবং মূল্যবান একখানি কাব্য রচনা করেছিলেন এই নতুন আবিষ্কার নিঃসংশয়ে এই সাহিত্যশাখায় একটি উপাদেয় সংযোজন বলেই পরিগণিত হবে। বিজয়গুপ্তের সূক্ষ্ম রসবোধ, নারায়ণ দেবের পাণ্ডিত্য এবং কবিত্বের সমন্বয়, বংশীদাসের রূপকধর্মিতা এবং কেতকাদাসের বিস্তৃতি ও মাধুর্য— সব কিছুর সার্থক উত্তরাধিকার দ্বারিকা দাসের কাব্যখানিকে অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত করে তুলেছে।

এই কাব্যটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শুধু যে আপন রসোত্তীর্ণতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হবে তাই নয়, বিস্মৃতপ্রায় মধ্যযুগে উৎকল—বঙ্গ ভাবসংহতির যে একটি উজ্জ্বল অধ্যায় এককালে বর্তমান ছিল, তারই প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিশিষ্ট স্থান লাভ করবে।

উড়িষ্যা রাজ্য প্রদর্শশালার পুথিবিভাগের সংগ্রহভাণ্ডার থেকে ওড়িয়া কবিদের রচিত যে মৌলিক বাংলা কাব্যগুলি আবিষ্কার করা গিয়েছে, সেগুলির মধ্যমণি যে দ্বারিকা দাসের মনসামঙ্গল তাতে সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে সেই কারণেই সম্পাদনার জন্যে মনোনীত কাব্য তালিকায় তাঁর নাম শীর্ষদেশে। এই সাধক কবির কাব্যখানির সম্পাদনা, আমার সমগ্র পরিকল্পনার সূচনা মাত্র।

উড়িষ্যা রাজ্য সরকারের কাছে এবং প্রদর্শশালার কর্তৃপক্ষের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তাঁদের অনুমতি এবং সহায়তা না পেলে এই পুথিগুলি সুধীসমাজের অগোচরেই থেকে যেত। পুথিগুলির লিপ্যন্তরিত অনুলিপি প্রস্তুত

যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ বলে, এক সময় চরম হতাশায় সমগ্র পরিকল্পনাটি পরিত্যাগ করার কথাই ভেবেছিলাম। সেই সময় আমার প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের সাধ্যমত সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসায় শুধু যে কাজটি পরিত্যক্ত হয়নি তা নয়, আমার মধ্যে যে নতুন শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল সেই শক্তিই আমার পাথেয় হয়ে থাকবে। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের দু'একজন সাহিত্য প্রেমিকও আমায় সাহায্য করেছেন। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এরপর অনুলিপি প্রস্তুতের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা-গবেষণা ও শিক্ষণ পর্যদ (এন. সি. ই. আর. টি) আমাকে চিন্তামুক্ত করেন এবং আমার সমগ্র পরিকল্পনা রূপায়ণের পথ সুগম করে দেন। এর জন্যে আমাদের অধিকর্তা ডঃ শিবকুমার মিত্র এবং আমার মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ গোষ্ঠবিহারী কানুনগোর কাছে আমি আন্তরিকভাবেই কৃতজ্ঞ। জাতীয় পরিষদের সহায়তা পাওয়ার পর আশা করতে পারছি যে, কিছু পুথির সম্পাদনা সম্ভবপর হবে এবং সমগ্র বিষয়টি বিদগ্ধসমাজের গোচরীভূত করবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

আমার কর্মস্থল ভুবনেশ্বরে এই শ্রেণীর কাজে হাত দেওয়ার পক্ষে প্রধান বাধা, সহায়ক পুস্তকাবলীর অভাব। এর ফলে সম্পাদনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ত্রুটি বিচ্যুতি অবশ্যই থেকে গেল। ভবিষ্যতে এগুলির সংশোধন করার বাসনা রইল। এখান থেকে অবসর গ্রহনের পর সে সুযোগ পাবো বলেই আমার বিশ্বাস।

দ্বারিকা দাসের এই পুথিটির ভূমিকা লিখতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি শ্রদ্ধেয় ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞ। এর ফলে আমার সমগ্র পরিকল্পনার প্রথম প্রচেষ্টাটি শুধু যে স্বীকৃতি পেল তাই নয়, আমার দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় তাঁর শুভেচ্ছা মূল্যবান পাথেয় হয়ে রইল। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্যের আশীর্বাদ এবং অধ্যপক মানীয় ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষের অবিরত উৎসাহ দান। পরিশিষ্টে সংযোজিত ভাসান গানটি আমাকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন অনুজপ্রতিম অধ্যাপক বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি। এ ছাড়া নানা ভাবে আমি যাঁদের কাছে ঋণী তাঁদের মধ্যে প্রধান সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপিকা কল্যাণীয়া কৃষ্ণা ভট্টাচার্য। শ্রীমান পীযুষকান্তি এবং তুষারকান্তি মহাপাত্র ভ্রাতৃদ্বয় ও আমার কন্যা শ্রীমতী অনুরাধা পুথিখানির সম্পাদনায়

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নানাভাবে সাহায্য করেছে। তাদের আন্তরিক আশীর্বাদ জানাই।

এই শ্রেণীর কাজে বহুজনের সহায়তাই যে প্রয়োজন হয়, এ কথা সবার জানা। সব শেষে, আমি যাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই পরিকল্পনার প্রধান সহায়ক। ইনি উড়িষ্যা প্রদর্শশালার পুথি বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক পণ্ডিত নীলমণি মিশ্র। এই বিদ্যোৎসাহী, নিষ্ঠাবান গবেষকের অনলস সহায়তাই আমার সমগ্র পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু। ঈশ্বরের কাছে তাঁর নীরোগ আর দীর্ঘ জীবনের জন্যে প্রার্থনা জানাই। উড়িষ্যার প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব একটি ভূমিকা লিখে দিয়ে সমগ্র পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর কাছেও আমি ঋণী। এই বর্ষীয়াণ সাহিত্য-সাধকের উৎসাহ আমার পক্ষে মহৎ প্রেরণারই উৎস। পরিশেষে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। এই গ্রন্থখানি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাঁরা আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে রইলেন। সম্পাদনার জন্যে মনোনীত পুথিগুলির প্রথমটি প্রকাশ করে এঁরা যে শুভ সূচনা করলেন তার সাহায্যে অন্যান্য পুথিগুলির প্রকাশ সহজতর হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

দ্বারিকা দাসের মনসামঙ্গল

প্রথমে দু করপুটে　　　　বিষহরী উর[১] ঘটে
কৃপা কর সাগর দুহিতা[২] ।
রাখিয়া সঙ্গীতে মন　　ডাকে তোমায় অভাজন
বর্ণিবারে তব কিছু কথা ॥
মনসা জগত মায়ে　　　নিবেদন রাখুঁ পায়ে
উর মোর আসরের মাঝে ।
কে জানে তোমার মায়া　　মনুষ্য শরীর হয়্যা
পৃথিবী ধরিলে নিজ তেজে ॥
নিবাস সর্পের পৃষ্ঠে　　　আসন সর্পের পৃষ্ঠে
সর্পের উপরে কর খেলা ।
সর্পের পাশুলি[৩] পায়ে　　সর্পের নূপুর তায়ে
দু করে সর্পের তাড়ু বালা ॥
দু হাতে সর্পের খাড়ু　　　সর্পের ধর্যাছ নাড়ু
সর্পের বসন পরিধান ।
কাকলি হৃদের মাঝে　　　সর্পরাজ তায় সাজে
সর্পরাজ গলে শোভা পান ॥
দু কর্ণে কুণ্ডল ফণি　　　সর্পের কুন্তল বেণি
সাপের বেশর[৪] নাসায় দুলে ।
সর্পের সভায় থাক　　　আতঙ্কে সভারে রাখ
দিব্য রূপ ধর এক তিলে ॥
সর্বত্র তোমার গতি　　কৃপাতে রাখ্যাছ থিতি
এক তিলে পার সংহারিতে ।
হরের নন্দিনী তুমি　　　সর্বঘটে অন্তর্যামী
তুমার গুণ কে পারে বর্ণিতে ॥

১ উর—অবতীর্ণ হও ২ পাঠান্তর—সাগরের সুতা ৩ পাশুলি—পায়ের গয়না ৪ বেশর—নাকের গয়না ।

নাম তোমার বিষহরী ডাকিলে সঙ্কটে তরি
নিবেদন রাখ একবার ।
কর[১] মোরে শুভদৃষ্টি নাশিবে[২] সকল রিষ্টি[৩]
প্রকাশিব গীতি আপনার ॥
কৃপাময় হরের নন্দিনী ।
পূজা লইতে ভূমণ্ডলে আশ্রয় কার্য্যের কালে
আগমে তোমার কথা শুনি ॥
হরবীর্য যবে টলে ফেলিল অগাধ জলে
ভাসিয়া লাগিল পদ্মবনে ।
অক্ষয় বীর্যের তেজে জন্ম হৈল সরসিজে
অবনীতে পূজা পাইল গুনে[৪] ॥
খরতর নাগমাতা বর্ণিতে সে সব কথা
বঞ্চনা বাড়য় অতিশয় ।
দ্বারিকা দাসেতে বলে রাখিবে[৫] চরণ তলে
কৃপা দৃষ্টি হইয়া সদয়[৬] ॥

জয় বিষহরী ঈশান কুমারী ।
সৃষ্টি স্থিতি সংহারিণী তুমি দয়াধারী ॥
সেবকের আশা পুরগো মনসা ।
উরগো আসরে মোর দুর্গতি বিনাশা ॥
চরণে শরণ আমি অভাজন ।
জানিয়া করিবে কৃপা যে জানে আপন ॥
সঙ্গীত তোমার ব্যাপিত সংসার ।
বর্ণিতে বাসনা কিছু হইল আমার ॥
ভাবি[৭] পদতল ভরসা কেবল ।
অধিষ্ঠাত্রী[৮] হৈয়া কহ আপনা মঙ্গল ॥

১ পাঠান্তর—দেহ ২ পা—নাশিয়া ৩ রিষ্টি—বিপদ ৪ পাঠান্তর—লইল আপনে ৫ পা—রাখিহ
৬ পা—হৈয়া কর সদয় ৭ পা—তোমা ৮ পা—উপস্থিত ।

পুরহ বাসনা মনের কামনা।
দোষ ক্ষমা কর মাগো আমি অগ্যজন[১] ॥
চান্দ সদাকর চলিতে সফর।
নীলগিরি পর হৈল আনন্দ বিস্তর ॥
আজুয়ার বায় তরণী খিআয়[২]।
সেতুবন্ধ চান্দ বাণ্যা দেখিবারে পায় ॥
রামের জাঙ্গাল[৩] এড়িয়া তৎকাল।
দক্ষিণে দেখিল সাধু লঙ্কার মহাল ॥
বাণিয়া চতুর গেলা বানপুর।
রাক্ষস পুকুর ভয় সেথানে প্রচুর ॥
তেলঙ্গার দেশ চলিল বিশেষ।
খণ্ডদ্বীপে চাঁদ বাণ্যা করিল প্রবেশ ॥
সে স্থলে বিবাদ থাকে হারমাদ[৪]।
এড়াইল সদাকর জানিয়া প্রমাদ ॥
হাতিদহে যায় শিব শিব ধ্যায়।
শঙ্খদহ কড়ি দহ এ যাবত যায় ॥
কগুড়ির দহে সাধু করে ভয়।
কালীদহে চাঁদ বাণ্যা উপনীত হয় ॥
বিষহরী মাতা জানিলেন তথা।
ডাকিয়া নেতুরে কিছু জিজ্ঞাসেন বারতা ॥
বলহ উপায় চাঁদ বাণ্যা যায়।
ডুবাইয়া ডিঙ্গা দুঃখ দিব তায় ॥
নেতু বলে মায় নিবেদি তোমায়।
হনুমানে মনে কর চাপু গিয়া নায় ॥
ডাক জলধর অষ্ট করিবর।
না মারিয়া সদাকরে প্রায় দেঅ ডর ॥
নেতুর বচনে বিষহরী ধ্যানে।
ডাক দিল হনুমানে আইস মোর স্থানে ॥

১ পাঠান্তর—অজ্ঞজন ২ খিআয়—বেয়ে চলে ৩ জাঙ্গাল—বাঁধ, সেতু ৪ হারমাদ—জলদস্যু ।

কোথা করিবর আইস[১] জলধর।
অক্কাশ[২] পবন আস গগন উপর ॥
শুনরে পবন মোর নিবেদন।
অন্যথা সর্পের মুখে হারাবে জীবন[৩]।
মনসা ক্রোধিত পবন চিন্তিত।
উড়াইয়া নিল মেঘ ঈশানের ভিত ॥
ভরিল ঈশানে কাকের প্রমাণে।
এক তিলে দশদিগ ব্যাপিল গগনে ॥
তুলে করিবরে মেঘের সঞ্চারে।
সমুদ্রের জল তুলি ফেলিল অম্বরে[৪] ॥
পুণ্য কাদম্বিনী ঝলকে দামিনী[৫]।
ঘিড়ি ঘিড়ি ডাকে মেঘ বজ্রাঘাত জানি ॥
বরষিল জল পবন চঞ্চল।
বিজলি ঝলকে ঘনে ঘনে টল টল ॥
যেন পড়ে ঢেলা বরিষয়ে শিলা।
প্রবেশিল হনুমান আসি হেন বেলা ॥
বাঙ্গাল সকল কান্দিয়া বিকল।
কালীদহে ঘোর বৃষ্টি প্রলয়ের জল ॥
পবন কুমর নৌকার উপর।
চরণে ঘুরায়্যা দিল সাত তরিবর।
নৌকা পায় পাক যেন কুম্ভারের চাক।
শিব শিব ডাকে চান্দ এইবার[৬] রাখ ॥
অক্কাশ পবনে বহে ক্রোধ মনে।
* * * * * যে যাহার সেনে ॥
নৌকা টল টল ভরিলেক[৭] জল।
কল্লোল হিল্লোলে উঠে[৮] তরঙ্গ প্রবল ॥

১ পাঠান্তর—আস ২ অক্কাশ—উনপঞ্চাশ ৩ পা—মেঘের গর্জন ডাক হানে হান ৪ পা—অন্ত
৫ পা—কামিনী ৬ পা—একবার ৭ পা—ঘাটে উঠে ৮ পা—জলে রইল উঠে।

শীতে থরহর চান্দ সদাকর।
মনসারে গালি দেয় স্মরে বিশ্বেশ্বর[১]॥
কোপে হনুমান সদাকরে চান।
সাত[২] ডিঙ্গা একবারে ডুবায়্যা ফেলান॥
চরণের ঘায় ডুবে সাত নায়।
ঝাম্প দিয়া জলে সাধু পড়িল তরায়॥
বাঙ্গাল সকল কেহ খায় জল।
ভাসিল প্রবল স্রোতে নাহি পায় স্থল॥
চান্দ বাণ্যার দোষে মনসার রোষে।
বিপাকে বাঙ্গাল ডুবে আসিয়া বিদেশে॥
সাধু জল খায় চতুর্দিকে চায়।
ক্ষণে ডুবে ক্ষণে উঠে চেতনা হারায়॥
ভাসিল বিস্তর চান্দ সদাকর।
জল খায়্যা পেট তার হইল ডাবর[৩]॥
আকু পাকু হয় কুল নাহি পায়।
কণ্ঠাগত প্রাণ তবে নিন্দে মনসায়॥
নৌকায় উপরে মনসার বরে।
যত দ্রব্য ছিল সে ভাসিল স্রোতরে[৪]॥
সাধু ধরিবারে যায়[৫] দেবীর মায়ায়।
সেই দ্রব্য জলে ডুবে ধরিতে না পায়॥
নেতু বলে মায় সাধু প্রাণ যায়।
পাইল অনেক দুঃখ কৃপা কর তায়॥
নেতু যে বলিল মনসা চিন্তিল।
বস্যো[৬] ছিল পদ্ম পুষ্পে জলে ফেল্যো দিল॥
একশত দল অতি সুকোমল।
চক্রাকারে ভাস্যো আইল চান্দে দিতে কোল[৭]॥
মূঢ় চাঁদ বাণ্যা পদ্মপুষ্প জান্যা।
* * * না করে মায়া শাস্ত্রে আছে শুনিয়া॥

১ পাঠান্তর—স্মরে বিস্তর ২ পা—সপ্ত ৩ পা—ডিঙ্গর (ঢাকের মত ফুলে ওঠা) ৪ পা—উপরে ৫ পা—চায় ৬ পা—বস্তা ৭ পা—স্থল।

পদ্মের কুমারী দেবী বিষহরী।
সে কারণে নাই ছুঁয়ে চান্দ অধিকারী॥
সাধুর দুর্দশা দেখিয়া মনসা।
ফেল্যা দিল জবা পুষ্প দূরে তেজি ঘোষা[1] ॥
মনসার মায়া কে জানিবে তাহা।
জল মধ্যে পড়ে এক রম্ভা তরু[2] হয়্যা॥
দেখি সদাকর ধরে তরতর[3]।
ভাসিয়া চলিল মনে চিন্তিয়া শঙ্কর॥
লাগে গিয়া কূলে কবিরাজে বলে।
বিষহরী সর্পভয় নিবারয় হেলে[4] ॥
যে শুনে সংগীত হয়্যা আনন্দিত।
সর্বদা তাহার পক্ষে হবে দয়ান্বিত॥

উলঙ্গ সদাকর ধরি রম্ভা তরুবর
ভাসিয়া লাগিল আসি ঘাটে।
কেবল পাইল প্রাণ কতক্ষণে পায়্যা জ্ঞান
লজ্জাভরে কূলে নাই উঠে॥
মনসা করিল বল সাত ডিঙ্গা গেল তল
মরিল বাঙ্গাল কর্ণধার।
সর্বস্ব ভাসিল জলে চাঁদ বাণ্যা কোপে বলে
মনসারে নিন্দয়ে অপার॥
বলে কানি চেঙ্গ মুঁড়ি ভরা নৌকা খাইল বুড়ী[5]
প্রাণে মাইল সকল বাঙ্গালে।
ছ পুত্র আমার খায়্যা আছিল ভরসা পায়্যা
আজু ডিঙ্গা ডুবাইল জলে॥

১ ঘোষা—গোসা, ক্রোধ ২ রম্ভা তরু— কলা গাছ ৩ পাঠান্তর—তরুবর ৪ পা— নিবারিবে
ভালে ৫ পা—নৌকা মোর কৈল বুড়ি (নিমজ্জিত)।

দেখা দেয় যদি কানি যে করিব আমি জানি
কতকাল থাক লুকাইয়া।
আজু রক্ষা কৈল শিব সে কারণে পাইলা জীব
দেশে যাব কেমন করিয়া॥
চিন্তা মনে করে সাধু ধরি রূপ কুলবধূ
কাখে কুম্ভ করিয়া মনসা।
দশ পাক[1] নারী সনে চলিল কৌতুক মনে
দেখিবারে চান্দের দুর্দশা॥
দেখি কূলে সীমন্তিনী প্রবেশিল যতি জ্ঞানী
লজ্জাভয়ে চাঁদ সদাকর।
মনসা মনেতে হাসি বলে মন্দ মৃদু ভাসি[2]
জিজ্ঞাসিল সকল উত্তর।
কহে চান্দ অধিকারী শুনগো কুলের নারী
দুখ মোরে দিল বিষহরী।
খাইল মোর পুত্র ছয়ে ডিঙ্গা দিল কালি দহে
প্রাণ পাইলাম ভাবি শূলধারী॥
আমি লক্ষপতি ছিলাম সদাকর।
সর্বস্ব ভাসিল জলে দুখ দশা এ কপালে
পরিবারে নাহিক আমার॥
সে কারণে জল মাঝে আছিগো লোকের লাজে
বুদ্ধি মোর হরিল সকল।
মনসা বলেন আরে শুন মূঢ় সদাকরে
উচিত কর্মের পায় ফল॥
যদি হৈলে বুদ্ধি হারা উপদেশ শুন মোরা
পর গিয়া শ্মশানের কানি।
ঝুলা[3] করি বাম করে মেগে খাও ঘরে ঘরে
প্রাণ রক্ষা কর সব জানি॥

১ পাঠান্তর—সাত পাক ২ পা—বলে মধুর ভাসি ৩ ঝুলা—ঝোলা।

কহিয়া এতেক কথা চলিল মনসা মাতা
চাঁদ'বাণ্যা ভাবিল হৃদয়।
যোগী[১] যোগ্য অনুমানি পরে শ্মশানের কানি
দৈবদোষে এত দশা হয় ॥
হীরা নীলা মণি পলা হাতী রথ[২] যার ছিলা
পরিধান পাট পটাম্বর।
নিন্দা করি মনসারে শ্মশানের কানি পরে
হাতে ঝুলা করে সদাগর ॥
ভিক্ষা মাঁগে বাড়ী বাড়ী কেহ দেয় চাল কড়ি
ধর্ম পথে যার মনগতি।
কেহ খেপাইয়া মারে কেহ খিল দেয় ঘরে
পায় সাধু অশেষ দুর্গতি ॥
কেহ ধান্য দেয় স্থালে কেহবা বিরূপ বলে
কেহ দেয় ছিন্ন পরিধান।
এইরূপে সদাকর ভিক্ষা মাগে ঘরে ঘর
প্রতিদিন পোষয়ে জীবন ॥
ফিরি সাধু কহে বাণী ধান্য পাইল আড়ি[৩] তিনি[৪]
ভিক্ষা ঘর দেখে কৈল বাসা।
বেচিয়া বনের কাষ্ঠ কড়ি পাইল পণ আষ্ট
দিনে দিনে অর্থে হৈল আশা ॥
জানি দেবী বিষহরী খণে সে আদর করি
মূষিকে পাঠাল সেই ঘরে।
চতুর মূষিক অতি দন্তে বিদারিল ক্ষিতি
প্রবেশ করিল সে বিবরে[৫] ॥
মূষা অতি বলবান চাল কড়ি যত ধান
নিমেষে পুরাল লম্বা খাতে[৬]।
যে ছিল পুরণা কানি দন্তে কৈল খানি খানি
প্রবেশিল গনাই[৭] সাক্ষাতে ॥

১ পাঠান্তর—যুক্তি ২ পা—আভরণ ৩ আড়ি—আড়া' ধান্যের মাপ ৪ তিনি—তিন ৫ বিবরে—গর্তে ৬ পা—লম্ব্যা গাতে ৭ পা—গণেশ।

চাঁদ বাণ্যা হেন কালে প্রবেশিল সেই স্থলে
দেখে নাই ধান চাল কড়ি।
দেখিয়া বিস্বর তথা সাধু মনে করে ব্যথা
বলে এ কি বিপুরীত[১] বড়ি ॥
ভিক্ষা করি প্রাণ ধরি তাতে কাণি[২] বিষহরী
দাগা দিল শূন্য ঘর পায়্যা ॥
বহুত গঞ্জনা করি চলে চান্দ অধিকারী
প্রবেশে গহন বনে গিয়া ॥
মনসা দেবীর হটে[৩] আর পরমাদ ঘটে
বিপিনে ভেটিল ব্যাধগণ।
উপরে বান্ধিয়া দড়ি চতুর্দিগে জাল আড়ি
আহার করিয়া নিজ ধন ॥
গুলি আর বাটুল লয়্যা পক্ষীগণে তাড়াইয়া
আনিয়া রাখ্যাছে সেইখানে।
হেনকালে চান্দ যায় দুখে করে হায় হায়
শবদ শুনিয়া পক্ষীগণে ॥
পলাইল সর্বপাখী ব্যাধগণ তারে দেখি
বেড়িল আসিয়া সদাকরে।
বলে কোথাকার শালা আইল এমন বেলা
ধাকাধাকি কেহ মারে তারে[৪] ॥
বলে চাঁদ অধিকারী কি দোষ তোমার করি
কি কারণে মার বন মাঝে।
ব্যাধগণ বলে ভেড়্যা[৫] পাখী দিলে দূরে তাড়্যা
এ পথে আইলি কোন কাজে ॥
ধরিয়া তাহার চুলে কেহ মারে ধনু হূলে[৬]
সাধু বলে দেহ প্রাণদান।
ডর না দেখিয়া তার পথ্যারা[৭] সকলে আর
না মারিল হয়্যা দয়াবান ॥

১ পাঠান্তর—পরমাদ ২ পা—মন ৩ হটে—জিদ বশতঃ ৪ পা—ধাকা ধুকি দিয়ে কেহ মারে ৫ ভেড়্যা—ভেড়ুয়া. ভেড়ার তুল্য কাপুরুষ ৬ হূল-ধনুর অংশ বিশেষ।
৭ পঁথ্যারা—পাখিধরা লোকেরা

পরাজয় পায়্যা অতি চান্দবাণ্যা মূঢ় মতি
উপনীত মৈত্রের ভুবনে।
দ্বারিকা দাসেতে বলে দেবতা নিন্দার ফলে
দুঃখ সাধু পায় থানে থানে ॥

চাঁদ বাণ্যা-দুঃখ পায়।
বলে সদা হায় হায় ॥
ভ্রমিয়া অনেক বনে।
প্রবেশ মৈত্রের স্থানে ॥
প্রবেশিল জুড়াবার আশে।
ডাকে মৈত্র আস মোর পাশে ॥
মৈত্র তার ধর্মদাস নামে।
শুনিতে পাইল নিজ ধামে ॥
সম্ভ্রমে সম্ভাষ কৈল আসি।
অবশেষে বচন প্রকাশি ॥
বলে ধর্মদাস প্রাণ মিতা[১]।
দেখি বড় অপরূপ কথা ॥
শুভদিনে দেখিনু নয়ানে।
কহ দুঃখ পাইলে কেমনে ॥
চান্দ বলে কি কহিব মিতা।
বড় পাইলাম এ অবস্থা ॥
চেঙ্গ মুড়ি বিষহরী কাণি।
প্রাণে মোরে মার‍্যা ছিল আনি ॥
কালীদহে কৈল বরিষণ।
ডিঙ্গা ডুবাইয়া নৈল ধন ॥
সর্বস্ব ভাসিয়া[২] গেল জলে।
ভাসিয়া লাগিলু আসি কুলে।

১ পাঠান্তর—ধর্মদাস কহে বল মিতা ২ পা—ডুবিয়া।

প্রাণ রক্ষা কৈল বিশ্বনাথ[১] ।
তাএ হৈল মিত্রের সাক্ষাত ॥
পূর্ব্বে কিবা দেখ্যাছ সুখ ।
বিধি তবে দিল এত দুখ ॥
ভাগ্যে মিত্র পালু তব দেখা ।
বিপতের কালে হয় সখা ॥
শাস্ত্র মতে কর অবধান ।
মৈত্র দিয়া[২] মৈত্রের সম্মান ॥
যবে রঘুনাথ গেল বনে ।
সঙ্গে লয়্যা জানকী লক্ষ্মণে ॥
সীতারে হরিল দশশির ।
কান্দিয়া আকুল রঘুবীর ॥
মৈত্রী কৈল সুগ্রীবের সাথে ।
বালীবধ করি শরাঘাতে ॥
মৈত্রে দিলা রাজ্য ধন সুখ ।
সে পুন হরিল তার দুখ ॥
সঙ্গে লয়্যা নানা বীরগণ ।
সমূদ্র বান্ধিয়া কৈল রণ ॥
রাবণের বংশ বধ করি ।
উদ্ধারিল জনক কুমারী ॥
জটায়ু নামেতে পক্ষী ছিল ।
মৈত্রের কারণে প্রাণ দিল ॥
সম্পদের ভাই আপনার ।
মৈত্র করে বিপতে উদ্ধার ॥
দয়া করে[৩] কর উপকার ।
কথা থাকু ঘোষিতে সংসার ॥
চান্দ বাণ্যা কহে সকাতরে[৪] ।
ধর্ম্মদাস বলে কিছু তারে ॥

১ পাঠান্তর—রক্ষা কৈল শিব বিশ্বনাথ ২ পা—জনে ৩ পা—দশাভোগে ৪ পা—শোকাতুরে ।

মৈত্রের দয়া শীঘ্র বাসে[১]।
রাখিতে উচিত তারে পাশে[২]।
যদি তারে কহে অন্য ভাবে।
এহ পরকাল তার ডুবে॥
তুমি মৈত্র অবশ্য মোর প্রাণ।
ভাগ্য থিলে[৩] সেবিব নিদান॥
স্থল জল তৈল আন্যা দিল।
ছমিত্র আনন্দে স্নান কৈল॥
অন্তঃপুরে যেথা দিল বাসা।
সে ঘরে থাপিছে মনসা॥
শ্রীযুত দ্বারকা দাসে গায়।
চাঁদ বান্যা আর দুঃখ পায়॥

চান্দ সদাকর প্রবেশি সে ঘর
দেখে মনসার বারা[৪]।
গলে কিয়া পাতা সিন্দুরে শোভিতা
উপরে লম্বিছে ঝরা[৫]॥
তার চারি ভিতে লেখিছে বহুতে
মনসার সর্প চিত্র।
মূঢ় সদাকর ক্রোধে গুরুতর
ঘটে করে * * * ॥
অতিশয় তেজে চাঁদ বাণ্যা গর্জে
রাগে কহে নানা কথা।
ভিঙ্গা লয়্যা মোর ভরসা এ তোর
লোকাইয়া আছ এথা॥

১ পাঠান্তর—শত্রু যদি আসে গৃহবাসে ২ পা—তোমা পাশে ৩ থিলে—থাকিলে ৪ বারা—বারিপূর্ণ ঘট ৫ ঝরা—দেওয়ালে অংকিত চিত্র।

ঠেকিলি বিপাকে কেবা রাখে তোকে
আজু সে সাধিব বাদি।
তোরে চেষ্টা করি নানা রাজ্যে ফিরি
সন্ধানে ঘটালে বিধি ॥
মিতা মূঢ় মতি তোরে দিল স্থিতি
কি গুণে মন্দিরে আনি।
ভুলায়্যা বর্বর খাও নিরন্তর
আজু যাবে প্রাণ জানি।
ডাকে সদাগর মিতা * * *
কবাট কিলহ[1] দ্বারে।
কানি চেঙ্গ মুড়ি দুঃখ দিবে বড়ি
বধ করি এইবারে ॥
ভাঙ্গিবারে ঘটে সাকে পাকে উঠে
চতুর্দিগে খুজে বাড়ি।
পড়িল চহল[2] শুনি গণ্ডগোল
সবে ধরে চান্দে বেড়ি ॥
সবে মন্দ বলি চান্দে দেয় গালি
বলে এত ভাল নহে।
দেখিনু সাক্ষাতে দেবতার সাথে
অজ্ঞান কুবোল কহে ॥
বলে ধর্মদাস কৈলে সর্বনাশ
মনসার শত্রু হয়্যা।
ছয় পুত্র মারি ক্রোধে বিষহরী
হরিলে এ দোষ পায়্যা ॥
বিপত্যের চিহ্নি বুদ্ধি হইল হীনি
দেহরে বাহির করি।
মৈত্র যদি জান শত্রু আচরণ
কার্য নহে ধর্মে ডরি ॥

১ কিলহ—বন্ধ কর ২ চহল—চীৎকার, গোলযোগ।

শুনি তার বাণী সভে অনুমানি
বাড়ির বাহির করে।
পায়্যা অপমান চান্দ বাণ্যা যান
বিষাদে নয়ন ঝুরে[১] ॥
মৃত্যু ভাল তার অপমান সার
বিশেষে বন্ধুর বাড়ি।
মৈত্র প্রাণ সম দুহে করে কর্ম
কর্মদোষ মোর বড়ি ॥
বিষাদে বিস্তর চান্দ সদাকর
গ্রামে গ্রামে মাগে ভিক্ষা।
কভু উপবাস কভু এক গ্রাস[২]
কষ্টে[৩] প্রাণ করে রক্ষা ॥
হেন কালে পথে দেখিল সাক্ষাতে
জন পাঞ্চ ছয় মিলি।
কাষ্ঠের কারণে যায় ঘোর বনে
সদাকর তারে বলি ॥
শুন ভাই সবে কোথাকারে যাবে
মোরে লয়্যা যাঅ সঙ্গে।
দশা মোর হীন থাকি কথোদিন
বিপিনে ভ্রমিয়া রঙ্গে ॥
বলে কাঠোরিয়া আইস ওরে ভায়া[৪]
সুখে থাক সঙ্গে মোর[৫]।
বিপিনের কাষ্ঠ ভাঙ্গিব চহাট[৬]
হরিবে দুর্দশা তোর ॥
বিধির ঘটনে কাঠোরিয়া সনে
সাধু গেল ঘোর বনে।
কাঠোরিয়া যত ভাঙ্গে কাষ্ঠা * * *
দেখি সাধু ত্রাসে মনে ॥

১ ঝুরে—চোখের জল পড়ে ২ পাঠান্তর-মিলে গ্রাস ৩ পা—বলে ৪ পা—আসরে ভাইয়া। ৫ পা—সঙ্গে সঙ্গে থাক মোর ৬ চহাট—শীঘ্র (?)।

খুঁজি বনে বন অচির[১] চন্দন
কাষ্ঠ পাইল সদাকর।
ভাঙ্গি কতগুলি[২] আপনা সম্ভালি[৩]
লতা পাশে বান্ধে তারে ॥
বোঝা করি মাথে কাঠোরিয়া সাথে
চান্দ সদাকর আইসে।
গগন উপরি দেখি বিষহরী[৪]
দেবী[৫] মনে মনে হাসে ॥
কাষ্ঠ বিচি[৬] খাইতে সাধু কৈল চিত্তে
এত ভাল কর্ম নয়।
হনুমান বীরে ভাবিল অন্তরে
দ্বারিকা দাসেতে কয় ॥

উর উর বিষহরী তেজি নিজ স্থান।
সেবকে ধরিল আশা চিন্তা করি ধ্যান ॥
আসরে তোমার গীত হবে যেই কালে।
কৃপা করি দণ্ড ছয় উরিবে ভূতলে ॥
চরণে শরণ মাগো লৈয়াছি তোমার।
বিঘ্ন বিনাশিয়া কর সঙ্গীতে প্রচার ॥
মহিমা বর্ণিতে কেবা আছয়ে সংসারে।
নাগরূপে একচক্রে ধরিলে ক্ষিতিরে ॥
তবে কাষ্ঠ শিরে লয়্যা চান্দ বাণ্যা যায়।
হনুমান ডাকি মাতা পাঠাইল তায় ॥[৭]
বলিল কাষ্ঠের মাঝে চাপ অল্প করি।[৮]
প্রাণে যেন নাই মরে চান্দ অধিকারী ॥

১ পাঠান্তর—অকাল ২ পা—ভাঙ্গিয়া সকলি ৩ সম্ভালি—সামলে নিয়ে ৪ পা—দেবী সহচরী ৫ পা—দেখি ৬ বিচি-বেছে, বিক্রয় করে ৭ পা—পাইল ত্বরায় ৮ পা—বলে কাষ্ঠ মধ্যে চাপ তুমি বরাবরি।

মনসার আজ্ঞা পায়্যা হনুমান যায়।
বাম হস্ত তুলি দিল চান্দের বোঝায় ॥
পর্বত জিনিয়া যেন পড়িল মাথায়।
ত্রাসে বোঝা ফেলে সাধু শিব শিব ধ্যায় ॥
থরহর কাম্পে অঙ্গ ঘামে স্তম্ভীভূত।
চেতনা হারায়্যা সাধু বসিল তুল্লিত।
বল বুদ্ধি গেল তার হনুর[১] চাপানে।
কাষ্ঠ তেজি চান্দ বাণ্যা যায় বনে বনে ॥
প্রবেশিল গিয়া এক ব্রাহ্মণের দ্বারে।
প্রণাম করিয়া সাধু নিবেদন করে[২] ॥
কৃপা করে রাখ মোরে শুন দ্বিজবর।
সদাকর ছিলাম অবে হইব কিংকর ॥
করিব আপন কার্য্য আজ্ঞা পরমাণে।
অন্ন আচ্ছাদন দিয়া রাখহ ভুবনে[৩] ॥
বিপ্র বলে তুমি মোর পুত্রের সমান।
থাক মোর ঘরে তোর বাড়িবে সম্মান ॥
অনেক আশ্বাস করি রাখিলেন তারে।
একদিন ক্ষেতে গেল ধান্য বাছিবারে ॥
ধান্য বাছে কোন ভাবে সাধু নাই জানে[৪]।
ধান্য উপাড়িয়া যায় রাখি যায় তৃণে ॥
বেলা দেড় পরে বিপ্র লইয়া খেচড়ি।
প্রবেশ করিল বিপ্র সেই ধান্য বাড়ী[৫] ॥
আধা ক্ষেতে ধান্য নাই আছে মাত্র খড়।
ক্রোধে বিপ্র মারে তারে দুই গালে চড় ॥
বলে ধান্য নষ্ট কৈলি অজ্ঞানী বাতুল।
ক্ষেত হৈতে তুল্যা দিল ধরি তার চুল ॥

১ পাঠান্তর—হন্তের ২ পা—কিছু কৈল তারে ৩ পা—অন্ন বস্ত্র দিয়া রাখ আমার জীবনে ৪ পা—ধান্য বাছা বল্যা সাধু কিছু নাই জানে ৫ পা—প্রবেশ হইল ধান্য বাছিবার বাড়ী।

অপমানে চাঁদ বাণ্যা তেজে সেই স্থান।
গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা মাগি প্রতি দিন খান[১] ॥
পঞ্চ উপচারে ভোগ প্রতিদিন যার[২]।
সন্দেহ হইল অন্ন বেঞ্জন তাহার ॥
নানা কষ্ট পায় সাধু কভু উপবাস।
বৃক্ষ মূলে ভূমি করে শয্যা মেলি ঘাস ॥
খোল বাণ্ডে ভিক্ষা মাগে প্রতি ঘরে ঘরে।
এই রূপে গেল তার অর্দ্ধেক বৎসরে ॥
তবে চম্পা নগ্রে * * * * *
সনকার গর্ভে যবে হয়[৩] পাঁচ মাস ॥
সেই কালে চাঁদ বাণ্যা গেল নৌকা লয়্যা।
তার কথা কহি কিছু বিষহরী ধ্যায়া ॥
লক্ষীন্দর বেহুলার শুন সর্ব কথা[৪]।
একদিন স্বর্গপুরে সকল দেবতা[৫] ॥
কাদম্বরী পান করি দেবতা সকল।
আরম্ভিল নৃত্য সবে হইয়া বিভোল ॥
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ ধরে তাল।
উন্মত্ত দেবতা যত তাণ্ডবে রসাল ॥
ইন্দ্রসুত নীলাম্বর নৃত্য করে তালে।
মোহিত হইয়া শিব তারে ধরে কোলে ॥
গলে ছিল হাড়মালা শিব কৈল হাতে।
হাড়মালা দিল ইন্দ্রসুতের গলাতে ॥
ভুবন মোহন রূপ ইন্দ্রের কুমার।
হাড়মালা গলে শোভা না ধরে তাহার ॥
মনে মন নীলাম্বর ভাবেন বিষাদ।
অত দ্রব্য থাকিতে মোর কি কৈলে প্রমাদ ॥
দেখিবারে হাড়মালা অতি বিপুরীত।
না রাখিব গলে বলি নামাল তুরিত ॥

১ পাঠান্তর—গ্রামে ভিক্ষা প্রতিদিন পুষয়ে জীবন ২ পা—পঞ্চামৃতে পঞ্চভাবে ভোগ যাহার
৩ পা—গর্ভে ছিল পুত্র ৪ পা—অপূর্ব কথন ৫ পা—যত দেবগণ।

সর্বগ্য ঈশ্বর তথা জানিয়া কারণ।
নিন্দা কৈল হাড়মালা ইন্দ্রের নন্দন ॥
ক্রোধভরে নীলাম্বরে বলে ত্রিলোচন।
নিন্দা কৈলে হাড়মালা দেখি সে অগ্যান ॥
এহি যে মালার[১] গুণ কে জানিতে পারে।
একান্তে স্মরণ কৈলে জন্ম দুঃখ হরে ॥
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এ হাড়ের তেজে।
অনুক্ষণে[২] প্রাণী যদি ধরে হৃদি মাঝে ॥
অসাধ্য করায় সাধ্য এই হাড় মালা।
হেন মালা নিন্দা কৈলি অর্থে হৈয়া ভোলা ॥
আভরণে সুখভোগ বাসনা তোমার[৩]।
পৃথিবীতে জন্ম লভ বণিকের ঘর ॥
কহিতে কহিতে শিব হৈল অগ্নিময়[৪]।
চারি পাশে অগ্নি যেন উঠিলা প্রলয় ॥
মহা ত্রাসে দেবগণ শিবে স্তুতি করে।
ভস্ম হৈয়া ইন্দ্রসুত গেল দিগন্তরে ॥
পুত্রের মরণ দেখি ইন্দ্রের আকুল।
অচেতনে কাঁদে ইন্দ্র পুত্রশোকে ভুল[৫] ॥
হরসে বিরস হৈল যত দেবগণ।
ইন্দ্রের নগর বেড়ি উঠিল ক্রন্দন ॥
পুত্রের মরণ শুনি শচী ধায় ত্রাসে।
হরিল চেতনা তার পুত্রের বিনাশে[৬] ॥
জয়ন্ত বিজয় যায় দুই সহোদর।
ভাইর মরণ দুঃখ ভাবিল বিস্তর ॥
ইন্দ্রবধূ ছায়বতী ছিল নিজ ঘরে[৭]।
স্বামীর মরণ শুনি আইল বাহিরে ॥
পতিব্রতা নারী শোকে প্রাণ নাই ধরে[৮]।
হৃদে চিন্তা ডুবিল সে দুঃখের সাগরে ॥

১ পাঠান্তর—এইত হাড়ের ২ পা—মৃত্যু যাবে ৩ পা—সুখ হৈল মনেতে তোমার ৪ পা—ক্রোধময় ৫ পা—নাহি বান্ধে চুল ৬ পা—বিরসে ৭ পা—পুরে ৮ পা—না দেখি স্বামীরে।

প্রলয় ঝড়েতে[১] যেহ্নে[২] রম্ভা তরু পড়ে।
হা হা নাথ বলি মুখে[৩] সতী প্রাণ ছাড়ে॥
দারুণ শিবের ক্রোধে দুঁহে হৈল নাশ।
রচিয়া বিলাপ কহে শ্রী দ্বারিকা দাস[৪]॥

রাগ করুণা

ইন্দ্রসুত নীলাম্বরে শাপ দিয়া ক্রোধভরে
ভস্ম কৈল দেব ত্রিনয়ান[৫]।
অচেতন ইন্দ্রদেবে করুণা করয় সভে
শচী কান্দে হারাইয়া গ্যান[৬]॥
ধরিয়া শিবের পায় কান্দে শচী উভরায়
বলে রক্ষা কহ্হে ঈশান[৭]।
শিশু কৈল যত দোষ মোরে দেখি ক্ষম রোষ
একবার দেঅ প্রাণদান॥
পূজিব চরণ তলে প্রাণ থাকে যত কালে
রাখ তনু পুত্রে প্রাণ দিয়া[৮]।
অন্যথা তেজিব প্রাণ ইহাতে নাহিক আন
পুত্র বধূ তিলে না দেখিয়া॥
বিনা পুত্র [৯]নীলাম্বর শোভাহীন দ্বারকার[১০]
দুর্গম কানন হৈল মোরে।
যে দিগে নেহারি আঁখি পুত্রমুখ নাহি দেখি
ডুবিলুঁ অগাধ শোকনীরে॥

* * *

মোর পুত্রে কেন দিলে শাপ।
দেবলোকে থাকু কথা খড়্গো কাট মোর মাথা
ঘুঁচু মোর মনের সন্তাপ॥

১ পাঠান্তর—পবনে ২ যেহ্নে—যেমন করে ৩ পা—করি ডাকে ৪ পা—শচীরবিলাপে কহে দ্বারকার দাস ৫ পা—ত্রিলোচন ৬ পা—হইয়া অজ্ঞান ৭ পা—কর ত্রিলোচন ৮ পা—রাখ মোর প্রাণ তনু দিয়া ৯ পা—আহা পুত্র ১০ পা—স্বর্গপুর।

বচনে প্রতীত[১] মধু হায় হায় [২]পুত্রবধূ
কোথা গেলে তেজিয়া আমায়।
জয়ন্ত বিজয় দুই [৩] জননীর মুখ চাই
নানা পরিবোধ দেয় মায়॥
দারুণ শোকের ভরে প্রবোধে কি প্রাণ ধরে
শচী কাঁদে হারায়্যা চেতন[৪]।
ইন্দ্রের করুণা যত তাহা বা কহিব কত
কলরব ইন্দ্রের ভুবন॥
শচী সুরপতি দুখ দেখিয়া বিদুরে বুক[৫]
পুত্রের বিষম মায়া অতি।
আগ্যা কৈল শূলপাণি শুন গো ইন্দ্রের রানী
দুঃখ তেজি যাঅ[৬] নিজ স্থিতি॥
ভস্ম হৈল যার তনু পুনর্ব্বার জন্ম বিনু
না পাইবা আপনা নন্দন।
এক মাস গেলে পুন যাইবে আপনা স্থান
পুত্র বধূ পাবে দুই জন॥
ধন্বন্তরি বিষহরী পুত্র বধূ সঙ্গে করি
আনি দেবী আপনা মন্দিরে।
ইন্দ্রে কহে এত বাণী প্রবোধিয়া দুই প্রাণী
শিব গেলা কৈলাস শিখরে॥
তবে দেবী বিষহরী দুজনায় সঙ্গে করি
প্রবেশিল চম্পাই নগরে।
সনকার ঋতু স্নানে সেই দিন গর্ভাধানে
প্রবেশিল ইন্দ্রের কুমরে॥

১ পাঠান্তর—বচন শোভিত ২ পা—আহা মোর ৩ পা—জয় বিজয় দুই ভাই ৪ পা—হৈয়া অচেতন ৫ পা—দেখিয়া শচীর দুঃখ বিদুরিয়া যায় বুক ৬ পা—থাক

তারপর সেই কালে[১] বিষহরী যোগবলে
প্রবেশিল নিছানি নগরী।
অমলার গর্ভ দেখি ছায়াবতী তথা রাখি
মনসা গেলেন নিজ পুরী ॥
এথা সে সনকা নারী পাঁচ মাস গর্ভধারী
স্বামী তার বাসে দুঃখ মতি।
দিনে দিনে গর্ভ বাড়ে সদাই আলস ধরে
শরীর পিঙ্গল হৈল অতি ॥
বদন নির্ম্মল চারু পয়োধর হৈল গুরু
নিতম্ব ভার হৈল অতিশয়।
দিনে দিনে ভোগ তুটে[২] নিরন্তরে হাই উঠে
শ্রীবৈদ্য দ্বারিকা দাসে কয়[৩] ॥

গেল পাঁচ মাস ষষ্ঠ পরকাশ
সপ্তম অষ্টম হৈল দৈবে অভিলাষ।
হরষে বিষাদ খায় নানা স্বাদ
এড়াইল নয় মাস গণিয়া প্রমাদ[৪] ॥

* * * * *

শুভক্ষণে পাতে জানু যবে দশ মাস ॥
ডাকিয়া পুত্রিনী সকল কামিনী
প্রসবিল একপুত্র সনকা জননী।
নারীগণ মিলি দিল হুলা হুলি
হরিদ্রা সহিতে শিরে অঙ্গে ঢালি পানি ॥
জন্মিল যে কালে অবনী মণ্ডলে
আলো হৈল দশ দিগ সুদিন নির্ম্মল।
রূপে ভূমণ্ডল করয়ে উজ্বল
প্রসব সূতিকা ঘরে জলিল অনল ॥

১ পাঠান্তর—তাহার প্রাতঃকালে ২ তুটে—টুটে—দূর হয় ৩ পা—শ্রীযুত দ্বারিকা দাস কয় ৪ পা—স্বামী পরবাস

খণ্ডে দূরে দৃষ্টি সকল অরিষ্টি
ছয় দিনে যথোচিত পূজা কৈল ষষ্ঠী ।
অষ্টম দিবসে পুত্রের হরিষে
রোপিল[১] তণ্ডুল কত পূজনের তোষে ।
দেখি পুত্রমুখ ছাড়ে সর্ব দুখ
নিভা কৈল নয় দিনে হইয়া কৌতুক ।
রমনীর মেলা হরিদ্রার খেলা
কে মারে কাহার অঙ্গে সুখে হয়্যা ভোলা ।
একবিংশ দিনে ষষ্ঠীর চরণে
পুনর্বার পূজা কৈল শাস্ত্রের বিধানে ।
বিপ্রগণ করে দেখিয়া কুমারে
বিচারিয়া নাম তার থুইল লক্ষীন্দরে ।

মনসার বরে বাড়ে নিরন্তরে ।
সনকা আনন্দ বড় দেখিয়া কুমারে ॥
পূর্ব পুণ্য ফলে ইন্দ্রসুত কোলে ।
অন্ন ছুআইল তারে ছ মাসের কালে ॥
যে দিনে লখাই জন্মিল এথাই ।
তার পর দিন বেহুলা জন্মিল তথাই ॥
অমলা সুন্দরী কন্যামুখ হেরি ।
পরম আনন্দ হৈল দুঃখ পরিহরি[২]॥
ভুবন মোহিনী জন্মিল নন্দিনী ।
সাত পুত্র পরে হৈল কন্যা[৩] সুলক্ষণী ॥
যত নর নারী দেখিয়া কুমারী ।
স্বর্গ হইতে মর্ত্যে যেন গড়িল কি কুন্দি[৪] ॥
কন্যা রৈল ঘরে[৫] দেখি সদাকরে ।
যথাবিধি ক্রিয়া কৈল শাস্ত্র অনুসারে ॥

১ পাঠান্তর—খেপিল (ক্ষেপণ অর্থে) ২ পা—জয় জয় পুরী ৩ পা—কন্যা পাইল
৪ মুন্ত্রি—ক্ষোদন করে, খোদাই করে ৫ পাঠান্তর-অন্তঃপুরে ।

বাড়ে নিরন্তর   হুঁহে হুঁহা ঘর।
শুন এবে চাঁদ বাণ্যা আইসে নিজপুর॥
ভ্রমি নানাদেশ   পায়্যা অতি ক্লেশ।
তৈল বস্ত্র বিবর্জ্জিত [১] চণ্ডালের বেশ॥
লজ্জার কারণে   চলে বনে বনে।
বিদিত প্রমান কেশ মস্তক ভূবণে॥
জানি বিষহরী   মায়া রূপ ধরি।
দৈবগ্যের বেশে আইল কাখে পাঁজি করি॥
তিলক কপালে   যগ্যসূত্র গলে।
আশ্ছাদিয়া নিজ রূপ উরিল ভূতলে॥
শুভাশুভ বাছি [২]   চম্পা নগ্রে আসি।
পঞ্জিকা পড়িয়া কহে ভবিষ্য প্রকাশি॥
সনকা শুনিয়া   দৈবগ্যে ডাকিয়া।
সুবর্ণের থালে গুবাক তণ্ডুল পুরিয়া॥
আনি দিব্য মান [৩]   দিল সমাধান।
ভালোমন্দ কথা মোর কহিবে নিদান॥
দেবে অগোচর   আছয়ে কুমর [৪]।
প্রথমে কহিছে তোর হয়্যাছে কুমর॥
গর্ভ পাঁচ মাসে   স্বামী পরবাসে।
গেল নৌকা লয়্যা সাধু অর্থের লালসে॥
যাইবার কালে   কালীদহ জলে।
সপ্ত ডিঙ্গা বিশহরী ডুবাইল ছলে॥
সাধু পাইল প্রাণ   কষ্টে নানা স্থান।
ভ্রমন করিয়া প্রায় আসিবে নিদান॥
সুখে দুঃখে তোর   দৈবে দিল ঘোর।
ছ পুত্র মরিছে রামা শুন বাক্য মোর [৫]॥

১ পাঠান্তরে-বিসু সাধু ২ বাছি——বাছি, বেছে ৩ মান-পূজা ৪ পা-দেবে অগোচর আছয় কুমর গর্ভ পাঁচ মাস স্বামী পরবাস তোর—বানিজ্য লাগিয়া গেল নৌকা লয়্যা। বিড়ম্বিল বিষহরী মায়া আশ্ছাদিয়া॥ ৫ পা—কথা মান মোর।

সাধু নাই ঘরে জানয়ে সংসারে।
আসিয়াছে এক চোর দাগা দিতে তোরে ॥
তার যে লক্ষণ শুন দিয়া মন।
হৃষ্ট পুষ্ট ছিঁড়া বস্ত্র অঙ্গেতে ভূষণ ॥
শিরে দিব্য চুল অভব্যের মূল।
পৃথিবীতে চোর নাই তার সমতুল ॥
আজি সাবধানে জাগ লোক জনে।
কলাবন হৈতে চোর আসিবে ভুবনে ॥
রাত্র দণ্ড ছয় আসিবে নিশ্চয়।
কহিতে না দিবে কথা মারিবে নিশ্চয় [১] ॥
কহি এত কথা বিষহরী মাতা।
প্রত্যয় জন্মিয়া গেল নিজ স্থান যথা ॥
সনকা বাণানী সত্য অনুমানি।
পাশ পড়োশীরে কহ্যা ঘরে থুইল আনি ॥
ত্রাসযুক্ত মনে থাকে সাবধানে [২]।
রাত্রে আসি চাঁদ বাণ্যা মিলে কলাবনে ॥
লজ্জার কারণে নাই আইল [৩] দিনে।
বিচারিল শেষ রাত্রে যাব নিজ স্থানে ॥
সাধুর দুর্দশা করিল মনসা।
কলাবন নাড়ে সাধু যত খায় মশা ॥
একে কলাবন বহয়ে পবন।
হস্ত পদ নাড়ে সাধু করে হন হন ॥
জানিয়া কারণ বেড়ে কলাবন।
চোর চোর [৪] বলি চান্দে ধরে সর্বজন ॥
রাত্র অন্ধকারে চিনিতে না পারে।
চুলে ধরি সর্বজন লাথি চড় মরে ॥
সাধু যত ডাকে নাই শুনে লোকে [৫]।
কলাবনে ঠেকে [৬] সাধু বিধির বিপাকে ॥

১ পাঠান্তর-নির্ভয় ২ পা—ঠেল সাবধান ত্রাস অনুমান ৩ পা—আসে ৪ পা—খট (ডাকাত অর্থে) ৫ পা—কেবা শুনে তাকে ৬ পা—লোটে।

বলে সদাকর হইয়া কাতর।
চাঁদ বাণ্যা নাম মোর না মার বিস্তর ॥
অকারণে প্রাণ যাইবে নিদান।
চোর নয় প্রাণ রাখ দেখ বর্তমান [১] ॥
কাতর বচন শুনি সর্বজন।
প্রদীপ জ্বালিয়া করে চোরে নিরীক্ষণ॥
চিনি সদাকরে অতি লজ্জাভরে।
ধরা ধরি করে সভে চান্দে নিল ঘরে ॥
সনকা লজ্জিত সবে দুঃখ চিত।
সর্ব আভরণ দিল হইয়া চিন্তিত॥
হয়্যা দুঃখভর কহে সদাকর।
তের মাস যত কষ্ট পাইলু তেজি ঘর ॥
জীবন সংশয় গেল দুঃখময়[২]।
সপ্তডঙ্গা বিষহরী নিল কালীদয় ॥
মাগি বাড়ি বাড়ি ধান্য চাল কড়ি।
কেবল বাঁচালু প্রাণ ঘোর দুঃখে পড়ি॥
সনকা সুন্দরী বলে তুষ্টি করি।
প্রাণ বড় ধন প্রভু অর্থে কিবা করি ॥
আল্যে নিজ স্থানে সুখ মোর মনে।
কত দ্রব্য হবে প্রভু তুমি থাক প্রাণে॥
হয়্যাছে কুমর নামে লক্ষীন্দর।
পাচ মাস গর্ভে যবে তুমি দেশান্তর ॥
চান্দ বাণ্যা হাসে পুত্র অভিলাষে।
মনসা মঙ্গল গীত কবিরাজে ভাষে[৩] ॥

ডুবাইয়া সাত ভরা মনসায় করি ত্বরা
ঘরে আইল চান্দ সদাকর।
ছ মাসের পুত্র কোলে সনকা এমন কালে
আনি দিল দেখিতে কুমর ॥

১ পাঠান্তর—চোর নয় আমি প্রাণ রাখ বিদ্যমান ২ পা—গেল দ্রব্যময় ৩ পা—মনসা মঙ্গল রসে কবিরাজ ভাসে।

রূপ জিনি পঞ্চশর নাম তার লক্ষীন্দর
দেখে সাধু মহা আনন্দিতে ।
সপ্তডিঙ্গা জলে গেল যতেক অবস্থা[১] পাইল
সেই দুঃখ বিসরিল চিতে ॥
অবিরতে[২] দুইজন পুত্র পালে অনুক্ষণ
কোলে কাখে পরানে পরান ।
ক্ষীরখণ্ড ছেনা দধি রম্ভা দেয় নিরবধি
চন্দ্র জিনি শোভিত বয়ান ॥
তৈল হরিদ্রায় মেলি নিরন্তরে অঙ্গে ঢালি[৩]
পরিবারে দেয় রত্ন বাস ।
মনসার কৃপা তায় দু তিনি বৎসর যায়
রূপে নগ্রে করিল প্রকাশ ॥
না ছাড়ে পিতার কোল শিশু কহে মিষ্ট[৪] বোল
শুনিয়া সনকা বড় সুখী ।
বৎসর পাচের যবে দৈবজ্ঞে ডাকিয়া তবে
খড়ি দিল শুভক্ষণ দেখি ॥
শিখিল অনেক পাঠ পড়িল শরণ নাট
ইঙ্গিত প্রমানে লক্ষীন্দর ।
দিনে দিনে তনু বাড়ে যৌবন মাতিয়া পড়ে
বদনে নিন্দিত শশধর ॥
শিশু সঙ্গে করে খেলা দু হাতে সোনার বালা
রূপ দেখি মোহিত মদন[৫] ।
মনসার মায়া হৈতে চতুর্দশ বরসেতে
প্রবেশিল সাধুর নন্দন ॥
দেখি সনকার সুখ পাসরিল পূর্ব দুখ
পুত্র গুণমণি পায়্যা কোলে ।
একদিনে লক্ষীন্দ্রর কোলে করি সদাকর
ভোজন করয়ে হেম স্থলে ॥

১ পাঠান্তর—কষণ (দুঃখ) ২ পা—অনুরাগে ৩ পা—মলি তুলি (ময়লা তুলে)
৪ পা—মিঠা ৫ পা—রূপ গুণে শোভিত ভুবন ।

সনকা এমন কালে করুণা করিয়া বলে
প্রাণনাথ কর অবধান।
বয়স অর্ধেক[১] ভেল পুত্রের বিভা না হৈল[২]
দিনে দিনে হৈল বর্ধমান ॥
আর এক মনে ভয় নিরন্তরে[৩] মোর হয়
মনসার সঙ্গে কর বাদ।
তোমার ক্রোধের ফলে ছ পুত্র মাইল কোলে
বিভা রাত্রে হয় পরমাদ ॥
বলু ঁ তুমায় করপুটে[৪] মনসা দেবীর ঘটে
পূজা কর তেজি অভিমান।
রাখ মোর নিবেদন পুত্র বিহু নাই ধন
দুই লোকে কর পরিত্রাণ ॥
এত যদি বলে নারী কহে চান্দ অধিকারী
পুত্রে বিভা করাব নিকটে।
নিশ্চয় জানিবে তুমি পৃথিবী ভিতরে আমি[৫]
না পূজিব[৬] মনসার ঘটে ॥
আচমন করি সুখে গুবাক তাম্বুল মুখে
আসনে বসিল সদাকরে।
পুরোহিত জনার্দনে আনিবারে এ ভুবনে[৭]
কিঙ্করে পাঠাল শীঘ্রতরে ॥
সাধুর কিঙ্কর গিয়া জনার্দনে নতি হয়্যা
কহিল সকল বিবরণ।
মঙ্গল কারণ জানি চলিলেন দ্বিজমণি
চতুর পণ্ডিত জনার্দন ॥
সঙ্গে ভাগবত পুথি পরিল উজ্জল[৮] ধুতি
করিলেন[৯] তিলক কপালে।
কিঙ্করে করিল সাথে ঝারি খুঙ্গি[১০] দিয়া হাতে
চাকর নফর পাছে চলে[১১] ॥

১ পাঠান্তর—অনেক ২ পা—পুত্র বিভা নাই কৈল ৩ পা—নিরবধি ৪ পা—বিনতি হয়্যা করপুটে ৫ পা—পুত্র বিভা তরে আমি ৬ পা—রাখিব ৭ পা—নিকেতনে ৮ পা—উত্তম ৯ পা—অধরেথ ১০ খুঙ্গি—বাঁশ বা বেতের তৈরি বই কাগজপত্র রাখবার ঝাঁপি ১১ পা—কিঙ্কর পশ্চাতে ছয় চলে।

কত শিষ্য সঙ্গে করি জনার্দন তরতরি
উপনীত সাধুর ভুবনে।
শুদ্ধ বংশ বৈদ্য কুলে বাক্‌দেবী কৃপা বলে
শ্রীবৈদ্য দ্বারিকা দাসে ভণে॥

পণ্ডিত প্রবেশে যদি সাধুর ভুবনে।
প্রণাম করিয়া সাধু বসাল আসনে[১]॥
সুবাসিত জল দিল তাম্বুল চন্দন [২]।
ভক্তিভাব হয়্যা তারে চাঁদ বাণ্যা কন॥
বণিকের কুলে মোর তুমি পুরোহিত [৩]।
শুভাশুভ চেষ্টা নিতে তোমার উচিত॥
আপনা ইচ্ছায় কর্ম করে যজমান।
পরকাল ডুবাইয়া বহু দুঃখ পান॥
পুরোহিত হয়্যা যদি কুকর্মে চলান।
সেই দোষে অন্তকাল গতি নাই পান॥
জনার্দন বলে যে বলিলে সদাকর।
সত্য বটে এই কথা সংসার ভিতর॥
বিভা যোগ্য বর মোর ঘরে লক্ষীন্দর[৪]।
বিভার কারণে কন্যা দেখ দ্বিজবর॥
পুত্রযোগ্য কন্যা হবে কুলে হবে ধনী।
দুই কুল শুদ্ধ হবে অকলঙ্ক মানি॥
সম্বন্ধ নির্ণয় করি আইস দ্বিজবর।
আবাহন করে সাধু দিলেন অম্বর॥
চান্দের আদর দেখি জনার্দন দ্বিজে।
শুভযাত্রা করিয়া চলিল শুভকার্যে॥

১ পাঠান্তর—আসন ২ পা—বণিকের কুলে তুমি কুল পুরোহিত ৩ পা—চাঁদ বাণ্যা বলে তবে শুনহ উত্তর ৪ পা-বিভা যোগ্য মোর ঘরে লক্ষীন্দর বর।

মনসার মায়া হৈল দ্বিজের উপর।
প্রথমে চলিয়া গেল নিছানি নগর॥
সেই নগ্রে ঘর করে বণিক বিস্তর।
কুলে শীলে কম নহে সবে মাতবর॥
তার মধ্যে সায় বাণ্যা সাধুর প্রধান।
জনার্দন ভাবিয়া চলিল তার স্থান॥
কুল পুরোহিত দেখি সায় সদাকর।
আদর[১] করিয়া লইল ঘরের ভিতর॥
প্রণাম করিয়া দিল বসিবারে স্থল।
হেন কালে বেহুলা আনিয়া দিল জল॥
অষ্ট আভরণ সাজে বেহুলার গায়।
জনার্দন বলে সাধু জিজ্ঞাসি তোমায়॥
আমা অগোচরে কন্যা কারে দিলে দান।
পূর্বার্জিত ধর্ম নষ্ট করিলে নিদান॥
সায় বান্যা বলে আমি তোমার গোচরে।
কন্যা দান[২] কোথা দিব শুন দ্বিজবরে॥
হয়্যাছিল বাসনা মোর আনিতে তোমায়।
দৈববশে কৃপা করি আইলে এথায়॥
উদ্ধার কারণে তুমি কুল পুরোহিত।
কন্যা যোগ্য বর আন করিয়া চিন্তিত[৩]॥
জনার্দন ভাবি কহে শুন সদাকর।
বণিকের কুলে নাই কন্যা যোগ্য বর॥
উজানি নিছানি আর দেশ বর্ধমান।
কুলে শীলে অর্থে নাই তোমার সমান॥
ত্রিবেণী গঙ্গার কুলে হুগলী সহরে।
রূপে গুনে যোগ্য বর নাই কারো ঘরে।
সপ্তগ্রামে আছে মাত্র কাশী হালদার।
সপ্তদশ বৎসরের দু পুত্র তাহার[৪]॥

১ পাঠান্তর—আনন্দ ২ পা—বিভা আমি ৩ পা—করি আনহ ত্বরিত ৪ . পা—সপ্তম বৎসর দুই পুত্রক তাহার।

আস্থুয়া দেশে আর দেশ ভুরসিটে।
কন্যা যোগ্য বর সাধু কোথাও না ঘটে ॥
চম্পা নগ্রে আছে মাত্র চাঁদ সদাকর।
তোমার কন্যার যোগ্য তার ঘরে বর[১] ॥
পুরোহিত আমি তোমার তুমি যজমান।
মোর বোলে কন্যা দেহ লক্ষীন্দরে দান ॥
দুর্বাসা গোত্রের চান্দ জানে সর্বজন।
যেমন কন্যা তেমন বর[২] বিধির ঘটন ॥
পাত্র দেখি কন্যা দান করে যেই জন[৩]।
অশেষ পাতক নাশি বসে স্বর্গস্থান[৪] ॥
নাই পায় প্রাণী কিছু অপাত্রের ফল।
কূপজলে নষ্ট যেন হয় গঙ্গাজল ॥
মোর বোলে কন্যাদান দেহ লক্ষীন্দরে।
পরকালে পাবে কার্য কহিলু তোমারে ॥
সায় সদাকর বলে শুন জনার্দন।
অঙ্গীকার কৈলু যেবা বলিলে আপন ॥
ঘটসূত্রে ইহা যদি ঘটাইছে ধাতা।
লক্ষীন্দরে দিব কন্যা এ বোল সর্বথা ॥
যুক্তি করি জনার্দনে দিল পুরস্কার।
চম্পা নগ্রে আসি দ্বিজ বলে সমাচার ॥
কহিল সকল কথা চান্দের সাক্ষাতে।
সনকা আনন্দ হৈল পুত্রের বিভাতে ॥
কৌতুকে বঞ্চিল[৫] নিশি চান্দের ভুবনে।
প্রভাতে অনেক দ্রব্য সদাকর আনে ॥
সন্দেশের ভার করে বিবিধ প্রকার।
দধি মৎস নানা বর্ণে মিঠাইর ভার ॥
জন দশ ভার বহে সঙ্গেতে কিঙ্কর।
জনার্দনে লয়্যা চলে চান্দ সদাকর ॥

১ পাঠান্তর—সর্বগুণে পরিপূর্ণ তাহার কুমর ২ পা—যেন বর তেন কন্যা ৩ পা—সব
৪ পা—তরে ভবার্ণব ৫ পা—কৌতুক হইল।

জন দশ সঙ্গে লৈল বণিক প্রধান
পুত্রের সম্বন্ধ আশে চান্দ বাণ্যা যান
নিছানি নগর যথা সায়ের মন্দির।
প্রবেশ করিল সবে আনন্দ সুধীর॥
সায় সদাকর দেখি কৈল সম্ভাষণ।
কিঙ্কর যোগায় জল বসিতে আসন॥
মূল্য সায় দিল যদি কর্পূর তাম্বুলে।
নানা কথাবার্তা সাধু কহে কুতুহলে॥
সায় সদাকরে বলে বিপ্র জনার্দন।
চান্দ বাণ্যা তোমা ঘরে সম্বন্ধ কারণ॥
সায় বাণ্যা বলে মোর বাক্য অলঙ্খিত।
দ্বারে বন্ধু বসাইয়া কি জিগ্যাস তত্ব॥
কোষ্ঠীর বিচার করে দৈবগ্যেরে আনি।
লক্ষীন্দর বেহুলার পত্র দুইখানি॥
বেহুলা কোষ্ঠীতে দেখিল অমঙ্গল[১]।
সপ্তমেতে শণি রাহু অষ্টমে মঙ্গল॥
জানিল বিধবা কন্যা হবে অল্পকালে।
দেবতার[২] মায়া হৈতে কিছুই না বলে॥
মৈত্র মিলন আনি তার নাই ঘটে।
দেবতার মায়া হৈতে বলে ভাল বটে॥
বিবাহের দিন করে গ্রহ দেবতায়।
অগ্নিমণ্ডলে কন্যা দেখিবারে পায়॥
তথাপি দৈবগ্য কিছু না বলে বচন।
বলে দুই কোষ্ঠী হৈল সুমিত্র মিলন॥
সায় বাণ্যা বলে শুন চান্দ সদাকর।
লক্ষীন্দরে কন্যা দিব এ বোল আমার[৩]॥
বর কন্যা বিভা দেহ কিছু ঠেক নাই।
একমনে বিভা দেহ[৪] যা করে গোসাঁই॥

১ পাঠান্তর—লক্ষীন্দর বেহুলার কোষ্ঠী অমঙ্গল ২ পা—মনসার ৩ পা—বাক্য মোর স্থির
৪ পা—দান কর।

গুআ তুলসীর পাত দিল চাঁদ বাণ্যা।
বলে হস্তে তুল্যা দেঅ তব্ব যায় জানা ॥
সায় বাণ্যা বলে মোর চিত্তে নাই আন।
বাক্য দানে কন্যা দিলুঁ যাঅ নিজ স্থান ॥
জনার্দন বলে আছে সভাকার ঘরে।
গুআ তুলসীর কথা কহিলু তোমারে ॥
পণ্ডিতের কথা শুনি সায় বাণ্যা হাসে
গুবাক তুলসী চান্দে তুল্যা দিল শেষে ॥
বাজিল মঙ্গল শঙ্খ দিল হুলা হুলি।
হেন কালে বিষহরী শূণ্যে আইল চলি ॥
শ্বেতমাছি রূপ ধরি চান্দের মস্তকে।
অঙ্গে বস্যা বিপরীত বুদ্ধি দিল তাকে ॥
চান্দ সদাকর বলে শুনহে বেহাই।
এক কথা মনে হৈল কহিবারে চাই ॥
লুহার কলাই যদি সিজাইতে[১] পারে।
তবে পুত্র বিভা করাইব সে পুত্রীরে[২] ॥
আয়ো[৩] হাণ্ডি আয়ো[৪] সরা কাঁচা হবে খড়
সতী হৈলে সিজাইবে কথা কত বড় ॥
অসতী কন্যার ফলে মোর বংশ নাশ।
শুনিয়া সভাই হাসে কেহ করে ত্রাস[৫] ॥
সায় বাণ্যা বলে সাধু কথা বল মন্দ।
লোহার কলাই সিজে শুনে লাগে ধন্দ ॥
কন্যারে জিজ্ঞাসা কর বলে চাঁদ বাণ্যা।
না হইলে ঘরে যাই যত কথা জান্যা ॥
সায় বাণ্যা ঘরে যায় অসম্ভব শুনি।
অমলা বেহুলা ডাকি কহিল কাহিনী ॥
বিপরীত কথা শুনি কহিলেক যত।
আর কেহ বাণ্যা হইলে পাইত তার মত ॥

১ সিজাইতে—সিদ্ধ করিতে ২ পাঠান্তর—কন্যারে ৩ পা—কাঁচা ৪ পা—কাঁচা ৫ পা—সতী কন্যা হবে যদি না লাগে তরাস।

লোহার কলাই যদি কন্যা হৈয়া রান্ধে।
সেই কন্যা পুত্রে বিভা করাইবে চান্দে ॥
আয়ো হাণ্ডি আয়ো সরা কাঁচা হবে জাল।
সতী কন্যা হৈলে ইহা[১] রান্ধিবে তৎকাল ॥
বেহুলা বলেন বাপা নিবেদি চরণে।
রান্ধিব লোহার চুনা বিষহরী ধ্যানে ॥
অধর্ম বলিয়া আমি নাই জানি ভালে।
অন্যথা কলঙ্ক কি কারণে মোর কুলে ॥
সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যদি যাবে সদাকর।
অসতী বলিয়া মোরে ঘোষিবেক নর ॥
কহ গিয়া পিতা তুমি সভা বিদ্যমান।
লোহার কলাই কন্যা রান্ধিবে নিদান ॥
এত শুনি সায় বাণ্যা দিল সমাচার।
চান্দের আনন্দ মন সভে চমৎকার ॥
স্নান করিবারে এথা চলিল কুমারী।
বর্ণিল[২] দ্বারিকা দাস ভাবি বিষহরী ॥

চিন্তিয়া মনসা চরণতলে।
স্নান করিবারে বেহুলা চলে ॥
মধুর মুরতি গজেন্দ্র গতি।
পদ্মিনীর অংশে জন্মিছে সতী ॥
নানা পুশ্যে যুড়া[৩] বান্ধিছে শিরে।
মধু আশে কত[৪] ভ্রমর উড়ে ॥[৫]
কটাক্ষের ধনু ধর্যাছে ভলে।
মুনি মন[৬] দেখিলে টলে ॥
সুরঙ্গ সিন্দুর ভাউরী মাঝে।
নাসা নথ * * * রাজে ॥

১ পাঠান্তর—হৈলে ইহা সেহ ২ পা—রচিল ৩ যুড়া—কেশগুচ্ছ ৪ পা—মত্ত
৫ পা—ফিরে ৬ পা—মুনিজন মতি।

তাহাতে বেসর উপরে মতি।
হিমাদ্রিতে যেন গঙ্গার গতি[১] ॥
ওষ্ঠ বিম্বফল পক্ক হরে।
নক্ষত্র লম্বিত গলার হারে ॥
উজ্জল খঞ্জন[২] নয়ান দেখি।
আতঙ্ক করিল[৩] চন্দ্রমা মুখী ॥
শ্রবণে কুণ্ডল সুন্ডল[৪] সাজে।
পরিধান নেত অঙ্গের মাঝে ॥
সিংহ জিনি কটি বেড়িয়া ভালে।
রসনা বাজিছে পঞ্চম তালে ॥
উরু দেখি তরু রম্ভার লাজে।
নূপুর সুস্বর চরণে বাজে ॥
অঙ্গুলে পাসুলি যাবক তায়।
সরোবরে রামা চলিয়া যায় ॥
বিড়ম্বিতে দেখ মনসা তারে।
উপনীত হৈল সে সরোবরে[৫] ॥
ধরি জরা তনু ব্রাহ্মণী বুড়ী।
ঘাট মধ্যে[৬] মাতা বসিলা মাড়ি ॥
ঝুলে মাংস গায় পাকিছে কেশ।
দন্ত নড়বড় কর্কশ বেশ ॥
গগনে দেখিল অত্যন্ত বেলা।
দ্রুতগতি হয়্যা চলিল বালা ॥
ঘাটে প্রবেশিতে দেখিল বুড়ী।
অর্দ্ধ পথ মাতা বসেছে মাড়ি[৭] ॥
বেহুলা চঞ্চল কার্য্যের তরে।
ঝাঁপ দিয়া জলে পড়িল খরে ॥
চরণের জল বিস্তার হৈয়া।
লাগে মনসার শরীরে গিয়া ॥

১ পাঠান্তর—কনক কুণ্ডল শোভিত জ্যোতি ২ পা—অঞ্জন ৩: পা—অপাঙ্গে কজ্জল
৪ পা—সুবর্ণ ৫ পা—মায়া করিল কি ঘাটের নীরে ৬ মধ্য ঘাটে ৭ মাড়ি অধিকার করে।

ক্রোধে থরহর ভুজঙ্গ মাতা।
বেহুলারে বলে শুনলো কথা॥
যৌবনের ভরে না চিনি কারে।
চরণের জল সিঞ্চিলে মোরে॥
জাতিতে ব্রাহ্মণী তায়েতে বুড়ী।
উঠিতে না পারি হারায়্যা নড়ি॥
ধর্ম বিনাশিয়া অর্জিলি পাপ।
আপনার দোষে নেহলো শাপ॥
বাসর ঘরেতে বিভার রাতি।
অনাথিনী হবে হারায়্যা পতি॥
নিমিষে রান্ধিবে লোহার চণা।
ধাতার সংযোগ কে করে মানা॥
বেহুলা সুন্দরী চকিতে চায়।
দেখিল মনসা নাহি তথায়[১]।
জানিল সুন্দরী কে কৈল মায়া।
পারিল বুঝিতে বুড়ী নিদয়া॥
বিষাদে সুন্দরী সারিল স্নান।
হৃদে বিষহরী করিয়া ধ্যান॥
মনসার মন্ত্র জপিল হৃদে।
অষ্টোত্তর শত মনের খেদে[২]॥
তুষ্টি কৈল রামা দু করপুটে।
বিসর্জন দিয়া কূলেতে উঠে॥
প্রবেশিল ঘরে হৈয়া বিমনা।
আনাইল হাণ্ডি লোহার চণা॥
জলেতে কলাই মিশায়্যা ঢালে।
বিষহরী চিন্তি আনল জ্বালে॥
কাঁচা জ্বালে অগ্নি ধরিল দৃঢ়ে।
প্রলয়ের অগ্নি জ্বলিয়া বেড়ে॥

১ পাঠান্তর—দেখিতে দেখিতে মিলায়্যা যায় ২ পা—নাম অষ্টোত্তর শতেক পদে।

ধ্বংস হয়্যা গেল লোহার চণা।
স্থপাকে কলাই হেল সিজনা॥
দেখিয়া চকিত সভার মতি।
জনার্দন তারে সন্তোষ[১] অতি॥
বলে পৃথিবীতে এ সতী কন্যা।
ভুবন পবিত্র করিল ধন্যা॥
চান্দ সদাকর আনন্দ মন।
দিল নানা রত্ন রসন দান॥
কৌতুকে বিদায় মাগিল সভে।
সায়ে কোল সাধু দিলেন তবে॥
জনার্দন আদি সভাই মিলি
চঁপা নম্র মুখে গেলেন চলি॥
উপনীত সাধু আপনা পুরে।
বিপ্রে তুষ্ট কর্যা পাঠাল ঘরে॥
সনকা আনন্দ শুনিয়া অতি।
করজোড়ি কহে স্বামীর প্রতি॥
প্রাণে ডর মোর নিকটে বিভা।
না জানি মনসা করেন কিবা॥
চান্দ বাণ্যা বলে কি তারে ডরি।
দেখা পাল্যে প্রাণে ধরিয়া মারি॥
যত দুঃখ দিয়া আছয়ে মোরে।
হেন্তালের বাড়ি তাহার তরে॥
ভাঙ্গিব পাঁজর পাইলে দেখা[২]।
সতে কি আমারে ভেটিবে একা॥
সাতালি পর্বতে বাসর করি।
পুত্র বধূ তাতে রাখিব পুরি॥
না রাখিব সন্ধি লোহার ঘরে।
পিপীলিকা যেন যাইতে নারে॥

১ পাঠান্তর—প্রশংসে ২ পা—ধরি চেঙ্গমুড়ি যদি পাই দেখা।

বিভা রাত্রে যাইতে না পারে যবে।
কানির বিবাদ ঘুঁচিবে তবে ॥
বলিতে কহিতে নিশেষ নিশি।
ভোজন করেন প্রভাতে বসি[১] ॥
বিশ্বকর্মা স্বর্গে জানিল ধ্যানে[২]।
নানা অস্ত্র সঙ্গে উরিল শূণ্যে
মগ্ন করি চিত্ত মনসা পায়।
দ্বারিকা দাসেতে সঙ্গীতে গায় ॥

ত্রিপদী

জন চারি সঙ্গে করি তেজিয়া অমরাপুরী
বিশাই চলিল ভূমণ্ডলে।
সঙ্গে অস্ত্র থরসান পাওরা[৩] কত নিহান[৪]
অতি বৃদ্ধ তনু ধরি চলে ॥
চান্দ সদাকর দ্বারে বসিয়া ভাবনা করে
হেন কালে বিশাই গমন।
দেখি চান্দ সদাকর ডাকি আনে কারিকর
জিগ্যাসে সকল বিবরণ ॥
বলে শুন কারিকর কুন দেশে কর ঘর
জান কি বাসর বানাইতে।
লোহার তুলিবে ঘর সাতালি পর্বত পর
বলে তুষ্ট করিব তুমাতে ॥
না থাকিবে তার সন্ধি পবন হইবে বন্দী
সঙ্কটে জানিবে লোহা বাস।
চিকি চিকি লোহার ঝঙ্কারে।

১ পাঠান্তর—ভোজন করিল ঘরেতে আসি ২ পা—ভাবে সদাকর বাসর কার্যে। কারিগর হেতু হৃদয় মাঝে ॥ স্বর্গে.বিশ্বকর্ম্মা জানিল ধ্যানে। স্তুতি করি মনে উরিল শূণ্যে ৩ পাওরা—হাতুড়ী ৪ নিহান—কাঠ কাটার অস্ত্র বিশেষ

অপূর্ব বসন ধন দিব নানা আভরণ
জান যদি করহ প্রকাশ ॥
কহে বিশ্বকর্মা তারে শুনহ বণিকবরে
কত বড় লোহার বাসর।
জন্ম মোর দেব অংশে যাই আমি সর্ব দেশে[১]
আমা সম নাই কারিকর ॥
আন দেখি মোর কাছে কত মন লোহা আছে
কোন থানে বানাবে বাসর।
মানস পূরণ করি যাব আমি যক্ষপুরী
বিলম্ব না সহে সদাকর ॥
শুনিয়া সাধুর মন আনন্দে পুলক ঘন
সাতালি পর্বতে দিল স্থান।
সাত লক্ষ সাত মন লোহা দিল ততক্ষণ
চাঁদ বাণ্যা বড় ভাগ্যবান ॥
প্রশংসিল কারিকর ধন্য বটে সদাকর
যেই দ্রব্য মাগে সেই পায়।
বিশ্বকর্মা পাতে শাল[২] অগ্নি উঠে সাত তাল
অস্ত্রাঘাতে লোহারে গলায় ॥
কেহ পিটে কেহ গড়ে কেহবা বাসর জুড়ে
কেহ কেহ চিত্র করে তায়।
প্রবাল মুকুতা চুনি দেয় সদাকর আনি
বিশ্বকর্মা জুড়য় তাহায় ॥
উৎসর্গে[৩] তিরিশ হাত এক সম লোহা পাত
অষ্ট হাত আড় পরিসর।
চল চল চারি চাল বিশাই দিলেন ভাল
ভাল কৈলা লোহার বাসর ॥

* * * *[৪]

১ পাঠান্তর—যাই সর্ব দেশে দেশে ২ শাল—কামার শাল ৩ উৎসর্গে—উচ্চতায় ৪ পা—
৪ পা—চিকি চিকি লোহা জ্যোতি, নানা চিত্র লেখে তথি দেবতা গন্ধর্ব আদি করে

ইন্দ্রের অমরাবতী নির্মাইল এক রাতি
অমর করিল পুরন্দরে ॥
কৈলাস বৈকুণ্ঠ পুরী নির্মাইল অন্ত্র ধরি
আর যত দেবতার ঘর।
তবু দুঃখে যায় দিন জন্ম হৈতে কর্মহীন[১]
শুন ধনী সাধু সদাকর ॥
পরিযত্ন করি অতি ত্রিশোভিত নানা ভাঁতি[২]
দ্বারে দিল লোহার কবাট।
বেড়ি উচ্চ সেই স্থলে করাতে কাটিয়া ফেলে
নাই রাখে পবনের বাট ॥
দেখি প্রাণী মোহ যায় নাচি * * তায়
দেবতা গন্ধর্ব আদি করি।
পৃথিবীতে সুদুর্লভ বিশাইর অনুভব
মনুষ্যে কি সীমা দিতে পারি ॥
ঝলকে কলস বারা[৩] হেটে লম্বাইয়া ঝরা
ঝিলিমিলি করে অনুক্ষণ।
অস্থির পবন উড়ে বাসরের চারি বাড়ে[৪]
নানা রত্নে করে বিভূষণ ॥
পূর্ণ কৈল বাস ঘর সুখী হৈল সদাকর
নানা ধন দেয় হরষিতে।
বসন ভূষণ শত আভরণ[৫] দিল কত
চান্দ বাণ্যা সুখী হয়্যা চিতে ॥
বাসর নির্মান করি চলিল অমরা পুরী
বিশ্বকর্মা মাগিয়া বিদায়।
কতদূরে চলে যায় দ্বারিকা দাসেতে গায়
ক্রোধভরে বিষহরী ধ্যায় ॥

১ পাঠান্তর—দশাহীন ২ ভাঁতি—প্রকার ৩ বারা—বারিপূর্ণ ঘট ৪ বাড়ে—দিকে
৫ পা—অলঙ্কার।

জয় জয় বসুমাতা জয় বিষহরী।
উরহ আসরে মোর শান্তি মূর্তি ধরি॥
অহঙ্কারে মগ্ন জীব ধরে অল্প জ্ঞান।
সর্বদা করিও দয়া চিন্তিয়া কল্যাণ॥
ক্রোধ কৈলে সংসার নাশিতে পার হেলে।
অশেষ সঙ্কটে তরি তুমি কৃপা কৈলে॥
অশেষ পাপের পাপী[১] হয়্যাছি পাতকী।
যদি পার বাঞ্ছা পূরণ নিবেদন রাখি॥
বাসর বানায়্যা এবে[২] বিশ্বকর্মা যায়।
ধ্যানেতে জানিয়া কাঁপে বিষহরী মায়॥
নয়ন অরুণ হৈল অঙ্গ থরহর।
ক্রোধভর হৈয়া দেবী রথে দিল ভর॥
অষ্ট নাগ সঙ্গে দেবী লইয়া সত্বর।
মধ্য পথে আগুলিল যত কারিকর॥
মাতা বিষহরী কয় যাও কোথাকারে।
পরের বিবাদ লয়্যা আপনার শিরে॥
সগোষ্ঠী সহিতে যদি বাঁচাইবি প্রাণ।
পুনরপি চঁপানগ্রে কররে[৩] নিদান॥
চান্দ বাণ্যা মোর সাথে কর্য়াছে বিবাদ।
বাসঘরে বিভারাত্রে পড়িবে প্রমাদ॥
ডঙ্কঘাতে[৪] বিভারাত্রে তাহার কুমর।
শূণ্য পথে যাবে সর্প না থুলে সঞ্চর॥
বিভারাত্রে তার পুত্রে রাখে কোন জন।
দেবতা অসুর নর আদি ত্রিভুবন[৫]॥
বন্দী কৈলি মোর সর্প পথ নাই যাইতে।
চান্দের বিবাদ জানি হৈল মোর সাথে॥
চরণে পড়িয়া তবে বিশ্বকর্মা বলে।
পূর্বে কেন আগ্যা মাগো মোরে না করিলে॥

১ পাঠান্তর—দোষেতে দোষী ২ পা—তবে ৩ পা—ফিররে ৪ ডঙ্ক—সাপের ছোবল
৫ পা—দেবতা মানুষ আর এ তিনি ভুবন।

কেমনে যাইব তথা হইয়া[১] বিদায়।
জিগ্যাসিলে পুনর্বার কি কহিব তায় ॥
মনসা বলেন যদি না যাইবে ফিরি।
বংশরক্ষা না হইবে হৈলে দোষকারী[২] ॥
পুনর্বার ফিরি যাঅ লোহার বাসরে।
ঈশানে রাখিঅ পথ সুতার সঞ্চারে ॥
উভয় সঙ্কটে বিশাই চিন্তিল বিস্তর।
পুনর্বার ফিরি যায় চম্পার নগর ॥
চাঁদ বাণ্যা বলে কেন কর আগমন।
বিশ্বকর্মা বলে শুন করি নিবেদন[৩] ॥
একখানি অস্ত্র ভেল[৪] লোহার বাসরে।
লোহার সলাকা এক লৈল বাম করে[৫] ॥
ঈশানের কোণে মারে হাতুড়ীর ঘা।
সুতার সঞ্চারে হৈল পবনের বা ॥
আচ্ছাদিয়া থুইল পথ ঘসিয়া আরবার[৬]।
ধর্ম্ম সাক্ষ করে বিশ্বকর্মার বাহার[৭] ॥
ঘরে গেল বিশ্বকর্মা হৈয়া বিদায়।
সুতার সঞ্চারে দেখ পথ করি তায় ॥
মনসা যায়েন তবে আপনার স্থানে।
তবে শুন মনসা মঙ্গল একমনে ॥
নৃত্য গীত বাদ্য বাজে চান্দের ভুবনে।

* * * *   * * * *

শুভক্ষণে লগ্ন কৈল চান্দ সদাকর।
নিমন্ত্রণ গুআ দিল বণিকের ঘর ॥
আদরে পাঠায় গুআ ভব্য[৮] লোক আনে।
নানা অঙ্গ রস সব চাঁদের ভুবনে ॥

১ পা—মাগো হয়্যাছি ২ পা—মোর বৈরি ৩ পা—কহি বিবরণ· ৪ পা—রৈল
৫ পা—চান্দ বলে অস্ত্র কেবা পারয়ে ধরিতে। লোহা গিয়া অস্ত্র ভাই কহিনু সাক্ষাতে ॥
বিশাই প্রবেশ হৈল লোহার বাসরে। লোহার সলাকা এক লৈল বাম করে ৬. পা—আবার
৭ পা—ধর্ম্ম স্মরিয়া বিশাই হইল বাহার ৮ পা—বন্ধু।

নানা উপহার করে ভক্ষিবার তরে।
ভব্যলোক যত সব আনিল তাহারে ॥
পোতিলা রম্ভার গাছ নগরের মাঝে।
তোরণ বান্ধিল[১] গ্রামে সুমঙ্গল কার্য্যে ॥
মঙ্গল মহুরি বাজে শঙ্খ[২] করতাল।
ঢাক ঢোল কত বাদ্য শুনিতে রসাল ॥
নিমন্ত্রণ পায়্যা আসে যত বন্ধুগণ।
প্রথমে আসিয়া দেখা দিল জনার্দন ॥
জন সাত[৩] শিষ্য সঙ্গে রাজীব[৪] পণ্ডিত।
উজানীর বাণ্যা আসে তাহার সহিত ॥
যাদব আসয়ে হরি অনন্ত শ্রীধর।
গোবর্দ্ধন গোপীনাথ গজেন্দ্র ভাস্কর ॥
রাজীবলোচন রাম রঘুনাথ দাস।
হরিদাস বাসুদেব আর শ্রীনিবাস ॥
উজানীর বাণ্যা আইল সাতশ পঞ্চাশ।
কাজলা তেজিয়া আসেন বিম্বাধর দাস ॥
লঙ্ঘিতে না পারে বাণ্যা নিমন্ত্রণ গুআ।
রামকুণ্ড বাণ্যা আল্য তেজিয়া আগুয়া ॥
সপ্তগ্রাম তেজি আসে কাশী হালদার।
ধনে জনে যশে অতি[৫] প্রতিষ্ঠ তাহার ॥
জয়রাম জগদীশ আর জগন্নাথ।
মুরারি মুকুন্দ আইসে মহেশের সাথ ॥
বর্ধমান হইতে আইসে বাণ্যা রাম রায়।
কংশারি কিশোর বিষ্ণু তার সাথে যায় ॥
গৌরাঙ্গ গোকুল চলে গোবিন্দ গোপাল।
দামোদর দিবাকর দৈতারি দয়াল ॥

১ পাঠান্তর—বান্ধই ২ পা—কংশাল (কাঁসর) ৩ পা—তিনশত ৪ পা—রাজার
৫ পা—আদি।

পার্বতী পরানবাস মধুব্রত আদি।
চলিল বণিক সব * অবধি॥
চাতরার বাণ্যা মাত্র আইল পাঁচ ঘর।
হুগলীর বাণ্যাগণ চলিল বিস্তর॥
লালচান্দ শ্যামানন্দ দুই সহোদর।
ভরত ভগত আইল ত্রিবেণীতে ঘর॥
রাম সাহা বাণ্যা চলে তুরসিট ছাড়ি।
শঙ্কর সর্বেশ্বর আইল নিছানিতে বাড়ী॥
নরোত্তম নরহরি নৃসিংহ নারায়ণ
ভগবান ভগীরথ ভীম সনাতন [১]॥
বালিয়ার বাণ্যা মাত্র আইল চারি ঘর
চান্দের মন্দিরে হৈল বণিক গুমর॥
এগার হাজার আর সাতাশ পঁচাশ॥
যুক্তি করে বাণ্যা সব এক আর পাশ॥
আইল ব্রাহ্মণ ভাট নাই তার লেখা।
নানা স্থানে ভিক্ষুক আসিয়া দিল দেখা॥
কথা নাই শুনা যায় লোকের চহলে [২]।
না হইছে হেন [৩] বিভা বণিকের কুলে॥
ভাগ্যবান চাঁদ বাণ্যা কুলের ঈশ্বর।
না হৈলে কি ইন্দ্রসুত তাহার কুমর॥
দিব্য জল স্থল সাধু দিল জনে জনে।
মিষ্টা অন্নে তুষ্ট করে বিপ্র বন্ধুগণে॥
নর্তক নাচয় গায় শত শত গীত।
বিভা ঘরে আনন্দিত সভাকার চিত॥
ভোজন করিল রাত্রে[৫] যত বাণ্যাগণ।
প্রভাতে উদয় হৈল সহস্র কিরণ[৬]॥

১ পাঠান্তর—হালিসহর হইতে বাণ্যা যত সব যান ২ পা—শব্দ কোলাহলে ৩ পা—এমন না হৈয়াছে ৪ পা—পরম আনন্দ হয় ৫ পা—সুখে ৬ পা—লোচন।

সমাচার পাঠাইল নিছানি নগর।
বিভাকে আসিবে বর অধিবাস পর॥
স্নান করি আধিবাস দুই জনে যায়[১]।
মনসা মঙ্গল গীত কবিরাজে গায় [২]॥

রাগ মঙ্গল

ত্রিপদী

আনন্দে ভয় ভাসে বেহুলার অধিবাসে
সঘনে দেয় হুলাহুলি।
ব্রাহ্মণ বেদ উচারি আসন শুদ্ধ করি
আনন্দ স্তুতি বিপ্র বলি॥
গণেশ রুদ্র হরি[৩] শিবেরে পূজা করি
দুর্গায় করি আবাহন।
মৃত্তিকা গন্ধ শিলি বেদোক্ত মন্ত্র বলি
কপালে কৈল বিভূষণ॥
নগ্রের নারী যত ধাইল শত শত
রূপেতে[৪] প্রকাশে বিজুলি।
দিবস দণ্ড দশে মঙ্গল অধিবাসে
বেদোক্ত মন্ত্র দ্বিজ বলি॥
ধান্য দুর্বাঙ্কুরে দিল দ্বিজবরে
হরিদ্রা দিলেন জনার্দন[৫]।
সিন্দুর বিন্দু তাতে রঞ্জিল কপালেতে
গন্ধ সোহামণি[৬] রোপন॥
বাজিছে অশেষ বাজনা।
কামিনী সব মিলি করেন কোলাহলি
মিলিয়া সব নারীগণা॥

১ পাঠান্তর—হয় ২—কবিরাজ ঘোষে কয় ৩ পা—গণেশে আদর করি, তবে শিব পূজা করি ৪ পা—রূপে যেন ৫ পা—দর্পণ ৬ সোহামণি<সোহাগমণি—সিঁথি।

বিচিত্র চিত্র তাল দিলেন[১] পুষ্পমাল
কেশেতে বেহুলার লয়্যা।
দিলেন ফল দধি অধিবাস যথাবিধি
গোরচনা দিল লয়্যা।
বিচিত্র অনেক হু করে দিল শঙ্খ
অপাঙ্গে দিলেক কজ্জল।
* * * দিলেক দ্বিজবরে
শ্রবণে সুচারু কুণ্ডল॥
প্রশস্ত পাত্র আদি করিল জয় বিধি
আনন্দে সায় সদাকর।
ষোড়শ উপচারে মাতৃকা পুজা করে
নান্দিমুখী তার পর॥
পূজিল বট বারা দিলেত বসুধারা
বান্ধিল অক্ষসূত্র[৩] হাতে।
অঙ্গনা সবে মিলি দিলেন হুলাহুলি
করিল কত সুখ চিতে॥
চলিল দ্বিজবর যেখানে লক্ষীন্দর
কন্যার অধিবাস করি।
বরের অধিবাস করিল সুপ্রাশ
আনন্দ চান্দ অধিকারী॥
মহি গন্ধ আদি করিল সর্ব বিধি[৫]
নান্দিমুখ আদি যত।
প্রশস্ত করি গাত্র বান্ধিল অক্ষসূত্র
গৌরীর বিবাহের মত॥
আনন্দে সভে মগ্ন করিয়া শুভ লগ্ন
বরের যাত্রা করাইল।
একে সে লক্ষীন্দর সর্বাঙ্গে মনোহর
বিশেষে শোভা তায় হৈল॥

১ পাঠান্তর—বান্ধিল ২ পা—স্বস্তিক সিন্দুর দিয়া ৩ পা—মঙ্গলসূত্র ৪ মহি—মৃত্তিকা (গঙ্গা মৃত্তিকা ৫ পা—সর্বসিদ্ধি।

অগুরু চন্দন সর্বাঙ্গে[১] লেপন
স্ববর্ণের কণ্ঠমালা গলে।
মুকুট শিরে আনি দিলেন[২] দ্বিজমণি
পরাল বস্ত্র স্থনির্মলে॥
নিশেষ হৈল বেলা চাপিয়া দিব্য দোলা
চলিল বালা লক্ষীন্দর।
অসংখ্য লোক সাথে চলিল চারি ভিতে[৩]
দেখিতে সভে কন্যা বর॥
অপূর্ব ভূমি মাঝে অসংখ্য বাজা বাজে
চলিল চাঁপা নগ্র বেড়ি।
দ্বারিকাদাস বলে রাখিবে[৪] পদতলে
দয়া কর দোষ পরিহরি॥

পয়ার

মনসা মানস পূর্ণ কর সভাকর।
স্বর্গ মর্ত রসাতল কারণ যাহার॥
তোমার সেবক যত ধইল ত্রিভুবন।
পড়িলে তোমার ক্রোধে বাঁচে কোনজন॥
চিন্তহ প্রাণীর স্থখ[৫] শান্তিরূপ ধরি।
উরিবে আসরে মোর কৃপাদৃষ্টি করি॥
জলে স্থলে থাক কিবা আপনার বাসে।
স্মরণে করিবে দয়া করি নিজ দাসে॥
নাহি জানি ছন্দ তাল পয়ার প্রবন্ধ।
ভরসা কেবল তব চরণারবিন্দ॥
তবে লক্ষীন্দর দেখ বিভা হৈতে যায়॥

১ পঠান্তরে—করিয়া ২ পা—বান্ধিল ৩ পা—অবিরতে ৪ পা—মনসা ৫ কুশল চিন্তিবে প্রাণীরা

শিরে ছত্র ধরে কেহ চামর ঢুলায় ॥
চাঁপা নগ্র গ্রাম হৈতে নিছানি নগর।
লাগিল বণিকের ভিড় যেমন নস্কর ॥
দুপাশে জ্বালিল অগ্নি আড়া থরে থর।
তার মধ্যে নৃত্য করে কত নৃত্যকার ॥
হাবাই[১] চরকা[২] ছাড়ে আর ছুচন্দরী[৩]।
ভুঁইচাঁপা[৪] দিবাকে কৈল দিবস শর্বরী ॥
পেটরা পুরিয়া গেল সাতশ পঁচাশ।
জনবর কোলাহল অগ্নির প্রকাশ[৫] ॥
কেহ কেহ জলে দিয়া ভাসায় কুম্ভীর।
ঝুমুরা বন্দুক শব্দ উঠিল গম্ভীর ॥
মেষযুদ্ধ দেখে কেহ লোটায় লোটন[৬]।
চন্দ্রদীপ[৭] লক্ষ লক্ষ জ্বালে বাণ্যাগণ ॥
অগ্নিবৃষ্টি হৈতে হৈল তিমির বিনাশ।
দেবের দুর্লভ সুখ ভুবন প্রকাশ ॥
আনন্দের সীমা নাই কেহ দিতে পারে[৮]।
প্রবেশ হইল গিয়া নিছানি নগরে ॥
পথঘাট আচ্ছাদিল মনুষ্য সকল।
নিছানি নগরে মাবে না রহিল স্থল ॥
প্রবেশ হইল বর বেদীর নিকটে।
হাতে মালা জল ধরি সায় বাণ্যা উঠে ॥
বিষ্ণুভাবে মালা দিল জামাতার গলে।
চরণে ঢালিয়া জল ধরিল অঙ্গুলে ॥
বসাইল পূর্বমুখে লক্ষীন্দরে আনি।
বরণ করিয়া দিল বস্ত্র[৯] দুইখানি ॥
সুবর্ণ অঙ্গুলি[১০] দিল নানা আভরণ।
বসিয়া করেন বাক্য বিপ্র জনার্দন ॥

১ হাবাই—হাউই ২, ৩, ৪ বিভিন্ন ধরণের আতস বাজী ৫ পাঠান্তর—অগ্নির সংযোগে হইল চন্দ্রের প্রকাশ ৬ লোটন—ঝুঁটি ওয়ালা পায়রা ৭ পা—চান্দ্রদায়—ওড়িয়া শব্দ 'চন্দ্রউদীয়া'র অপভ্রংশ ৮ পা——আনন্দের সুখ যত কে কহিতে পারে। ৯ বস্ত্র ১০ অঙ্গুরীয়।

সায় বাণ্যা সুখী বড় দেখি লক্ষ্মীন্দরে।
জিনিছে কন্যার রূপ মোহে সভাকারে ॥
স্ত্রীআচার করিবারে দিয়া হুলাহুলি।
অন্তঃপুরে লৈল বর নারীগণ মিলি ॥
গজেন্দ্রগামিনী রামা বেহুলা সুন্দরী।
অষ্ট আভরণ সাজে যেন[১] বিদ্যাধরী ॥
বিভাদিনে সাজ তার হয়্যাছে প্রচুরে।
যোগীন্দ্র মুণীন্দ্র দেখি ধৈর্য ধরে বরে[২] ॥
চতুর্দিগে বেড়ি আছে যতেক অবলা।
হেনকালে মধুবর্গ[৩] আনিল অমলা ॥
ঢালিল চরণে দধি অমলা সুন্দরী।
মধু কর্পূর মুখে দিল[৪] জামাতারে হেরি।
বরণ করিল ভাল জানে সর্বজন।
হেন কালে কন্যা আনে করিতে বরণ ॥
প্রদক্ষিন বেহুলা করিল সাতবার।
বরণ করিল যেবা ছিল দ্রব্যভার[৫] ॥
ছামানি বদল কৈল দুজনার হাতে।
পুন পুন মালা দুহ দিলেন গলাতে ॥
স্ত্রীআচার সাঙ্গ হৈল কন্যা গেল ঘর।
লক্ষ্মীন্দর আল্য পুন বেদীর উপর ॥
পুনর্বার কন্যা আনে সভার ভিতর।
কন্যা পাশে করি সঁপে[৬] সায় সদাকর ॥
গোত্রের প্রবর আদি করে বিচারণ।
উভয় কুলের বাক্য করে জনার্দন ॥
দেশ কাল বাক্য করে শাস্ত্র অনুসারে।
বিষ্ণুপ্রীতে কন্যাদান সায় বাণ্যা করে ॥

১ পাঠান্তর—জিনি ২ পা—ধৈর্য করে দূরে ৩ মধুপর্ক—ঘৃত মধু দধি দুগ্ধ শর্করা মিশ্রিত নৈবেদ্য ৪ পা—ওঠে দিল ৫ পা—যেবা ছিল সে বেভার ৬ পা—বসে গিয়া।

জনার্দন হুহাকার কুশে বাঁধে হাত।
দক্ষিণা নিমন্তে[১] জনার্দন ফেলে কুশপাত ॥
কন্যাশিরে বর দিল তুলিয়া বসন।
কন্যা বরে হৈল তবে একত্রে মিলন ॥
কন্যা বরে করে তবে একই আসিন।
হরগৌরী মত করে বিভার বন্ধন ॥
বামভিতে বৈসে গিয়া বেহুলা সুন্দরী।
স্বর্গ হৈতে আইল যেন কিন্নর কিন্নরী ॥
অনিমিষে কন্যা বর দেখে সর্ব নরে।
ভুবন মোহন রূপ নয়ানে না ধরে ॥
লয্যা[২] হোম দুইজনার হৈল সেই ঠাঁই।
অনল জ্বালিয়া দিল বেহুলার ভাই ॥
লয্যাহোম কালে অগ্নি ফেরিয়া বেড়ান।
বিধবা হইবে কন্যা জানিল সুগ্যান ॥
লক্ষীন্দর বেহুলার বিবাহের সুখ।
শূণ্যে থাকি বিষহরী দেখেন কৌতুক ॥
চিন্তিল মনের মধ্যে দেবী বিষহরী।
অল্প রাত্র পুহাইলে কি করিতে পারি ॥
সূর্যে আগ্যা[৩] কৈল মাতা চিন্তিয়া হৃদয়।
তিনি দিন তিনি রাত্র না হবে উদয় ॥
আমার বিনয় রাখ শুন[৪] দিনকর।
আচ্ছাদনে যাও[৫] তুমি গগন উপর ॥
লক্ষিতে না পারে যেন পৃথিবীর জন।
রাত্রসম হউ দিন রাখ নিবেদন ॥
মনসার বাক্য সূর্য করিল স্বীকার।
কেহ নাই জানে রাত্র দিন একাকার ॥
বরকন্যা পুশ্য[৬] ঘরে করিল গমন।
পরম আনন্দ দেখি অমলার মন ॥

১ নিমন্তে—জন্যে ২ লয্যা—লাজ (খই) ৩ পাঠান্তর—স্তব ৪ পা—বিনতি রাখ তুমি
৫ পা—উদয় না হবে ৬ পুশ্য—পুষ্প।

পায়েস পিষ্টক পুরি[১] সুবর্ণের থালে।
জামাতা কন্যায় আনি দিল এককালে ॥
সরস করিয়া দোঁহে কৈল আচোমন।
কর্পূর তাম্বুলে কৈল মুখের শোধন ॥
এথা চান্দ বাণ্যা ডাকে সায় সদাকরে।
বলিতে লাগিল কিছু সভার ভিতরে ॥
শুনহে বেহাই তুমি আমার বচন।
কন্যাবর লয়্যা রাত্রে যাব নিকেতন ॥
সায় সদাকর বলে কহ বিপরীত[২]।
বিভারাত্রে কন্যাবরে নিতে কি উচিত ॥
চান্দ বলে বাদ মোর মনসার সনে।
বিভারাত্রে ছয় পুত্রে মরিল দংশনে ॥
কানি চেঙ্গ মুণ্ডি দুঃখ দেয় নানা ছলে।
সাত ডঙ্গা[৩] ডুবাইল সমোদ্রের জলে ॥
তে কারণে বাসঘর সাতালি পর্বতে।
পুত্র বধু খুব সন্ধি নাই তায় যাতে ॥
সভে দেঅ অনুমতি দিতে পাঠাইয়া।
পরিণামে পাবে দোষ রাখ কি লাগিয়া ॥
সত্য কথা হৃদয়ে ভাবিল সায় বাণ্যা।
অঙ্গীকার কৈল পাঠাইবে বর কন্যা[৪] ॥
দোলা সাজ করি চান্দ রহিল দুআরে।
লোকে পাঠাইয়া দিল আনিতে কন্যা বরে[৫] ॥
ঘরে গিয়া অমলারে কহিলেন সায়।
বর কন্যা চান্দ রাত্রে লয়্যা যাতে চায় ॥
মনুষ্য হইয়া করে মনসারে বাদ।
না জানি বিধাতা কিবা করেন প্রমাদ ॥
বিভারাত্রে ছয়পুত্র মর্যাছে তাহার।
শুনিয়া লাগিল ত্রাস হৃদে চমৎকার ॥

১ পাঠান্তর—ক্ষীরখণ্ড আনি দিল ২ পা—উচিত বিচার নহে সহস্রের মত ৩ পা—ডঙ্গা
৪ পা—দিতে পাঠাইয়া বর কন্যা ৫ পা—দুহারে।

অমলা রোদন করে বেহুলারে আনি।
তেজিয়া আমার কোল যাবেরে নন্দিনী[১] ॥
বিপরীত শুনি তাহে স্থির নহে প্রাণ।
না জানি বিধাতা কর্মে কার কি ঘটান ॥
কোথা হৈতে জনার্দন আইল মোর ঘরে।
সম্বন্ধ ঘটাল হেন শুনি প্রাণ ডরে ॥
বেহুলা বলেন মাগো[২] কর্মের লিখন।
আছে যেবা ভাল মন্দ হবে কোন জন ॥
কুলে শীলে করে মাগো মোরে দিলে দান।
কথা কি আছয় আর চিন্তা কৈলে আন ॥
অমলা বলেন তুমি নয়নের তারা।
তিলে না দেখিলে প্রাণ হৃদে হয় হারা ॥
সাত পাঁচ নাই মোর তুমি এক সুতা।
রাত্রদিন দুঃখ পাবে পাঠাইলে তথা ॥
বেহুলা বলেন বিধি[৩] নারীজন্ম করি।
পর ভাগ্যে তুলে দিলে মায়া পরিহরি ॥
ছাড়গো আমার আশা শুনগো জননী।
এতোদিনে বিচ্ছেদ করিল বিধি আনি ॥
সাত বধূ সাত পুত্র লয়্যা কর ঘর।
চিতে আইলে দয়া কৈলে নহে দুরান্তর ॥
সায় বাণ্যা বলে মাগো কেন কান্দ আর।
প্রতিমাসে তোমায় আনিব একবার ॥
চম্পা নগর নিছানি সে বহু নহে[৪] দূর।
তবু শূণ্য হবে মোর তোমা হৈতে পুর ॥
বেহুলা বলেন বাপা তুমি ভাগ্যবান।
সাতপুত্র সাতবধূ ঘরে বিদ্যমান[৫] ॥
তেজিয়া সকল যাই দেহ পদধূলি।
কেবল পরের ভাগ্যে মোরে দিলে তুলি ॥

১ পাঠান্তর—বাছনি ২ পা—মাতা ৩ পা—মাগো ৪ পা—নহে কত ৫ পা—সাতবধূ ঘরে আছে দেখ বিদ্যমান।

ভ্রাতৃবধূগণে বেহুলা প্রবোধে[১] অপার।
পাঠায় ভাইরে মোর লইতে সমাচার॥
বেহুলার সাথে কান্দে সাত সহোদর।
হেন কালে ঘরে আইল চান্দ সদাকর॥
দেখিল আসিয়া ঘরে সভার ব্যাকুল।
চান্দবাণ্যা ডাক পাড়ে কর অনুকূল[২]॥
হরষে বিরস বোধ দিয়া সভাকারে।
বরকন্যা বসে গিয়া দোলার উপরে॥
নানা বাদ্য বাজে তবে নিছানি নগর।
চলিল বণিক সব লয়্যা কন্যা বর॥
বণিক কুলের বিভা সীমা এতদূরে।
প্রবেশিল গিয়া সভে চঁপায় নগরে॥
লোহার বাসরে লৈল পুষ্প শয্যা করি[৩]।
পুত্র বধূ রাখে তায় চান্দ অধিকারী॥
রত্নের প্রদীপ জ্বলে লোহার বাসরে।
কবাট দিলেক কিলি লোকে থোইল দ্বারে॥
পর্বত বেড়িয়া হৈল লোকের নিবাস।
জনরব কোলাহল[৪] অগ্নির প্রকাশ॥
নানা বাদ্য বাজে নাচে কেহ গায় গীত।
লোহার বাসর হৈল মানুষে বেষ্টিত॥
হেন্তালের বাড়ি লয়্যা চাঁদ বাণ্যা ফিরে।
জানিল মনসা মাতা থাকি নিজ পুরে॥
সঙ্কটে হইল বন্দী লোহার বাসর।
কেমনে দংশিবে সর্প ভাবিল বিস্তর॥
চারি মেঘ অষ্ট গজ অঙ্কাশ পবন।
ইন্দ্র মত জাল করি ভরিল ভুবন॥
হইল প্রবল বৃষ্টি পবন প্রবল।
চঁপা নগ্র বেড়ি কর শুন জলধর॥

১ পাঠান্তর—কহেন ২ পা—ডাক ছাড়ে হইয়া আকুল ৩ পা—পুণ্য পুষ্প শয্যা করি ৪ পা—লোকজনের কোলাহলি।

মনসার আগ্যা পায়্যা মেঘ বায়ুগণ।
বিষ্ণুপদে ব্যাঘ্র হৈয়া করিল গর্জন॥
ঘিড়ি ঘিড়ি ডাকে মেঘ প্রথমে ঈশাণে।
রচিল দ্বারকা দাস বিষহরী ধ্যানে॥

ত্রিপদী

বিষহরী কৈল ধ্যান চলে আসে মেঘমান
বিষ্ণুপদে ব্যাপিল নিমিষে।
পবনে করিয়া ভর জল ঢালে করিবর
তর তর দামিনী আকাশে॥
মেঘ হৈল জলে ভার একে রাত্র অন্ধকার
তায় হৈল পবনের মেলা।
গজেন্দ্র শুণ্ডের পারা খসিল জলের ধারা
ঘোর শব্দে বরিষয় শিলা॥
হুড় হুড় হুড় হুড় মেঘে পবন বহিল বেগে
দিহড়ি[১] মশাল যায় টাকি।
তরুগণ উড়ে যায় কে পড়ে কাহার গায়
অন্ধকারে পথ নাই দেখি॥
ঝঙ্কারি বরষে জল রহিবারে নাহি স্থল
অগোচর দেবতার মায়া।
কাতর বণিক যত পলায় যে যার মত
কেহ কার মুখ নাহি চায়্যা॥
প্রবেশ হইল দুখ[২] দূরে পলাইল সুখ
প্রাণ লয়্যা সভে যায় ঘরে।
সনকা চান্দের ডর হৃদে হইল গুরুতর
বলে কিবা বিধি আজ করে॥

১ মশাল জাতীয় বস্তু ২ পাঠান্তর—প্রবেশিল ঘোর দুঃখ।

হেন কালে বিষহরী হৃদয়ে ভাবনা করি
ডাক দিল সর্প উদে নাগে।
ত্বরিতে আসিয়া অহি মনসা মায়েরে[1] কহি
যাঅ তুমি চাঁপা নগ্র দিগে[2] ॥
যাও গিয়া সাধু সুতে সুতার সঞ্চার পথে
সাতালি পর্বতে বাস্ ঘরে।
পথ আছে ঈশাণেতে চলে যাও মোর হিতে
দংশ গিয়া প্রথম প্রহরে।
আশ্বাসয় দেবী তারে উদে নাগ যায় থরে
প্রবেশিল সাতালি পর্বতে।
বাসরে উঠিয়া চায় পথ না দেখিতে পায়
চতুর্দিগে খুজে নানা মতে ॥
ঈশাণে স্যুত্রের[3] রেখা পাইল পথের দেখা
সম্বরে আপনা তনু নাগে।
ক্ষীণ করি নিজ কায় সঞ্চারিয়া গেল তায়
দেখিল বেহুলা বসি জাগে ॥
চমকে বেহুলা ত্রাসে ভূখিলা[4] ভুজঙ্গ পাশে
কাঁচা দুগ্ধ দেয় বাটা ভরি।
ক্ষুধার্ত্ত আছিল নাগে দুগ্ধ পান করে বেগে
লজ্জাভরে হেট শির করি ॥
বেহুলা এমন কালে সাণ্ডাসি দিলেন গলে
বন্দী কৈল সর্প উদে নাগ।
হড়পি[5] ভিতরে রাখে মনসা জানিল তাকে
অধিক দ্বিগুনে বাড়ে রাগ ॥
ক্রোধ ভরে থরথর ডাক দিল ঘোরতর
কালদন্ত কালদন্ত বলি।
মনসার কোপানলে কালদন্ত সেই স্থলে
প্রবেশ হইয়া[6] পুটাঞ্জলি ॥

১ পাঠান্তর—তাহারে ২ পা—যাইতে হৈল চঁপা নগ্র বেগে ৩ পা—সুতার ৪ ক্ষুধার্ত্ত
৫ পেটরা ৬ পা—প্রবেশিল হইয়া।

আগ্যা কৈল বিষহরী　　সাধরে আমার ঐরি[১]
　　চাঁপা নগ্রে লোহার বাসরে।
থাঅ গিয়া সাধু পুত্রে　　দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে
　　রাখ মোর মান সর্প্বরে॥
দেবীর বচন শুনি　　বলে কালদন্ত ফণি
　　প্রবেশিল বাসর উপরে।
গেল হৈয়া হস্ত সন্ত　　পথ খুজে কালদন্ত
　　আপনার শরীর সম্বরে॥
বলে এত বিপরীত　　না দেখি পথের স্থিত
　　মনসারে জিগ্যাসিলু নাই।
ভাবনা করিয়া চিতে　　মনসার মায়া হৈতে
　　পথ পাইল ঈশাণেতে যাই॥
কালদন্ত ঘোর নাগ　　হস্তী গণ্ডা গিলে বাঘ
　　ক্ষীণ হৈয়া গেল যেন কেশ।
পড়িল লোহার বাসে　　তনু বাড়ে ফের শ্বাসে
　　ধরে সর্প ভয়ঙ্কর বেশ॥
বেহুলা বাটায় করি　　দুগ্ধ দিল আগে ধরি
　　নিশ্চিন্তে সর্প করে পান[২]।
না করে উপরে মাথা　　বেহুলা সায়ের সুতা
　　গলে তার সাণ্ডাসি লাগান॥
ছাড়িয়া দুগ্ধের সুখ　　সর্প প্রসারিল মুখ
　　বেহুলা ধরিল তার গলে[৩]।
বিপাকে হইয়া বন্দী　　করিয়া অনেক সন্ধি
　　পেটরার ভিতরে রাখিলে[৪]॥
দ্বিতীয় প্রহর গেল　　কালদন্ত না আইল
　　বঙ্করাজে ডাকে বিষহরী।
চলিল ত্রিবঙ্ক নাগ　　পৃথিবী না সহে রাগ
　　আসি মনসারে নতি করি॥

১ পাঠান্তর—বৈরী　২ পা—হৃষ্টে সর্প করে দুগ্ধ পান　৩ পা—শিরে　৪ পা—রাখেন হড়পি ভিতরে।

মনসা বলেন শুন বঙ্করাজ যদি জান
নাগমাতা বিষহরী বলি।
সাতালি পর্ব্বতপর লোহাবাসে লক্ষীন্দর
দংশন করিয়া আইস চলি ॥
সর্প মধ্যে তুমি তেজা রাখরে আমার পূজা
পুত্র নাতি বাড়িবে তোমার।
বঙ্করাজ বলে মাতা দংশিব কতেক কথা
মোর ক্রোধে নাই কার পার ॥
চলে সর্প বঙ্করাজ সাতালি পর্বত মাঝ
নিশ্বাসে বেহুলা গেল জানি।
সুতার সঞ্চার পথে সাওাসি ধরিয়া হাতে
প্রবেশিতে বন্দী কৈল ফণি ॥
অনেক প্রতিগ্যা করি হৃদে অহঙ্কার ভরি
আস্থা ছিল খাইবার তরে।
সতী সুচতুর বালা জানয়ে অশেষ কলা
বিপাকেতে বন্দী কৈল তারে ॥
তিনি নাগ বন্দী হৈল বিষহরী ধ্যানে পাইল
রাত্র হৈল তৃতীয় প্রহর।
দ্বারিকা দাসেতে বলে মনসা চরণ তলে[১]
ক্রোধে দেবী হৈল থর হর[২] ॥

কৃপার সাগরী তুমি[৩] বিষহরী
কোনখানে আছ মাতা সেবকে বিসরি।
পুর মোর আশ ছাড় নিজ বাস
আসরে সঙ্গীতে উর ডাকে নিজ দাস[৪]।
শুন সর্ব নরে রাত্র তিনি প্রহরে
বন্দী হৈল তিনি সর্প লোহার বাসরে।

১ পাঠান্তর—মনসার পদতলে ২ পা—ক্রোধে বিষহরি থর হর ৩ পা—মাতা ৪ পা—পুরাও আমার আশা, তোমার চরণে বাসা, সেবকের খণ্ড দুঃখ দশা ডাকে নিজ দাসে।

বেহুলা নাচনী সায়ের নন্দিনী
বন্দী কৈল তিনি নাগ কেহ নাহি জানি।
তথা বিনোদিনী[1] মনসা আপনি
ধ্যানেতে জানিল বন্দী কৈল তিনি ফণি।
ক্রোধে থরহর কাম্পে কলেবর
অরুণের শোভা ধইল নয়ন উপর।
ক্রোধভর হৈয়া নেতুরে ডাকিয়া
বলে দেবী বিষহরী করুণা করিয়া।
অবনী ভিতরে চাঁদ বাণ্যা ভরে
না হৈল আমার পূজা সৃষ্টির ভিতরে[2]।
এই রাত্রি শেষে তাহার ঐরিশে[3]
নারিলাম দংশিতে কিবা মানব মানুষে।
কহনা বিশেষ রাত্র অবশেষ
কলঙ্ক রহিল মোর জুড়াইয়া দেশ।
নেতু জোড় করে দেবীর গোচরে
বলিতে লাগিল কিছু শাস্ত্র অনুসারে।
সর্প রসাতলে অবনি মণ্ডলে
সর্প হুঙ্কারিয়া মাতা আন মোর বোলে।
যেই নাগ হৈতে মরে সাধু সুতে
বুঝায়্যা[4] পাঠাব সর্প কহিলাম তোমাতে।
শুনি বিষহরী জয়শঙ্খপুরি
সর্প সর্প করি ডাকে থর হরি।
ডাকে নাগমাতা সর্প আছ কোথা
মাগিতে আস্যাছে কার্য্য[5] সভে আইস এথা।
আইস ওরে সাপ দেখাও প্রতাপ
খাও গিয়া সাধু সুতে ঘুচুক সন্তাপ।
যদি সর্পগণ হবে অন্যমন
নাশিব জানিবে কাল নিশ্চয় বচন।

১ পাঠান্তর—হেথা শিবের নন্দিনী ২ পা—কহিনু তোমারে ৩ ঐরিশে—ওয়ারিশে, এ ক্ষেত্রে পুত্রে ৪ পা—বিচারিয়া ৫ পা—সাধিতে আমার কাজ

স্বর্গ পুর[১] অবনী ভেদে শঙ্খধ্বনি
পাতালে ভেদিয়া শঙ্খ ডাকে উগ্র ফনি ;
দেবীর নিস্বান শুনি কম্পমান
ক্রোধভরে সর্প কোন মনে চান[২]।
উগ্রিল পিঙ্গল করে ঝল মল[৩]
কীর্তি যার যুগ যুগে বাড়ে ভূমণ্ডল
ডরে সর্পরাজ সাধিবারে কার্য্য[৪]
কুম্বুত তক্ষক ধায় অবনীর মাঝ।
অতি ঘোর বনে ধরিয়া হরিণে
অজগর গিল্যা ছিল ফেলিল সেখানে।
যার ভক্ষ হাতি নামে যারা চিতি
চলিতে ভুবন কাঁপে চলে শীঘ্রগতি।
পিঠে নানা বর্ণ করিছে গমন
রঙ্গরেখা জলে দিবা রাতি[৫]।
পর্বত ভিতরে থাকে নিরন্তরে
নামেতে গোখুরা সর্প আইসে শূণ্যভরে।
অতিশয় রোষে ধাইল থরিশে
কালসর্প ধায় ফুফুকার করি বিষে।
সর্প উদে নাগে মনসার আগে
লাঙ্গুড়ে ধরিয়া চক্র দাঁড়াইল আগে।
জল মধ্যে যায় ডিঙ্গা ধরে খায়
শঙ্খচূড় সর্প আইল অতি দীর্ঘকায়।
গমন মন্থরে চলিতে না পারে
দশ লক্ষ যোড়ি আইল দেবীর গোচরে।
পবনের বায় যাতে বাড়ে কায়
হস্তী গণ্ডা ব্যাঘ্র যেই উভে গিলে খায়।
নামেতে ময়াল আইল তৎকাল
অতি উচ্চ তনু তার উড়ে[৬] সাত তাল।

১ পাঠান্তর—সপ্তপুর ২ পা—উরে গগন উপর ৩ পা—দুঃখেতে পাতাল ৪ পা—সাধিতে দেবীর কাজ ৫ পা—পৃষ্ঠে নানাবর্ণ রেখা জলে দিবারাতি ৬—উভে

ধায় কাণ্ডসর দেবী বরাবর

চঞ্চল নামেতে সর্প আইল ভয়ঙ্কর।

আইসে কালদন্ত হয়্যা হন্ত সন্ত

আইল ছপন কোটি এড়াই ভূদন্ত[১]।

বজ্রদন্ত অহি যুড়াইয়া মহি

কালিয়া ঢেমনা আইল কে পারিবে কহি।

মনসার আগে পুণ্ডরীক নাগে

কক্রোট[২] সহিতে[৩] হুঁহে আইল অতি বেগে।

মুখে হুতাশন জলে অনুখন

মনসার আগে আইল বাসুকি আপন।

যেবা জলে স্থলে আকাশে পাতালে

পর্বত গহর তেজি ধায় সর্পকুলে।

আইল সর্ব ফণি রহিল কালনি[৪]

কালিদহ পদ্মবনে লুকায়্যা আপনি।

সর্পের চাতর[৫] দেবীর গোচর

নেতা বলে বিষহরী শুনহ উত্তর

মনসার পায় দ্বারিকা দাসে[৬] গায়

কৃপা করি বিষহরী রাখিহ আমায়।

ত্রিপদী

হয়্যা হরষিত পুণ্যে আনন্দিত

মনসা মঙ্গল শুনে যেই জন।

রোগ শোক দূরে যায় দুর্গতি খণ্ডন * ॥

১ পাঠান্তর—সর্প দুরন্তর ২ কক্রোট>কর্কট—অষ্ট নাগের অন্যতম (অষ্ট-নাগ—অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট ও শঙ্খ) ৩ পা—কোটি কোটি সর্প সহিতে ৪ পা—কালনাগিনী ৫ চাতর—চাতুরী, বাহাদুরী অর্থে ৬ পা—কবিরাজে

* প্রথম তিন ছত্র ভিন্ন পুঁথির পাঠ।

বুঝিয়া কার্য্যের হেতু   কর জোড়ি[১] কহে নেতু
শুন মাতা বিশ্ব বিনোদিনী।
আইল অনেক অহি   কম্পিত করিল মহী
কার্য্য কিছু না পাইল আপনি ॥

*   *   *   *

অকারণে আইল ইহ নাগে।
পর্বত সমানে[২] কায়   হস্তি গণ্ডা গিলে খায়
বাসরে গলিবে কোন দিগে ॥
যত দেখ সর্পরাজ   সাধিতে তোমার কাজ
একা কালী বিনা কেহ নয়।
আছে কালীদহ জলে   আনহ আমার বোলে
পাবে কার্য্য কহিলাম তোমারে নিশ্চয় ॥
শুনিয়া নেতুর কথা   কোপিল[৩] ভুজঙ্গ মাতা
ময়ালে ডাকিয়া কিছু বলে।
তুমি সে প্রধান সাপ   কে সহে তোমার তাপ
কালি দহে যাঅ মোর বলে ॥
কালিনীর অহঙ্কার   কে সহিতে পারে আর
মোর আগ্যা লঙ্ঘে বার বার।
লেঙ্গুড়ে[৪] পর্বত নড়ে   ময়াল তোমার দাড়ে[৫]
গর্ব দূর যাউ সভাকার ॥
যাঅ যাঅ শীঘ্রগতি   আনহ আমার প্রতি
রাত্রি যেন না হয় অবশেষ।
বন্দি মনসার পায়   চলিল ময়াল তায়
কালীদহে হইল প্রবেশ ॥
দেখিয়া কালিনী নাগে   ময়াল ধইল বেগে
কুলে তুলে অতি শীঘ্র করি।
গমন পবন জিনি   চলিল ময়াল ফণি
আনি দিল যথা বিষহরী ॥

১ পাঠান্তর—যোড়করে ২ পা—প্রমানে ৩ পা—কাম্পিল ৪ লেঙ্গুড়ে—লেজে ৫ দাড়ে—দৃঢ়তায়, শক্তিতে।

দেখিয়া কালিনী নাগে মনসা কহেন রাগে

মোর কার্য্যে কেন তোর হেলা।

শত্রু সঙ্গে বাদ মোর উপহাস মনে তোর

কি কহিব তোরে এত বেলা ॥

ধরগো তাম্বূল খাঅ চঁপা নগ্রে চলে যাঅ

স্যতালি পর্ব্বত বাস ঘরে।

লোহার বাসরে সাধু রাখিয়াছে পুত্র বধূ

খাঅ গিয়া বালা লক্ষীন্দরে ॥

রাখিলে আমার মান পাবে গো বহুত দান[১]

যশ তোর রবে সব কাল।

মনসা সন্তোষ হয়্যা কালী নাগে আশ্বাসিয়া

আজ্ঞা দিল যাইতে তৎকাল ॥

কালিনী এতেক শুনি চিন্তিল হৃদয়ে গুণি[২]

বিদায় মাগিল মনসায়।

লোহার বাসর তথা শুনহে অদ্ভুত কথা

শ্রী বৈদ্য[৩] দ্বারিকা দাসে গায় ॥

আজু অপূর্ব্ব দেখনা দেখনা।

কৃপা করি বিষহরী হরিবেন যাতনা* ॥

হরিয়া সাপের বিষ নাম বিষহরী।

মনসা ভুবনে খ্যাত মনোবাঞ্ছাপুরী ॥

নাগমাতা শিবসুতা তুমি দয়াময়ী।

কৃপা করি শিরে ধরি রাখিয়াছ মহি ॥

একতিলে বিনাশিতে পার ভূমণ্ডল।

স্বর্গ মর্ত্ত ব্যাপিত হয়্যাছ জলস্থল ॥

চরণে শরণ লৈলু সগোষ্ঠী সহিতে।

ক্ষমিবে সহস্র দোষ হয়্যা দয়ান্বিতে ॥

১ পাঠান্তর—পাবে বহু সম্মান ২ পা—চিন্তিত মনসার বাণী ৩ পা—শ্রীযুত

* ভিন্ন পুঁথির পাঠ—দেখ দেখনারে আজ দেখ না। তোমার চরণতলে রাখ মূর্খজনা ॥

তবে শুন মনসা মঙ্গল তুষ্ট হৈয়া।
তৃতীয় প্রহর রাত্র গেল গুজুরিয়া[১] ॥
ক্ষুধাভরে লজ্জাতরে[২] বেহুলা সুন্দরী।
বসিয়া জাগয় রাত্র ভাবি বিষহরী ॥
হেন কালে নিদ্রা হতে উঠে লক্ষীন্দর।
বেহুলায় বলে কিছু কাতর অন্তর[৩] ॥
শুনগো সায়ের সুতা আমার বচন।
লাগিল দারুণ ক্ষুধা নাইক চেতন ॥
মস্তক ফিরায় কর্ণে নাই শুনি আর।
অন্ন দিয়া শরীর রাখহ পুনর্বার[৪] ॥
টলমল করে অঙ্গ না চলে চরণ।
অন্ন দিয়া প্রাণ রাখ শুনহ বচন ॥
অবশ হইল শরীর কি কহিব আর।
নহে স্বামী হত্যা হবে উপরে তোমার ॥
শুনিয়া ত্রাসিত হৈল সায়ের কুমারী।
অপূর্ব বিধির গতি বুঝিতে না পারি ॥
বিভাদিনে স্বামী সঙ্গে অকথোকথন[৫]।
কিরূপে কহিব বলি ভাবে মনে মন ॥
মনসা ভাবিয়া বলে শুন প্রাণনাথ।
লোহার বাসরে তুমি কোথা খাবে ভাত ॥
বিভাদিনে পূর্বাপর আছে দেবাসুরে।
অন্ন কেহ খায় নাই প্রভু বাস ঘরে ॥
সুখে দুখে বঞ্চ প্রভু রাত্র দণ্ড ছয়।
বিভারাত্রে অন্ন খেলে দুঃখ দশা হয় ॥
লক্ষীন্দর বলে প্রিয়ে কেন বল আর।
ছয় দণ্ড ছয় যুগ হইল আমার ॥

১ পাঠান্তর—উতরিয়া (পেরিয়ে গেল, উত্তীর্ণ হোল) ২ পা—উজাগরে ৩ পা—উত্তর
৪ পা—দশদিগ হয়্যাছে মোরে অন্ধকার ৫ পা—বিভাদিনে স্বামীসনে কথোপকথন।

খুধায়[১] পরাণ যায় কহ[২] বিপরীত।
কাল বশে খুধা মোরে করিল পীড়িত ॥
দেখ নারিকেল আছে লোহার বাসরে।
মঙ্গল হাণ্ডিতে তণ্ডুল আছে ঘরে[৩] ॥
ঘৃত তৈল অগ্নি রামা আছে বিদ্যমান[৪]।
নেতের আঞ্চল[৫] জ্বালি বসাও রন্ধন ॥
কারুণ্যে জানিয়া[৬] রামা বসাল রন্ধন।
অত্যন্ত কাতর দেখি সাধুর নন্দন ॥
তিনি ঝিঙ্ক[৭] বসাইল তিনি নারিকেল।
তাত[৮] আনি দিল তায় নারিকেল জল ॥
মঙ্গল হাণ্ডির তণ্ডুল আর রম্ভা ভরি।
জ্বালিল আনল পরিধান বস্ত্র চিরি ॥
ঘৃতের সংযোগে হৈল অগ্নির প্রবল।
নিমিষে রন্ধন কৈল অন্ন যে কেবল ॥
হেমস্থালে অন্ন দিল করিয়া বেসন[৯]।
লক্ষীন্দরে তুল্যা দিল করিতে ভোজন ॥
কালবশে লক্ষীন্দর করিয়া ভোজন।
কর্পূর তাম্বূলে কৈল মুখের শোধন ॥
রহিল অনেক অন্ন নারিল খাইতে।
বেহুলারে কিছু বলে বণিকের সুতে ॥
ভোজন করিলু আমি তুমি উপবাসী।
মোর দিব্য আছে রামা অন্ন খাও বসি ॥
নারী হয়্যা স্বামী আগ্যা যে করে লঙ্ঘন।
দুই লোকে দুঃখ তার না হয় খণ্ডন ॥
স্বামী সেবা নারী যেবা করে অনুরাগে।
স্বর্গপুরে যশ তার বাড়ে যুগে যুগে ॥

১ পাঠান্তর—তিলেকে ২ পা—দেখি ৩ পা—চাল রম্ভা দেখ ঘরে ৪ পা—সব আছে দেখ বিদ্যমান ৫ পা—বসন ৬ পা—কাতর দেখিয়া ৭ ঝিঙ্ক—ঝিঁক, হাড়ি বসানোর জন্যে উনানের পাশের চূড়া ৮ তাত—ততঃ, তারপর ১০ পা—বাড়ন।

শুনিয়া স্বামীর বাক্য বেহুলা সুন্দরী ।
ভাবনা করিল চিতে ভাবি বিষহরী ॥
হইল আকাশবাণী শুনগো বেহুলা ।
না খাইঅ অন্ন তুমি ভুলিয়া অবলা ॥
চান্দ বাণ্যা বাদ করে মনসার সনে ।
বিভারাত্রে ছয় পুত্র মরিল দংশনে ॥
স্বামী তার বাসঘরে তেজিবে জীবন ।
নারিবে বাঁচাতে কৈলে উচিষ্ট ভক্ষণ[১] ॥
শুনিয়া আকাশবাণী বেহুলা নাচনী ।
পৃথিবীরে তুস্তি করে সকরুণ জানি ॥
মনসার পাদপদ্মে ভরসা কেবল ।
রচিল দ্বারকা দাস মনসা মঙ্গল ॥

ত্রিপদী

মঙ্গল রাগ

বেহুলা সুন্দরী ধরণী মুখ হেরি
করয়ে তুস্তি নানা মতে ।
জয় জয় মহী অবনী কৃপা ময়ী
উৎপত্তি স্থিতি তোমা হৈতে ॥
মেদিনী বসুন্ধরা সহগো সভার ভারা
ধরিত্রী ধর প্রীতি বুদ্ধি ।
তোমাতে করি বাস পুরাঅ প্রাণী আশ
সাধএ সভে অষ্ট সিদ্ধি ॥
এ অন্ন মোর আগে বিদীর্ণ হয়্যা বেগে
রাখহ আমারে কৃপা করি ।
শুনিয়া তাহার তুস্তি সন্তোষ হৈল খিতি
বিদীর্ণ হৈল বসুন্ধরী ॥

১ পাঠান্তর—নারিবে জিয়াতে কৈলে উচিষ্ট ভোজন ১ পা—সহগো সর্বভারা

দেখিয়া তুষ্ট মন　　রাখিল উচিষ্টন
　　ধরণীর গর্তে যত্ন করি।
বসিল দুঃখমনে　　বেহুলা স্বামী সনে
　　জানিল এথা বিষহরী ॥
ডাকি আনি নিদ্রাবতী　　বলেন তার প্রতি
　　চঁপা নগ্রে যাঅ বারে তুমি।
বেহুলা লক্ষীন্দরে　　নিদ্রা করাঅ তারে
　　দংশিব সাধুসুতে আমি ॥
চলিল নিদ্রা থরে　　যেথানে লক্ষীন্দরে
　　প্রবেশে দু'হার শরীরে[১]।
বস্যে ছিল রঙ্গে　　বেহুলা স্বামী সঙ্গে
　　ঢলিল দু'হে নিদ্রাভরে ॥
প্রবেশ নিদ্রা যথা　　যতেক জীব হেথা
　　চেতনা গেল সভাকার।
মনসা পদরজে　　রঙ্কিল কবিরাজে
　　কালিনী কৈল আগুসার ॥

পয়ার

হরষ বিষাদে দেখ কালী নাগ যায়[২]।
চক্ষুর নিমিষে গিয়া চঁপা নগ্রে পায় ॥
সাতালি পর্বতে লোহার বাস ঘরে।
অস্তে ব্যস্তে উঠে কালী তাহার উপরে ॥
চতুর্দিকে খুজে পথ দেখিতে না পায়।
চঞ্চল নয়নে সর্প চতুর্দিগে[৩] চায় ॥
দেখিল ঈশাণে পথ সুতার সঞ্চারে।
মনসা ভাবিয়া নাগ খীণ তনু ধরে ॥

১ পাঠান্তর—লোহার বাসরে ২ পা—দূরান্তর বীরান্তর কালীনাগ যায় ৩ পা—চারিদিগে

অতি বলবান ছিল হৈল খীণকায় ।
সুতার সঞ্চারে কালী প্রবেশিল তায় ॥
পড়িয়া বাসরে নাগ বাড়িল নিশ্বাস ।
বাড়িল শরীর তায় দেখি লাগে ত্রাস ॥
দেখিল লোহার ঘরে রত্নদীপ জ্বলে ।
নিদ্রা যায় বেহুলা লক্ষীন্দর কোলে ॥
সর্বাঙ্গ সুন্দর তায় বেহুলা সুন্দরী[১] ।
কান্দিতে লাগিল দেখি হুঁহাকারে কালী ॥
নয়নে খসিল[২] নীর নিন্দে আপনারে ।
কেনবা আইলু আমি মনসার বোলে ॥
কিরূপে লখাই খাব মনসার বোলে ।
নিশ্বাস ছাড়িয়া কালী এই কথা বলে ॥
যে বেহুলা রূপ দেখি দেবে মোহ যায় ।
লক্ষীন্দর রূপ হেন মোহিত সভায়[৩] ॥
ছবুড়ি সর্পের মাতা আমি যে গর্ভিনী[৪] ।
কেমনে দংশিব আমি পরের বাছনি ॥
কলঙ্কিনী পাপমতী মুই দুরাচারী ।
আপনা খুয়াঞ্যা আইলু ধর্ম না বিচারি ॥
ফেরি যদি যাই মোরে ক্রোধে বিষহরী ।
মারিবে সগোষ্ঠী মোর মনে ক্রোধ করি[৫] ॥
বিনা আমি অপরাধে সাধুর নন্দনে ।
না দংশিব বলি[৬] নাগ বিচারিল মনে ॥
লক্ষীন্দর বেহুলার পাশতলে গিয়া ।
শয়ন করিল মনে দুঃখভর হৈয়া ॥
দৈবের নির্বন্ধ কেবা করিবে খণ্ডন ।
পাশমোড়া দিয়া শুএ[৭] সাধুর নন্দন ॥

১ পাঠান্তর—রূপ দেখি মোহ যায় স্বর্গ অপক্ষরী ২ পা—ছিকিল ৩ পা—লক্ষীন্দরে খাইবারে মনে নাই ভায় ৪ পা—পাপিনী ৫ পা—অস্ত মনে করি ৬ পা—কালী ৭ পা—শুইল

নির্ভরে চরণ বাজে কালীর মস্তকে।
ক্রোধিত হইয়া কালী[১] দশদিগে ডাকে ॥
চন্দ্র সূর্য সাক্ষ হও কুবের বরুণে।
মুণ্ডে[২] মোর মারে নাথি অপরাধ বিনে ॥
ক্রোধে কম্পমান হৈয়া চাহে ঘন ঘন।
ধরিল বিষম চক্র করাল বদন ॥
ছুটিল মুখের বিষ লাগিল চরণে।
দংশন করিল কালী বিষদন্ত সনে ॥
রক্তে বিষ একত্র হইল যেই কালে।
আক্রসে উঠিয়া বৈসে সাধুর পুত্রালে[৩] ॥
অস্তে ব্যস্তে কালীনাগ পলাইয়া যায়।
সুবর্ণের জাস্তি মাইল[৪] লক্ষীন্দর তায় ॥
পলাইয়া যায় কালী হইয়া ব্যাকুল।
কাটা গেল লাঙ্গ তার আড়াই আঙ্গুল ॥
মনসার আগে কালী কহে বিবরণ।
ধর্মে শাস্তি পাইলাম করিয়া দংশন ॥
দংশিলু সাধুর সুতে শুন বিষহরী।
মণিময় দানে তুষ্ট কৈল ধন্বন্তরি ॥
এথা বাস ঘরে দেখ বালা লক্ষীন্দর।
দারুণ বিষের জালে পরান বিকল[৫] ॥
চরণ হইতে বিষ উঠে কলেবরে।
করুণা করিয়া কিছু বলে বেহুলারে ॥
উঠ উঠ সায়ের নন্দিনী প্রাণসখী।
আকুল পরাণ মোর বিপরীত দেখি ॥
চরণে দংশিল কিবা বলিতে[৬] না পারি।
দশ দিগ শূণ্য হৈল তনু গেল ঘারি[৭] ॥
কত নিদ্রা সুখে যাও শুনগো রমণী।
সরিল সংসার মোর হেন অনুমানি ॥

১ পাঠান্তর—ক্রোধভর হয়্যা সর্প ২ পা—দন্তে ৩ পা—মহাত্রাসে উঠি সাধু বলে সেই কালে
৪ পা—মারে ৫ পা—কাতর ৬ পা—বুঝিতে ৭ ঘারি—বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া।

টলমল করে অঙ্গ পরান চঞ্চল।
দশ দিক অন্ধকার হইল সকল॥
আকুলে পরান যায় কেহ নাই সাথা[১]।
মাতা পিতা কার সনে না হইল দেখা॥
উত্তর না দেঅ রামা কালনিদ্রা ভরে।
অকারণে তোর জন্ম গেল মোর তরে॥
অর্ধ অঙ্গ দিলাম তোরে বিভার দিবসে।
মৃত্যু কালে দেখ রামা উঠ বৈস পাশে॥
সুশীতল দেঅ জল সায়ের কুমারী।
বিষের বিষম জালে তনু গেল ঘারি॥
লিখিল আমার মৃত্যু বিধি বাস ঘরে।
দিবেগো সভায় লজ্জা অতিশয় তোরে॥
যথা তোর বাপ ভাই যাঅ তার ঘর।
তোমা আমা যেই এই সংসার ভিতর[২]॥
কহিতে কহিতে বিষ উঠে অতিশয়।
মনসা মঙ্গল গীত কবিরাজে কয়॥

একপদী পয়ার

মনসার গীত শুন দিয়া চিত
লক্ষীন্দরে বিষজালে পরাণ ব্যথিত।
রক্তের সঞ্চারে বিষ উঠে থরে
ক্রমে ক্রমে উঠে বিষ আঠুর[৩] উপরে।
জিনিয়া পবন বিষের গমন
কোমরে ধইল বিষ না চলে চরণ[৪]।
প্রবেশি অন্তরে মিশিয়া রুধিরে
চতুর্দিগে ধায় বিষ রক্ত জল করে।

১ সাথা—বন্ধু ২ পাঠান্তর—তোমায় আমায় দেখা এই সংসার ভিতরে ৩ পা—হাটুর
৪ পা—হরিল চেতন

ছাতি জিনি যায় ধরিল কণ্ঠায়
মুখেতে গরল ভাসে চেতনা হারায়।
কণ্ঠা জিনি গেল মস্তকে ধরিল
কালাঘরে প্রবেশিতে লখাই ঢলিল।
সাধুর কুমার অতি সুকুমার
শয্যায় তেজিল তনু বিষাদ অপার।
তেজিল জীবন সাধুর নন্দন
পড়িল বেহুলা অঙ্গে নিদ্রায় মগন[১]।
সায়ের কুমারী উঠে তরাতরি
চতুর্দিগে ধায় রামা মনে ত্রাস করি।
দেখে লক্ষীন্দরে শয্যার উপরে
গরলে ডুবিছে পাশ তনু জরজরে।
নাহিক নিশ্বাস বেহুলার ত্রাস
ভাঙ্গিয়া পড়িল মুণ্ডে যেমন আকাশ।
পরাণ আকুলে লক্ষীন্দরে তুলে
হা হা নাথ বলি কান্দে কান্ত লয়্যা কোলে।
ডুবে[২] গেল সুখ বিদরয় বুক
চেতনা হারায় রামা দেখি স্বামী মুখ।
বেহুলা নাচনী পঙ্কজ বদনী
পড়িয়া শিশিরে যেন মিলায় লবনী[৩]।
রূপ হৈল হীনি[৪] সিন্দুর মলিনি[৫]
বিধবা লক্ষণ অঙ্গে ধরিল প্রচনী[৬]।
পূর্ণিমার গাঙ্গে সমুদ্র তরঙ্গে
পড়িল দুঃখের ভাটা দুই কুল ভাঙ্গে।
ডাকে উভরায় স্বামীরে চিয়ায়
প্রাণহীন জন কোথা ডাকে ফিরা্যা চায়।

১ পাঠান্তর—ছাড়ি বেহুলার অঙ্গ নিম্রাতে গমন ২ পা—দূরে ৩ পা—নবনী ৪ পা—হীন
৫ পা—মলিম ৬ পা—প্রবীন

ওহে প্রাণনাথ না লইলে সাথ
অভাগী বেহুলা ডাকে হইয়া অনাথ।
দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া মোরে
কোন থানে গেলে প্রভু না কহ্যা আমারে।
কারো আমি সুখ কর‍্যাছি বিমুখ
সেই হৈতে অল্পকালে নিদারুণ দুখ।
আর মাতা পিতা কি করিবে ভ্রাতা
তেজিব তোমার সঙ্গে জীবন সর্বথা।
লোহার বাসরে কাল নিদ্রা মোরে
ধরিল আসিয়া প্রভু নাশিতে তোমারে।
সংসারের প্রাণী[১] করিবে কুধ্বনি[২]
বিভারাত্রে পতি খাইছে বড় কুলক্ষণী।
পতি বিদ্যমান তেজি যদি প্রাণ[৩]
লোকে অপযশ মোর থুঁইবে নিদান।
মুই দুরাচারী অল্প তপকরী[৪]
এ রূপ দেখাব কারে লজ্জা পরিহরি।
বিধি নিদারুণ বড়ই দারুণ
তিলে না করিল দয়া ঘায় দিল চুন
শিরে কর তাড়ে উভে[৫] ডাক ছাড়ে
কাটা গেল কন্ধ যেন প্রাণী ধড় পড়ে।
ডাকে উচ্চস্বরে[৬] মহা শোকভরে
কোনদিগে গেলে প্রভু তেজে অভাগীরে।
বসন ভূষণ শূণ্য আভরণ[৭]
সভাই তেজিল প্রভু তোমার কারণ।
কঙ্কন নির্ভরে মারে নিজ শিরে
দশদিগ অন্ধকার হারায়্যা স্বামীরে।

১ পাঠান্তর—নগরের প্রাণী ২—কুধ্বনি.—অপযশ ৩ পা—তেজিব পরান ৪—তপস্যাকারিনী
৫ পা—উকে ৬ পা—প্রাণেশ্বরে ৭ পা—কঙ্কন বসব শূন্য আভরণ

করয়ে করুণা হারায়্যা চেতনা
হায় হায় বিধি আজ কি দিল যন্ত্রনা।
কোথা[১] বিষহরি আছগো ঈশ্বরী
মোরে কেন রাখ্যা গেল স্বামী বধ করি।
স্বামীর মরণ যেবা নারীগণ
দেখিয়া ধরয়ে প্রাণ কঠিন সে জন[২]।
বল কি করিব কোথা গেলে পাব
বান্ধিয়া তোমারে গলে সমোদ্রে ভাসিব।
করে মনে তাপ পাইয়া সন্তাপ
কেশ নাই বান্ধে রামা করয়ে বিলাপ[৩]।
রাত্র অবশেষ অরুণ প্রকাশ
নিদ্রা হৈতে উঠে লোক আইসে নানা দেশ।
পুহাল[৪] রজনী সনকা বাণ্যানী
পুত্র বধ্ দেখিবারে চল্যাছে আপনি।
সাতালি পর্বতে উঠিল ত্বরিতে
শুনিতে পাইল বধ্ লাগিছে কান্দিতে।
প্রাণে হৈল ভয় প্রবেশ বাসর
কবাট মুকায়্যা[৫] গেল বাসর ভিতর।
বেহুলার কোলে দেখিল কুমার[৬]
তেজিছে শরীর পুত্র ঘোর বিষজালে।
সনকা দেখিয়া পুত্রমুখ চায়্যা
নির্ভরে পড়িল বামা ত্রাসে মূর্ছা হৈয়া।
দুঃখের সাগরে বিধি থুইল মোরে
রচিল দ্বারিকা দাস মনসার বরে।

১ পাঠান্তর—মাতা ২ পা—যেবা নারী প্রাণ ধরে কঠিন সে জন ৩ কাঁদে করিয়া বিলাপ
৪ পা—পূর্ণ হৈল ৫ মুকায়্যা—খুলে ৬ পা—ছা আলে

ত্রিপদী

রাগ করুণা

সনকা চেতনা পায়্যা কোলে লক্ষীন্দর লয়্যা
মগ্ন হৈল শোকের সাগরে।
ক্ষণে ক্ষণে[১] দেখে মুখ অন্তরে বিদরে বুক
নির্ভরে কঙ্কন মারে শিরে ॥
পুত্রনিধি করি হারা যেন সে শ্রাবণ ধারা[২]
ভাসিল নয়ানযুগ নীরে।
ক্ষণে ক্ষণে মোহ যায় ক্ষণে পুত্রমুখ চায়
তিলে প্রাণ নাই বান্ধে স্থিরে ॥
ক্ষণে ডাকে পুত্র বলি হৃদে কাথে কোলে করি
পুত্রশোকে হারায়্যা চেতনা।
দহিল শরীর তার পুত্রশোকে বারে বার
সহিবে কতেক এ যন্ত্রনা ॥
কহ বাছা অভাগীরে বোল।
কালি তোর বিভা যায় কিছু না কহিলা মায়
কোথা গেলি শূণ্য করি কোল ॥
উঠ বাছা লক্ষীন্দর চলরে যাইব ঘর
কালি হৈতে আছ উপবাসী।
দধি অন্ন পঞ্চামৃতে খাইবে বধূর সাথে
অভাগী দেখিবে তাহা বসি ॥
নানা উপহার করি রাখ্যাছি ভাণ্ডার পুরি[৩]
উছুর[৪] হইসে দুঃখ বাসি।
জনম সফল করি পুত্র বধূ মুখ হেরি
পাপচক্ষে দেখি ঘরে আসি ॥
দেঅ বাছা সমাধান জুড়াউ আমার প্রাণ
নিষ্ঠুর হয়্যাছ কার বোলে।

১ পাঠান্তর—ঘন ঘন ২ পা—যেন শ্রাবণের ধারা ৩ পা—রেখেছি মন্দিরে পুরি ৪—দেরী, বিলম্ব

না শুনি উত্তর তোর পরাণ কাতর[১] মোর
দহে তনু শোকের অনলে ॥
তুমি নয়নের তারা দরিদ্রের যেন হীরা
অন্ধলার[২] যেন হাতনড়ি[৩]।
রত্নের ভাণ্ডার ঘরে কি নাই আমার পুরে
তোমা বিনা শূণ্য ঘর বাড়ি ॥
আমি পাপী দুরাচারী দশমাস গর্ভে ধরি
শয়ন সাজানু কার তরে।
চন্দ্রসম সাত সুতে সম্পিলু সাপের হাতে
বিধি বাম কি দোষে আমারে ॥
মনসা সাধিল বাদ আছিল মনের সাধ
পুত্রহাতে পাব পিণ্ডদান।
এ বড় দারুণ কথা বিদ্যমান মাতাপিতা
সাতপুত্র তেজিল পরাণ ॥
দান ধ্যান যগ্য[৪] কর্ম করিয়া অনেক ধর্ম
তবু পুত্র না পাইলু কোলে।
অপুত্রক যেই নর নিন্দিত ভূবনপর
শাস্তি যম দেয় অন্তকালে ॥
চাহিতে তোমার মুখ বিদুরিয়া যায় বুক
আছয় কঠিন প্রাণ মোর।
কত জন্ম পাপফলে এ দুঃখ আমার কুলে
শত্রু দেখি মুখ চায় তোর ॥
তেজিব নিশ্চয় প্রাণ ইহাতে নাইক আন
শোকে জর জর হৈল তনু।
দশদিগ অন্ধকার ঘর হৈল ভয়ঙ্কার
দোসর নাহিক তব বিনু ॥'
বেহুলারে হেন কালে সনকা চাহিয়া[৫] বলে
কোথা ছিল বধূ কুলক্ষণী।

১ পাঠান্তর—আকুল ২—অন্ধজনের ৩—হাতের লাঠি ৪—যজ্ঞ ৫ পা—দেখিয়া

বাসঘরে বিভারাত্রে নাশিতে আমার পুত্রে
এত কর্মে আন্যা ছিল জানি ॥
খণ্ড কপালিনী নারী খণ্ড তপ পূর্বে করি
খণ্ডাইলে আসি মোর সুখ।
দ্বারিকা দাসেতে বলে সনকা চরণ তলে[১]
অধিকে দুগুনে বাড়ে দুখ ॥

পয়ার

জয় জয় বিষহরী উরগো মনসা।
বিঘ্ন বিনাশিয়া মোর পূর্ণ কর আশা[২] ॥
সনকার কথা শুনি বেহুলা সুন্দরী।
বলিতে লাগিল কিছু মনে দুঃখ করি ॥
শুন শুন আগো মাতা বল অনুচিত[৩]।
কপালে আমার দুঃখ বিধির লিখিত[৪] ॥
আর ছয় পুত্র তোমার মরিল কেমনে।
আপনা স্বামীর দোষ না বিচার কেনে ॥
জল স্থল ব্যাপিত হৈয়াছে নাগগণ।
নাগের উপরে রাজা মনসা আপন ॥
তার সঙ্গে বাদ করে পরের নন্দিনী।
পুত্রে বিভা করি আন দুঃখ দিতে জানি ॥
কারে দোষ দিব মোর কর্মের লিখন।
বিভারাত্রে স্বামী খায়্যা আছিগো এখন[৫] ॥
শুন শুন ঠাকুরানী কহিগো তোমায়।
কলার মান্দাস সাজি দিবেগো আমায় ॥
যথা বিষহরী দেবী তার কাছে যাব।
স্বামীরে বান্ধিয়া গলে সমুদ্রে ভাসিব ॥

১ পাঠান্তর—দ্বারিকা দাসেতে ভণে, শুনিয়া বেহুলা মনে ২ পা—পূর্ণ কর বেহুলার মনে যত আশা ৩ পা—বলি নিবেদনে ৪ পা—ঘটনে ৫ পা—আছে কোন জন

যে হৈল প্রভুর গতি আমি তার সাথী।
মান্দাস বানায়্যা মোরে দেহ শীঘ্রগতি॥
বধূপ্রতি উপকার কর ঠাকুরানী।
অবশ হইল প্রাণ থাকুক কাহিনী॥
বর কন্যা দেখিবারে নগরের লোকে।
শিশু যুবা নারীগণ ধায় ঝাঁকে ঝাঁকে॥
অদ্ভূত দেখিয়া লোকে হাহাকার করে।
চেতনা হারাল লোকে দেখি লক্ষ্মীন্দরে॥
মুখে মুখে কলরব উঠে গণ্ডগোল।
অন্ত নাই ক্রমে বাড়ে শুনি কোলাহল[১]॥
সনকা বলেন শুন বেহুলা নাচনী।
বিপরীত কথা কহ কিভাবে না জানি॥
দারুণ যমের ঘর যায় যেই জন।
পুনর্বার জিয়াইতে নারে দেবগণ॥
দয়া যদি মনসার থাকিত হৃদয়।
সাতপুত্র শোক তবে মোরে কেন হয়॥
সমোদ্রে ভাসিতে চাহ কলার মান্দাসে।
বড় বড় ডিঙ্গা যথা না যায় সরসে[২]॥
এ নব যৌবনে তুমি যাবে কোথাকারে।
যে দেখি রাখিবে লয়্যা ডুবাবে সংসারে॥
বেহুলা বলেন মনে না ধরিঅ আন।
স্বামীর সহিত মোর আগে গেছে প্রাণ॥
নিরাশ করিল তোমা পুত্র হেন ধন।
আমা দেখি প্রতিদিন দগধে জীবন[৩]॥
স্বামীরে বান্ধিয়া গলে[৪] যাব দেবপুরে।
স্তিরিহত্যা দিব মাগো মনসা উপরে॥
স্বামী বিনা যেই নারী ধরয়ে জীবন।
বড়ই কঠিন কর্ম জন্ম অকারণ॥

১ পাঠান্তর—কর্ণে নাই শুনে কেহ বাড়ে কোলাহল ২ পা—নাই যায় ত্রাসে ৩ পা—আমাকে দেখিয়া নিত্য দগ্ধ হবে প্রাণ ৪ পা—আমি।

মরিল তোমার পুত্র হৃদে রৈল শোক।
সরিল সংসার মোর গেল দুই লোক ॥
দেহগো মান্দাস মোরে শীঘ্রগতি আনি[১]।
করুণা করিয়া বলে আকুল পরাণী ॥
মনসার পাদপদ্মে কবিরাজে গায়।
পুত্রের মরণ চান্দ শুনিবারে পায় ॥

ত্রিপদী

ক্রন্দন করয়ে বধূ শুনিতে পাইল সাধু
পুত্র মৈল লোহার বাসরে।
সবে করে গণ্ডগোল কলরব উতরোল[২]
সনকা রোদন তথা করে ॥
রজনীর শেষভাগে দংশিল কালিনী নাগে
বুঝিয়া সকল সমাচার।
হেন্তালের বাড়ি কান্ধে নাচিতে লাগিল চান্দে
আনন্দিতে হাসিয়া অপার ॥
বলে মোর ভাল হৈল[৩] পুত্র লক্ষ্মীন্দর মৈল
ঘুচিলেক কানির বিবাদ[৪]।
শিব বিশ্বনাথ বলি নাচে দুই বাহু তুলি
বড়ই নিষ্ঠুর তনু চাঁদ ॥
হাসি বলে চাঁদ বাণ্যা মড়া ফেল দূরে টান্যা
সনকা কান্দএ কি লাগিয়া।
চেঙ্গ মুড়ি বিষহরী উচিষ্ট করিল পুরী
পবিত্র করিব শীঘ্র হৈয়া ॥

১ পাঠান্তর—দেয় দেয়গো মান্দাস মোরে ঠাকুরানী ২ পা—উঠে রোল ৩ পা—দুঃখ গেল
৪ পা—ঘুচিল কানির বিসম্বাদ

পুত্রের দারুণ শোকে নানা কথা কহে মুখে
অভিমানে নিন্দে বিষহরী ।
হেনকালে সেই স্থলে সনকা আসিয়া বলে
অঝোর নয়নে দুঃখ করি[1] ॥
শুন ওহে সদাকর মৈল পুত্র লক্ষীন্দর
সাধিলে মনের অভিলাষ ।
অথল সমুদ্র জলে[2] ভাসায়্যা আমারে দিলে
দুই লোকে হইলু নিরাশ ॥
নারী জন্ম হৈয়া এত শোকে প্রাণ ধরি কত
আর আছে হৈয়া থাকে কারে ।
জলন্তা অনল যেন সাত বধূ ঘরে হেন
নিত্য দুঃখ কে সহিতে পারে ॥
নিত্য পুত্রশোকে ভালি হালি[3] মাংস হৈল কালি
নিকট মরণ ভেল আসি ।
শুন অপরূপ আর বেহুলার সমাচার
শুনি মনে অতি ভয় বাসি ॥
মৃত পতি বান্ধি গলে ভাসিবে অগাধ জলে
কলার মান্দাস আরোহণে ।
কাটি দেহ রামকলা সাজন করুক[4] ভেলা
নিষেধিলে নিষেধ না মানে ॥
অনুমতি দেঅ তায় পুত্র গেল বধূ যায়
নিষ্ঠুর শরীর সদাকর ।
মনসা দেবীর হটে এত পরমাদ ঘটে
শূণ্য হৈল মোর বাড়ি ঘর ॥
পুত্র না থাকিলে কোলে অপুত্রিক সভে বলে
প্রভাতে না দেখে কেহ মুখ ।
বিস্তর পাপের ফলে পুত্র মরে মার কোলে
অন্তে যম দেয় ঘোর দুখ ॥

১ পাঠান্তর—অঝোর নয়ান দুঃখ বেরি ২ পা—এ শোক সাগর জলে ৩ পা—হাড়, (হালি—সবুজ, কাঁচা অর্থে), ৪ পা—করিয়া

যেবা মাতা পিতা হয়্যা পুত্রে না করয়ে দয়া
পাপ প্রাণ ধরে অকারণে।
উদরেতে জন্ম দিয়া সাত পুত্র আমি খায়্যা
নিশ্চিন্তে বসিনু এতদিনে॥
শুনি সনকার কথা সাধু করে হেট মাথা
কাতর হইয়া অতিশয়।
মনসা চরণ রাজে[১] বন্দিয়া মস্তক মাঝে[২]
বৈদ্য শ্রী দ্বারিকা দাস গায়[৩]॥

পয়ার

করুণা করিয়া বলে চান্দ সদাকর।
শুনগো সনকা কিছু আমার উত্তর॥
জন্ম হৈলে মৃত্যু দেখ আছে সভাকার।
তার লাগি দুঃখ রামা না করিহ আর॥
পুত্র মৈলে বন্ধু কোন না আসয়ে ঘরে।
রামকলা গাছ দিতে নারিব তাহারে॥
রামকলা গাছ আমার যত গুণ ধরে।
একে একে কহি রামা শুনগো তুমারে॥
দেবগণ তুষ্ট হয় পকরম্ভা ফলে।
শ্রাদ্ধে তুষ্ট পিতৃলোক যাহারা বা করে[৪]॥
ভোজনে পৌরষ বড় হয়[৫] কলাপাতে।
মজ্জাতে[৬] বিশেষ গুণ[৭] বেঞ্জনের সাথে॥
উদরের পীড়া হরে কদলীর ফুলে।
দরিদ্র জনের মন তুষ্ট করে মূলে॥
পুত্রশোক যত মোর মনে নাই ধরে।
রামরম্ভা কাটিবারে হৃদয় বিদুরে॥
সনকা বলেন শুন নিদারুণ স্বামী।
পুত্র হৈতে রম্ভা তরু এত পাইলে তুমি॥

১ পাঠান্তর—তলে ২ পা—পরে ৩ পা—শ্রীযুত দ্বারিকা দাস কয় ৪ পা—যাহার বাকলে
৫ পা—ধরে ৬—থোড় ৭ পা—বিষম সুখ

সরিল সংসার মোর কি আর মুঁআস[১]।
কি করিবে দ্রব্য সব কি করিবে বাস।
শুনি সদাকর বলে অগোচরে মোর।
কাটিবে কলার গাছ যদি মনে তোর॥
ইঙ্গিত পাইয়া চলে সনকা বাণ্যানী।
আশ্বাসিয়া বেহুলারে বলে কিছু বাণী॥
ধর বোল ঘরে চল শুনগো বেহুলা।
সমুদ্রে ভাসএ কেবা আরোহিয়া ভেলা।
বিধবা লিখিল বিধি তোমার কপালে[২]।
ত্রিভুবনে খণ্ডাইতে পারে কার বোলে॥
কুলের নন্দিনী তুমি কুলবতী নারী।
অনাথিনী হৈয়া কোথা যাবে একেশ্বরী[৩]॥
রহিবে সংসার ভরি অযশ ঘোষণা।
ঘরে আইস মোর বোলে পাইয়া চেতনা[৪]॥
বেহুলা বলেন মাগো বল অকারণ।
বিধাতা লেখিল ভালে আমার এমন॥
মান্দাস বানায়্যা দেহ কাটি রামকলা।
গাঙ্গুড়ির খালে আজি ভাসিবে বেহুলা[৫]॥
যদি মনসার দাসী আমি পতিব্রতা।
জিয়াইব প্রাণনাথে এ বোল সর্বথা॥
দেখহ প্রদীপ জলে লোহার বাসরে।
এই তৈল ছ মাস জ্বলিবে নিরন্তরে॥
অকালে প্রদীপ যদি হইবে নির্বাণ।
সেইদিন স্বামী সঙ্গে যাবে মোর প্রাণ।
জানিয়া কারণ তবে সনকা বাণ্যানী।
কারিকরে লোক দিয়া ডাকাইয়া আনি॥

১ অ কর্ষণ ২ পাঠান্তর—বিধিতে লিখিল দুঃখ আমার কপালে ৩ পা—অনাথিনী হৈয়া দুঃখে যাবেগো কুমারী ৪ পা—সহিয়া যাতনা ৫ পা—আজু ভাসাইব ভেলা।

কাটাইয়া আনে তবে রামরম্ভাগণ।
চারি হস্ত পরিমানে মান্দাস সৃজন ॥
আসে পাশে দেয় তারে বাঁশের থাবাড়[১]।
নিমিষে অপূর্ব কৈল মান্দাস সজাড়[২] ॥
নিসার[৩] কলার গাছ চারিদিকে কাটি।
বন্ধন করেন দূরে[৪] করি পরিপাটি ॥
জন দশ শিরে করি কদলির ভেলা।
আনিয়া যোগায় দেখ যেখানে বেহুলা ॥
দেখি আনন্দিত হৈল বেহুলা সুন্দরী।
রচিল দ্বারিকা দাস ভাবি বিষহরী ॥

ত্রিপদী

দেখিয়া মান্দাস হইয়া উল্লাস
বেহুলা সায়ের সুতা।
ভাবি বিষহরী মান্দাস উপরি
নানা দ্রব্য তুলে তথা ॥
ঘাটের কিনারে মান্দাস উপরে
বিচিত্র সুপাটি[৫] পাতি।
অপূর্ব বালিসে রাখি চারি পাশে
শুআইল লখ্যা পতি ॥
জাস্তি দিল করে মস্তক উপরে
মুকুট বান্ধিল শিরে।
অগুরু চন্দন করিল লেপন
আপদ হরণ তরে ॥

১ গজাল জাতীয় বস্তু ২ ঠিক করে দেওয়া ৩ সারহীন ৪ পা—করিল দৃঢ়ে ৫ সুন্দর মাদুর।

মান্দাসেতে ভরা দিল কোল[১] সরা
কজ্জল পত্রিকা হাতে।
নৃত্যের সাজনী নিল যতখানি[২]
সর্পের ফাকুড়া[৩] তাতে ॥
প্রবেশি বাসরে ভাবি মনসারে
অগ্নিরে প্রণতি করে।
মনের উচাটে[৪] কিলিল[৫] কবাটে
নিবেদিল কিছু তারে ॥
শুনরে কবাট না ছাড়িহ বাট
বাসরে যাইতে কারে।
প্রাণনাথ পুন পাইলে জীবন
ভেটিয়া আসিব তোরে ॥
সান[৬] বড় যত হৈয়া প্রণমিত
শাশুড়ির পদধূলি।
বন্দিয়া মস্তকে দাঁড়াল সমুখে
নিবেদন কিছু বলি ॥
শুন ঠাকুরানী মাগিলু মেলানি[৭]
প্রভু যদি প্রাণ পান।
পুনর্বার আসি হব তব দাসী[৮]
নহে এই সমাধান ॥
পতিব্রতা নারী পৃথীমুখ হেরী
করিল অনেক স্তুতি।
যত কৈলু দোষ হও পরিতোষ
ক্ষমা দেহ বসুমতী ॥
করি প্রণিপাত যথা প্রাণনাথ
বেহুলা প্রবেশ হৈয়া।
ভাবি বিষহরী জয় জয় করি
মান্দাসে বসিল গিয়া ॥

১ পাঠান্তর—কোট ২ পা—সানা যত্র যেনি ৩ পেড়ি ৪ চাঞ্চল্যে ৫ বন্ধ করল ৬ ছোট
৭ বিদায় ৮ পাঠান্তর—চরণে সম্ভাবি।

স্বামীর চরণ করিয়া বন্দন
বসিল চরণ তলে।
কবিরাজে গায় মান্দাস খিয়ায়[১]
প্রথমে[২] গাঙ্গুড়ি খালে ॥

পয়ার
রাগ ভাস

এমনি হইবে বলি কেহ নাহি জানি।
কৃপা করি দয়া কর ভুজঙ্গ জননী[৩] ॥
কোথা আছ বিষহরী নাগগণ লৈয়া।
সেবক স্মরণ করে চাহ মা ফিরিয়া ॥
পুরগো মনের আশা শুনগো মনসা।
বিঘ্ন বিনাশিয়া মোর পূর্ণ কর আশা ॥
ভাসিল সমুদ্র জলে বেহুলা সুন্দরী।
যেন বনবাসে যায় জনক কুমারী ॥
তেজিল সংসার সুখ ফিরিয়া না চায়।
একান্তে ধরিল রামা মনসার পায় ॥
বিষহরী বিষহরী মনসা মনসা।
হৃদে যাপ্য[৪] কৈল এই পুরাইতে আশা ॥
সনকা বাণ্যানী কান্দে পুত্র বধূ দেখি।
শিশু যুবা নারী কান্দে হৈয়া অশ্রুমুখী ॥
আছাড় খাইয়া বলে লক্ষীন্দরের মায়[৫]।
উঞ্চে ডাক ছাড়ে পুত্র কোথাকারে যায়[৬] ॥
মান্দাস খিয়াল এথা বেহুলা নাচনী।
ভাসিয়া চলিল জলে সায়ের নন্দিনী[৭] ॥
না মানে জুয়ার ভাটা মনসার বরে।
দেখিতে না পারে লোক গেল কথোদূরে ॥

১ বেয়ে চলে ২ পা—প্রবেশে ৩ পাঠান্তর—তোমার চরণ বিনা অন্ত নাই জানি ৪ জপ
৫ পা—কান্দে লখাইর মাঝা ৬ পা—কোথা ছাড় যাঝা ৭ পা—দেখি সমীর না জানি।

চাঁপাতলে লাগে গিয়া বেহুলার মান্দাস।
ভাবিয়া জননী রামা ছাড়িল নিশ্বাস ॥
আকুলে করুণা করে বেহুলা সুন্দরী।
বলে আর পুনর্বার দেখিব কি পুরী ॥
সমুদ্রে ভাসিয়া যাই লয়্যা প্রাণনাথ।
মাতাপিতা ভ্রাতা সনে না হৈল সাক্ষাত ॥
ভাল মন্দ ঘরে না পাইল সমাচার।
জননী তেজিবে প্রাণ দুঃখেতে আমার ॥
সমাচার পাঠাইতে বেহুলার মন।
জানিল হৃদয়ে তথা মনসা আপন ॥
শ্বেত কাক রূপ ধরি দেবী বিষহরী।
কলকল শব্দ কৈল শূণ্য ভর করি[1] ॥
চাঁপা ডালে উড়ে বস্যা বলেন মধুর।
কাহার নন্দিনী কন্যা যাবে কার পুর ॥
অপরূপ দেখি তোমা এ রূপ[2] যৌবনে।
কলার মান্দাসে ভাস মৃত তনু সনে ॥
কেমনে ধরিল প্রাণ তোর মাতাপিতা।
এ রূপ যৌবনে দুঃখ লিখিল বিধাতা ॥
কহগো সুন্দরী মোর স্থির নহে মন[3]।
শুনিয়া বেহুলা কাকে দিল সমাধান ॥
পূর্ব পাপফলে মোর বিবাহের রাতি।
স্বামী হারাইয়া হৈল এতেক দুর্গতি ॥
নিছানি নগরে ঘর জননী অমলা।
পিতা সায় বাণ্যা মোর নাম ত বেহুলা ॥
শশুরের নাম মোর চান্দ সদাকর।
মনসা সহিত বাদ কৈল নিরন্তর ॥
বিভা করি পুত্র বধূ থুইল লোহা বাসে।
কালিনী দংশন কৈল[4] রাত্র অবশেষে ॥

১ পাঠান্তর—কলরব শব্দ করি আল্যা শূণ্যভরি। ২ পা—নব ৩ পা—কহগো সুন্দরী তুমি স্থির হউ প্রাণ। ৪ পা—দংশিল তারে।

কালি বিভা হৈল মোর আজি হেন গতি ।
আজন্ম মনসা ভাবি এতেক দুর্গতি ॥
যদি বিষহরী মোরে পতি দেন দান ।
নহে নারী হত্যা দিব কহিলু নিদান ॥
শ্বেত কাক বলে রামা শুনগো সুন্দরী ।
মৃততনু জিয়াইতে কার বাপে পারি ॥
কোথা বিষহরী তুমি যাবে কোথাকারে ।
আহার বলিয়া খাবে মকর কুম্ভীরে ॥
শিশুমতি সমুদ্রের না দেখ্যাছ রঙ্গ ।
পর্বত পাহাড় জিনি যাহার[১] তরঙ্গ ॥
এক এক সর্প আছে সমুদ্রের জলে ।
শতেক যোজন জীব পাইলে সে গিলে ॥
মৎসেতে[২] গিলিয়া দিবে কন্নার মান্দাস ।
সাহস না কর রামা যাঅ নিজ বাস ॥
বেহুলা বলেন কাক কহিলু নিশ্চয় ।
সমুদ্রে ভাসিয়া কিবা মরণের ভয়[৩] ॥
এক নিবেদন মোর নেঅ শ্বেতকাকে ।
নিছানি নগরে যাবে মায়ের সমুখে ॥
প্রভুর হস্তের লেহ সুবর্ণ অঙ্গুরী ।
নিসানি[৪] মায়েরে দিয়া কয় কথা চারি ॥
বাসঘরে স্বামী খাইল বেহুলা নাচনী ।
ভাসিল সমুদ্রজলে জানিবে জননী ॥
দুঃখ না করেন যেন আমার কারণ ।
আপশোষ হৈল মনে না দেখি চরণ ॥
এই নিবেদন লৈয়া যাঅ শ্বেতকাক ।
সুবর্ণ বান্ধিয়া দিব তোমা দুই পাখ ।
বেহুলার করুণা শুনি দেবী বিষহরী ।
সুবর্ণ অঙ্গুরী মাতা নিল খোটে[৫] ভরি ॥

১ পাঠান্তর—ভাজে জাহাজে ২ পা—ইঙ্গিতে ৩ পা—ভাসিতে চাই মনে কিবা ভয় ৪ নিদর্শন ৫ ঠোঁট ।

নিছানি নগর মাঝে চলিল তরায় ।
মনসা মঙ্গল গীত[১] কবিরাজে গায় ।

*লইয়া সন্দেশ উড়িল কাকে ।
গগন পবন উড়িল পাখে ॥
বেহুলার দুখে দুখিত হয়্যা ।
নিছানি নগরে প্রবেশ যায়্যা ॥
সায় সদাকর প্রধান সাধু ।
গুণী ঘরে আছে যুগল বধূ ॥
শাশুড়ি সহিতে বাহারে থাকি ।
স্নান করিবারে হরিদ্রা মাখি ॥
হেনকালে কাক প্রবেশ তথা ।
অঙ্গুরী ফেলিল অমলা যথা ॥
বরণ অঙ্গুরী চিনিল ধনি ।
সাত পাঁচ মনে ভাবিল গুনি ॥
বলে এ অঙ্গুরী বরণ বেলে[২] ।
জামাতারে দিলু বিভায় কালে ॥
কিরূপে অঙ্গুরী পাইল কাকে ।
না জানি বিধাতা কি কৈল তাকে ॥
বেহুলার কথা জাগিল হৃদে ।
কিএ অপরূপ দেখিলু ভেদে[৩] ॥
অমলা জিগ্যাসে কাকেরে বাণী
কোথা হৈতে আল্যে কহনা শুনি ॥
অঙ্গুরী পাইলে কাহার বাসে ।
কি লাগি ফেলিলে আমার পাশে ॥
জান কি আমার বেহুলা কথা ।
চঁপা নগ্র গ্রামে দিয়াছি তথা ॥
বিভাদিনে[৪] কালি পাঠায়্যা তারে ।
দশদিক শূণ্য হয়্যাছে মোরে ॥

১ পা—মনসার পাদপদ্মে * প্রথম আট ছত্র ভিন্ন পুঁথির পাঠ ২ সময়ে ৩ পাঠান্তর—বলে কিবা হৈল মনসা বাদে ৪ পা—ভাবি মনে ।

শ্বেতকাক বলে শুনগো রামা।
সন্দেশ পাঠাল বেহুলা তোমা॥
লোহার বাসরে সাধুর পুত্রে।
নাগিনী দংশিল বহুত রাত্রে॥
স্বামীর বিনাশ দেখিয়া বালা।
কাটী রম্ভাতরু সাজাল ভেলা॥
কান্ত লক্ষ্মীন্দরে লইয়া কোলে।
প্রথমে ভাসিল গাঙ্গুড়ি খালে॥
চাঁপাতলে আসি মান্দাসি লাগে।
আতঙ্কে আরতি করিল মোকে॥
বলিল মায়েরে কহিঅ মোর।
সমুদ্রে ভাসিল বেহুলা তোর॥
ইহ জন্ম মত না হৈল দেখা।
মাতা পিতা ভ্রাতা যতেক সাখা॥
কি গুণ শোধিব মায়ের যত।
কর্ম্মে বিধি মোর লেখ্যাছে এত॥
দুঃখের সাগরে ভাসিলু আমি।
দুঃখ যেন মাতা না কর তুমি॥
এই সমাচার আমার হস্তে।
পাঠাইল রামা করুণা চিতে॥
বিস্তর নিষেধ করিলু[১] তারে।
কঠিন উত্তর দিলেক মোরে॥
যদি পার পুত্রে পাঠাঅ[২] তুমি।
আন গিয়া ঘরে কহিলু আমি॥
কহ্যা[৩] বিবরণ উড়িল কাকে।
অন্তর্ধানে মাতা গেলেন সুখে॥
নিদারুণ কথা শুনি অমলা।
নির্ভরে পড়িয়া ডাকে বেহুলা॥

১ পাঠান্তর—কৈলুগো ২ পা—পাঠায়্যা ৩ পা—কহি

হরিল চেতনা কন্যার শোকে।
কেহ জল আনি সিঞ্চয়ে মুখে ॥
উঠে গণ্ডগোল সায়ের পুরে।
সভাকার চক্ষু ভাসিল নীরে ॥
কে বলে কাকের সত্য কি কথা।
কুশলে আছয়ে তোর জামাতা ॥
চেতনা পাইয়া অমলা বলে।
কাক নহে ইহা চিনিলু ভলে[১] ॥
কহিল সকলি কথার ছলে।
অন্য হৈলে কেবা এরূপ বলে ॥
সায় সদাকর প্রিতয়[২] গেল।
অঙ্গুরী চিনিয়া আকুল ভেল ॥
সাত পুত্র ডাকিয়া পাশে।
করুণা করিয়া বোলয়ে শেষে ॥
যাঅ যাঅ তোরা না কর হেলা।
স্থির কর প্রাণ আনি বেহুলা ॥
কাকের বচনে শুকাল হিয়া।
চঁপা তলে যাঅ গাঙ্গেরে চায়্যা ॥
বাপের বচনে চলিল সুতে।
সন্দেশ লইল লোকের হাতে ॥
সজল লোচনে গমন করে।
দেখে অমঙ্গল প্রথম দ্বারে ॥
হাঁচি জেষ্টী[৩] বাধা পড়িল শত।
যোগিনী সাপিনী দেখিল কত ॥
কাতরে এ সব[৪] না ধরে মনে।
উপনীত চঁপা তরু যেখানে ॥
বৈদ্য দ্বারিকা দাসেতে গায়।
বেহুলা ভাসয়ে দেখিতে পায় ॥

১ ভালো করে ২ পাঠান্তর—প্রতএ [প্রত্যয়] ৩ জেঠী, টিকটিকি ৪ পা—সে সব।

পয়ার

যাদব মাধব হরি মুকুন্দ মুরারি।
সুলোচন শ্রীনিবাস সাত ভাই হেরি ॥
কান্দিয়া বলে বেহুলা অঝোর করুণে[১]।
আইসরে প্রাণের ভাই দেখিরে নয়নে ॥
ভাই বিনা বন্ধু নাই সংসার ভিতরে।
পুরিল মনের দুঃখ দেখি সভাকারে ॥
ঘরে যাঅ ভাই সব তেজি মোর আশা।
অভাগী বেহুলা কর্মে ছিল এত দশা ॥
হারাইয়া প্রাণনাথ লোহার বাসরে।
বিধাতা ভাসাল মোরে দুঃখের সাগরে ॥
এত দুঃখ কর্মে মোর ছিল শিশু কালে।
আগত দুঃখের দশা কি আছে কপালে[২] ॥
পূর্বে আমি[৩] কার সুখ করেছি খণ্ডন।
নিদারুণ দুঃখ মোর হৈল তে কারণ ॥
মায়েরে কহিঅ ভাই এ দুঃখ সকল।
হর হরি কি করিবে দৈবে করে বল ॥
রাখরে সন্দেশ ভাই চাঁপাতলে খুলি।
বিধাতা করিলে খাব পুনর্বার তোলি ॥
যদি পুনরায় মোর পতি প্রাণ পান।
দেখিব সভায় নহে এই সমাধান ॥
**পিতার চরণে মোর দিবে নমস্কার।
প্রবোধ করিঅ বাপে দেখা নাই আর ॥
বেহুলার কথা শুনি বলে সাত ভাই।
করুণা না কর বেলা[৪] আস্ত ঘরে যাই ॥
বাপের সম্পদ তুমি মায়ের পরাণ ॥
এ সকল শুনি প্রাণ[৫] হারাবে নিদান ॥

১ পাঠান্তর—অঝুর নয়নে ২ পা—স্বপনে না দেখি বিধি কি লিখিছে ভালে। ৩ পা—পূর্বজন্মে
** দুটি ছত্র ভিন্ন পুথি থেকে সংগৃহীত। ৪ পা—করিয়া বলে ৫ পা—অকারণে প্রাণ কেন।

জন্ম হৈল মরণ আছয়ে সভাকার।
ছাড়িলে শরীর প্রাণ না আসিবে আর॥
স্বামী কার নাই ঘরে সংসার ভিতরে।
কোন নারী ভাস্যা যায় সমুদ্রের নীরে[১]॥
শশুর শাশুড়ী ঘরে কত পাইলে দুখ।
কে বলিতে পারে কিবা কিসের বৈমুখ॥
ভাস্যা যাঅ সমুদ্রে মোরা কোথা যাব[২]।
মাতাপিতা তোমা শোকে পরাণ হারাব॥
মোর ঘরে আইস থাক হইয়া জননী।
সাত বধূ উপরে হইবে[৩] ঠাকুরানী॥
বেহুলা বলেন ভাই কত বল মোরে।
স্বামী বিনে নারী দুঃখ না যায় সংসারে॥
পরকন্যা পরপুত্রে বিধাতা ঘটন।
একা পতি বিনে গতি নাই নারীজন॥
করিতে অনেক[৪] দয়া আছে এ সংসার।
তথাপি স্বামীর সম না করিবে আর॥
পুরুষের নানা গতি শুনেছি পুরাণে।
নারীর কেবল গতি নাই স্বামী বিনে॥
এ রূপ দেখাতে ভাই যাব কোথাকারে।
ভাউজে[৫] দিবেন গালি খায়্যাছে ভাতারে[৬]॥
আপনার কর্মভোগ আপনি যে করে।
এই পরিবোধ দেঅ জননী পিতারে॥
যাঅ যাঅ ভাইসব দিবস উছুর।
দেখিনু জন্মের মত যাঅ নিজপুর॥
**কান্দিল কঠিন প্রাণ পাষাণের সনে।
সরিল সংসার মোর প্রভুর মরণে॥

১ পাঠান্তর—সমুদ্র ভিতরে। ২ পা—ভাসিয়া সমুদ্রে তুমি কোথাকারে যাবে ৩ পা—সাত, বধূ পরে তুমি হবে ৪ পা—আমারে করিতে ৫ ভ্রাতৃবধূ ৬ ভাতারে—স্বামীকে।
* ‡ শেষ দুই ছত্র ভিন্ন পুনি থেকে সংগৃহীত।

বিদায় মাগিয়া দেখ বেহুলা সুন্দরী।
মান্দাস খিয়াল শীঘ্র মায়া পরিহরি॥
বেহুলার শোকে তবে সাত সহোদর।
ফিরাঅ মান্দাস ডাকে হইয়া কাতর॥
না মানে কাতর কথা বেহুলা নাচনী।
সাত ভাই জলে ঝাঁপে ধরিতে তরণী[১]॥
পড়িল প্রবল স্রোতে না পারে যাইতে।
অস্থির পরাণ[২] হৈল সমুদ্র জলেতে[৩]॥
দেখিয়া গঙ্গায় স্তুতি করএ বেহুলা।
দুঃখের উপরে মাগো দিলে দুঃখ জ্বালা॥
পুরুষের হত্যা লাগে আমার উপরে।
কৃপা করি সুরেশ্বরী কুলে তুল তারে॥
করিল অনেক স্তুতি সায়ের নন্দিনী।
দেখিয়া সদয় হৈল পতিতপাবনী॥
তরঙ্গ বাড়ায় বাতা পর্বত সমান।
এক ঢেউ তুল্যে সভে দিল প্রাণ দান॥
দেখিয়া বেহুলা তবে মান্দাস খিয়ায়।
কোন দিগে গেল ভেলা দেখিতে না পায়॥
বিস্তর করুণা করি সাত সহোদর।
কান্দিতে কান্দিতে গেল আপনার ঘর[৪]॥
শুমগড়[৫] নন্দীগ্রামে এ গীত বর্ণন।
মনসা মঙ্গল গীত করিবারে কন।

১ পাঠান্তর—ঝাঁপ দিল ধরিবারে তরি। ২ পা—চরণ ৩ পা—পরাণ সহিতে ৪ পা—নিছানি নগর ৫ নন্দীগ্রামের (মেদিনীপুর) নিকটবর্তী গ্রাম।

ত্রিপদী

ভাবি বিষহরী বেহুলা সুন্দরী
মান্দাস খিয়ায়া[১] যায়।
উজানি ভাটানি নাই জানে পানি
ইছায় মান্দাস ধায়॥
হয়্যা সে চমক বাহে কত বাঁক
বেহুলা সায়ের সুতা।
হাতিয়ার দহে একরাত্রি রহে
মনসা ভাবিয়া তথা॥
যুধিষ্টি গোবিন্দ পুরেতে আনন্দ
চলে বিষহরী ধ্যায়া।
বর্ধমান বায় খুড়পুরে[২] যায়
দিপুরে প্রবেশে গিয়া॥
সূর্যের কিরণ লাগে অনুক্ষণ
লখাইর কলেবরে।
রাতেতে শিশির তাতে সুনা নীর
তনু কি সহিতে পারে॥
**দেহ প্রাণ বিনু নষ্ট হৈল তনু
বর্ণহীন হৈল অতি।
মলিন সমান শরীর হৈল হীন
মান্দাস খিয়ায় তথি॥
সর্বাঙ্গে সুন্দর বালা লক্ষীন্দর
দিনে দিনে তনু সড়ে[৩]।
পায়্যা পচা ঘ্রাণ জল জন্তুমান
মান্দাস উপরে পড়ে[৪]॥

১ পাঠান্তর—ভাসিয়া ২ পা—গঙ্গাপুর **চার ছত্রের স্তবক অন্য পুঁতি থেকে সংগৃহীত।
৩ পচে যায় ৪ পা—ধারেতে বেড়ে।

তাড়য়ে বেহুলা বাহে দূরে ভেলা
প্রবেশে কেদার ঘাটে।
মূর্তিময়ী তথা বিষহরী মাতা
বিরাজয়ে দিব্য মঠে[১] ॥
দেখিয়া বেহুলা রাখিলেন ভেলা
পূজা কৈল মনসায়।
**তিন রাত্র দিবা প্রাণপনে সেবা
বেহুলা করিল তায়॥
সিদ্ধরূপী তথা বিষহরী মাতা
ডাক দিলে আচম্বিতে।
কে করিল পূজা কার্য পাবে যা যা
নির্বিঘ্নে ভাসিয়া স্রোতে ॥
শুনি বেহুলার আনন্দ অপার
চলিল প্রণতি করি।
সে ঘাটে রাখাল নব লক্ষ পাল
সে ঘাটে প্রবেশে নারী ॥
সহস্র রাখাল লয়্যা ধেনুপাল
আনন্দে বিহার করে।
বেহুলারে দূরে দেখিয়া নির্ভরে
আনন্দ সভা অন্তরে ॥
রূপে বেহুলার প্রকাশ সংসার
দুকুল গাঙ্গের শোভা।
যেমনি বিজুরি মঞ্চে অবতরি
শরীর ধরিবে কেবা[২]॥
কে বলে এ নারী মায়ারূপ ধরি
কিবা রাক্ষসিনী কলা।
বসিয়া মান্দাসে ধরিয়া মানুষে
আইসে পাতিয়া ছলা ॥

১ পাঠান্তর—বিরাজে নদীর তটে * * * অর্ধ স্তবক অন্য পুথি থেকে সংগৃহীত ২ পা—স্বর্গ অপস্বরী কিবা।

কে বলে এ নারী রাজার কুমারী
কে বলে কুলের বধূ।
কিবা অপকার্যে[1] আল্য জলমাঝে
লাজে ঢাকে মুখবিন্দু॥
গন্ধর্ব কিন্নরী স্বর্গ বিদ্যাধরী
সভে অনুমান করে।
চাহিয়া নিমিষে আইসে নিবাসে[2]
পবন জিনিয়া ধরে[3]॥
যতেক রাখাল হইল পাগল
বেহুলার রূপ দেখি।
করমের[4] ছলে বেহুলারে বলে
উচ্চ রবে সভে ডাকি॥
বলে কোথা যাস্য ফিরাঅ মান্দাস
ভুবন মোহিনী রামা।
আস্ত মোর ঘরে যা চাহিবে তোরে
তোষিব সে দ্রব্যে তোমা॥
দধি দুগ্ধ সর খাবেগো বিস্তর
ঘৃত ভাতে নিরন্তর।
আর একজন বলয়ে বচন
মোর কথা হৃদে ধর॥
এ বড় কাঙ্গাল স্বভাবে রাখাল
আমি অতি ভাগ্যবান।
আস মোর বাসে দেখনা হরিষে
বিধির দুর্লভ স্থান॥
সুবর্ণের চুড়ি দিব পাট শাড়ি
শয়ন পালঙ্ক পরে।
শুনরে রাখাল স্বভাবে চঞ্চল[5]।
বেহুলা উত্তর করে॥

১ পাঠান্তর—অপরাধে। ২ পা—মান্দাসে। ৩ দ্রুত গতিতে। ৪ পা—বচনের। ৫ পা—নানা রূপে নানা কহে সব জনা।

না জান সুগ্রব কথা।
ধেনু লয়্যা বনে ফির রাত্রি দিনে
নব নব তৃণ যথা ॥
দেখি পরনারী শঙ্কা দূর করি
লয়্যা যাতে চাহ বাসে।
যত বড় ধনী অনুমানে জানি
গোধন পালক[১] আশে ॥
যদি ঘরে অন্ন থাকিত বসন
তবে কি এ দুঃখ বাস।
ভাল মন্দ কর্ম নাই জান ধর্ম
ভব্য সঙ্গে নাই বৈস।
কহিয়া বেহুলা ভাসাইয়া ভেলা
সহস্র রাখাল মেলি।
ধরিতে মান্দাস করিল সাহাস
সভে জলমধ্যে উলি[২] ॥
গোধন রক্ষকে বেহুলারে ডাকে[৩]
ত্বরিতে মান্দাস ফিরা।
সহস্র রাখালে জলের হিল্লোলে
ডুবাইবে তোর ভেলা ॥
না শুনে সুন্দরী ভাবি বিষহরী
মান্দাস পবনে উড়ে।
সহস্র রাখাল অগ্যানে সকল
ঝাঁপ দিয়া জলে পড়ে ॥
কেহবা সাস্তারে কেহ যাইতে নারে
কেহ কেহ জল খায়।
কেহ স্রোতে পড়ে কেহ ডাক ছাড়ে
কেহ কার মুখ চায় ॥

১ পাঠান্তর—পালন। ২ নেমে পড়ে। ৩ পা—বলিল কৌতুকে।

কেহ হাত তুলি ডাকে আস্থ বলে
সহস্র পুরুষে বধি।
যাঅ কোথাকারে এহি আস ভরে[১]
ডুবাবে মান্দাস বিধি॥
আতঙ্ক সভার দেখি বেহুলার
করুণা বাসিল অতি।
মনসা চরণ করিয়া স্মরণ
গঙ্গারে করিল স্তুতি॥
পূর্বজন্ম পাপ করিয়া সন্তাপ
পাই আমি অভাগিনী।
সহস্রেক নরে হত্যা মোর তরে
দেয় শুন ঠাকুরানী॥
মরে তব জলে কৃপা করি কূলে
উদ্ধারহ একবার।
দয়ার সাগরী বিষ্ণু অংশধারী
হরিলে পাপের ভার॥
শুনি তার বাণী পতিত পাবনী
তরঙ্গ বাড়াল জানি।
রাখাল সকলে দিয়া তুলে কূলে
সন্তালে[২] আপনা পানি॥
পাইল জীবন সহস্রেক জন
বেহুলা হাসেন[৩] দেখি।
জয় জয় দিয়া মান্দাস থিয়ায়া
চলে রামা বিধুমুখী॥
বায়্যা সেই[৪] পানি চলিল ভাটানি
কেবল দক্ষিণ মুখে।
কবিরাজে গায় কথোদূরে যায়
দেখে গোদা বেহুলাকে।

১ পাঠান্তর—পাপভরে। ২ সামলে নেয়। ৩ পা—হরষ ৪ পা—বাহিয়া সে।

একপদী

ভাসিয়া সুন্দরী বেহুলা যায় ।
কথোদূরে গোদা দেখিতে পায় ॥
বড়শীর দাণ্ড ধরেছে হাতে ।
কুচিয়া[১] আধার কোচের পাতে ॥
দারুণ চরণে গোদের ভরা ।
পিঠে তিনি কুব্জ বয়সে জরা ॥
গলে-ফেলি আছে মৎসের থালা ।
দূর হৈতে তারে দেখে বেহুলা ॥
গলে ফেলিয়াছে মৎসের খোঁচা[২] ।
পরি ছিঁড়া ধুতি ভাঙ্গিছে কোঁচা ॥
বড়ই বিরল মাথার কেশ ।
চলিতে ভঙ্গিমা কুছিত বেশ ॥
হৃদে লাগিয়াছে নিশ[৩] দাড়ি ।
তৈল বিনা পিঠে উড্যপছে খড়ি ॥
বেহুলারে দেখে সুবেশ ধরে ।
বড়শীর দাঁড় ফেলিল দূরে[৪] ॥
বনে লুকাইল মৎসের থালা ।
দূর হৈতে তারে দেখে বেহুলা ॥
কুব্জে ঢাকাইল পুরুণা কানি ।
কচু পাতা গোদে ঢাকিল আনি ॥
উভা[৫] হৈয়া কুজা বসিতে চায় ।
টলমল হৈয়া আছাড় খায় ॥
অনেক প্রকারে উঠিয়া বসি ।
হেন কালে বেউলা সেথানে আসি ॥
গোদা বলে রামা যাবে গো কোথা ।
ভুবন মোহিনী কাহার সুতা ॥

১ টেপের জন্য ব্যবহৃত ছোট মাছ ২ খাঁচা, খালুই অর্থে ৩ গোঁফ ৪ পাঠান্তর—বড়শী ফেলিয়া দিলেক দূরে। ৫ উবু হয়ে

এ রূপ যৌবনে তেজিয়া পুরী।
কি লাগিয়া জলে ভাসগো নারী॥
বেহুলা বলেন কহিহে তোমা।
নাগিনী দংশিল প্রভুরে[1] আমা॥
বিভা রাত্রে মোর এতেক দশা।
ভাসিনু সমুদ্রে ভাবি মনসা॥
যদি বিষহরী জিয়ান[2] পতি।
নহে হব আমি স্বামীর সাথী॥
গোদা বলে রামা ফিরাঅ মান্দাস।
মড়াটা লয়্যারে কোথারে যাস॥
মোর ঘরে আইস বলিগো তোরে।
ছয় নারী মোর আছয়ে ঘরে॥
দাসী করে দিব এ ছয় জনা।
মার কাট নাই করিব মানা॥
পালঙ্ক উপরে থাকিবে সুখে।
নানা আভরণ পরাব তোকে॥
দধি অন্ন ঘৃত প্রস্তর[3] থালে।
পাকা পান দিব সিন্দুর ভালে॥
হরিদ্রা চন্দন মাখিবি অঙ্গে।
তুলা জলে স্নান করিবি রঙ্গে॥
বেহুলা বলেন ধিকরে গোদা।
ধর্ম পথে তোর এতেক বাধা॥
উঠিতে না পার গোদের ভারে।
নিদারুণ কন্যা দিলে কে তোরে॥
পিঠে তিনি কুজ বিরল কেশ।
তৈল বস্ত্র বিনু চণ্ডাল বেশ॥
ভূত প্রেত তোর এ রূপ দেখি।
পালাইবে দূরে হৈয়া বিমুখী[4]॥

১ পাঠান্তর—স্বামীরে ২ পা—দেন গো ৩ পা—সুবর্ণ ৪ পা—মুদিয়া আঁখি

বড়শী আড়িয়া পোষরে প্রাণ।
পরনারী দেখে কররে মান॥
বসন বিহনে পরেছ কানা[১]।
রামকড়ি কানে কে দিল সোনা॥
ব্যর্থরে জীবন ধরেছ ভালে।
কেমনে কামিনী ধর‍্যাছে কোলে॥
মান্দাস খিয়াল বেহুলা বেগে।
দেখি গোদা বলে অত্যন্ত রাগে[২]॥
শুনরে অবলা কি গ্যান তোর।
অবগ্যা করিলি বচনে মোর॥
গোদা দেখি তোর না বসে মনে।
এড়াইতে আজু নারিবি প্রাণে॥
মান্দাস ছাড়িয়া উঠরে কূলে।
নহে ঝাঁপ দিয়া আনিব ভালে॥
না শুনে উত্তর চলিল বালা।
ঝাঁপ দিল গোদা ধরিতে ভেলা॥
একে গোদভরে চলিতে নারে।
পড়িল প্রবল স্রোতের ভরে॥
গোদে জড়াইল বিষম পাকে।
চরণের ভারে পড়িল ঠেকে॥
নাকে মুখে জল বিস্তর খায়।
ক্ষণে ডুবে ক্ষণে উপরে চায়॥
অবশ শরীর হইল আসি।
বেহুলা মান্দাসে দেখেন বসি॥
স্তুতি কৈল বেহুলা গঙ্গার পায়।
কৃপা করি মাতা তুলিল তায়[৩]॥
মনসা চরণে রাখিয়া মতি।
কবিরাজে বলে পাবে গো পতি॥

১ পাঠান্তর—টেনা ২ পা—অতি রাগে গোদা প্রবেশ আগে ৩ পা—তুল গো তায়।

পয়ার

মনসা মঙ্গল সবে শুন দিয়া মন।
বিঘ্ন কৈলে ক্রোধ হন মনসা আপন॥
একমনে একচিতে যে শুনে এহারে।
সর্পভয় পীড়া হরে তাহার মন্দিরে॥
কুলে উঠে গোদা গিয়া বেহুলা কৃপায়।
ভাবিয়া হৃদের মধ্যে চিন্তিল উপায়॥
জানিলু কে দেবকন্যা মান্দাস উপরে।
বিড়ম্বিয়া গেল পুন উদ্ধারিয়া মোরে॥
কুলে দাঁড়াইয়া গোদা[১] উভরায় ডাকে।
বলে ক্ষম অপরাধ নিবেদি তোমাকে॥
ধর্মাধর্ম নাহি জানি পাপিষ্ঠ পরাণ।
কৃপা কর থাকু যশ ঘুঁচাতে নিদান॥
বুঝিয়া গোদার মন বলেন সুন্দরী।
সর্বাঙ্গে সুন্দর হৈয়া যাঅ নিজ পুরী॥
অন্যথা না হৈল যে বলিল পতিব্রতা।
গোদ আর কুজ তার পালাইল কোথা॥
ধরিল অপূর্ব তনু বেহুলার বরে।
প্রণতি করিয়া দেখ গোদা যায় ঘরে[২]॥
দূর হৈতে ডাক পাড়ে ওরে মাধার মা।
দেখনা আসিয়া আমার মনোহর গা॥
ঘটাইল সতী কন্যা হইলু সুন্দর।
গোদা নাম গেল মোর সংসার ভিতর॥
গোদা স্বামী বলি[৩] গালি দেঅ নিরন্তর।
মনোরম পাইলে পতি জানি সেবা কর॥
আনন্দিতে বৈসে গিয়া আপনার বাসে।
হেনকালে মাধার মা আল্য তার পাশে॥
চিনিতে না পারে নারী আপনার পতি।
গোদ কুঁজ নাই তার পূর্বের আকৃতি॥

১ পাঠান্তর—কুলে কুলে গোদা ২ পা—পরম আনন্দে দেখ গোদা যায় ঘরে ৩ পা—দেখিয়া।

বলে নারী কোথা হৈতে আইলি বাতুল।
ক্রোধভরে বাম হাতে ধরে তার চুল॥
ঝাটা মুণ্ডা[1] গণ্ডা দশ মারে তার ঘাড়ে।
পড়শীরে বিপরীত গোদা ডাক ছাড়ে॥
ধাই আইস ওরে ভাই দেখ বিপুরীত।
অদ্ভুত মাধার মার দেখনা চরিত ॥
যতলোক আইসে কেহ চিনিতে না পারে।
বাতুল বলিয়া সভে দ্বিগুনেতে মারে॥
সহিতে না পারে গোদা মারনের ঘা।
বলে কি করিলি মোরে ওগো মাধার মা ॥
পুন ফির‍্যা যায় গোদা যায় নিকেতনে।[2]
দ্বিগুনে হউক গোদ তোমার চরণে॥
গোদ কুঁজ হৈল তার বেহুলার বরে।
পরম আনন্দ হৈয়া গোদা যায় ঘরে॥
বেহুলা সুন্দরী তবে মান্দাস খিয়ায়।
তেজিয়া গোদার ঘাট চলিল ত্বরায়॥
রাত্রদিন বায় মুখে নাই দেয় পানি।
হুগলি হইয়া পার বাহিল ত্রিবেনী॥
লাগিল গঙ্গার জল লখীন্দর গায়।
গলিত হইয়া তনু মিলাইয়া যায়॥
চর্ম রক্ত মাংস মেদ ক্রমে অস্থি ছাড়ে।
তথাচ কালীর বিষ ভেদিয়াছে হাড়ে॥
কাক চিল আদি উড়ে পচা ঘ্রাণ পায়্যা।
কুমীর মগর ভাসে মান্দাস দেখিয়া॥
কেবল লখাই রহিল অস্থি চর্ম সার।
বেহুলার মনে নাই পাপ পুণ্য আর॥
পতঙ্গ ডাংসক মাছি ধায় পালে পালে।
বেহুলা তাড়ন করে নেতের আঞ্চলে॥

১ ঝাঁটা দিয়া ২ পাঠান্তর—বেহুলা বলেন গোদা যাও নিকেতনে

নিকট হৈতে নর নারে তার ঘ্রাণে।
অগুরু চন্দন বাসে বেহুলার মনে ॥
ধন্য পতিব্রতা নারী বেহুলা রমনী[১]।
রাখিল সংসার মাঝে সুযশ কাহিনী ॥
তিলে অন্য ভাব চিতে না হইল তার।
কুক্কুর ঘাটায় রামা কৈল আগুসার ॥
মনসা ভাবিয়া রামা ধীরে ধীরে যান।
ধাইল কুক্কুর সব পায়্যা পচা ঘ্রাণ ॥
আস্তে ব্যস্তে ঝাঁপ দিল মাংসের লালসে।
ভাসিয়া লাগিল আসি মান্দাসের পাশে ॥
দারুণ কুক্কুর সেই নিষেধ না মানে।
নির্ভরে শাঁপিল বেহুলা ক্রোধিত বচনে[২] ॥
কোনখানে আছরে কুম্ভীর দুরাচার।
কুক্কুরে লইয়া বেগে কররে আহার ॥
বেহুলার বাক্য তায় না হইল আন[৩]।
কুম্ভীরে ধরিল আসি কুকুরে নিদান[৪] ॥
মনসার পাদপদ্মে কবিরাজ গায়।
কুক্কুরে কুম্ভীর জলে ডুবাইয়া খায়॥

ত্রিপদী

পতিব্রতা সতী চলে শীঘ্রগতি
তেজিয়া কুক্কুর ঘাটে।
ভাসে পাঁচমাস নাহি অবকাশ[৫]
তিলে কুলে নাহি উঠে ॥
সংকট অপার হৈয়া গেল পার
জানিল মনসা ধ্যানে।
বিড়ম্বিতে তারে আইল নদী তীরে
তেজিয়া আপন স্থানে ॥

১ পাঠান্তর—নাচনী ২ পা—নয়ানে ৩ পা—না হয় লংঘন ৪ পা—কুকুরে কুম্ভীর জলে ডুবাইয়া খান। ৫ পা—নাই কর ত্রাস

দধি দুগ্ধ সর ছেনা ঘৃত ক্ষীর
পসরা সাজায়্যা মাথে।
ভুবন মোহিনী হৈয়া গোয়ালিনী
বসিল ঘাটের পথে॥
হেন কালে বেহুলা ভাসাইয়া ভেলা
উপনীত বরাবরে।
কহে বিষহরী শুনগো সুন্দরী
যাবে তুমি কোথাকারে॥
এ রূপ যৌবন তেজিয়া ভুবন
দুর্লভ শরীর পায়্যা।
ঘোর জলে ভাস নাহি অবকাশ
কহগো কিসের লাগিয়া॥
বেহুলা শুনিয়া সকরুণ হৈয়া
বলে শুন নিবেদন।
কাল বিভারাতি হারায়্যা এ পতি[1]
জলে ভাসিতে কারণ॥
মোর পাপফলে নাগিনী দংশিলে
প্রভুর দক্ষিণ পায়।
পতি বিনে মোর সরিল সংসার
প্রাণ উছর্গিল তায়॥
কেবল মনসা করিয়া ভরসা
ছয় মাস জলে ভাসি।
যদি দেন পতি শুনগো যুবতী
তবে প্রাণে সুখ বাসি[2]॥
বলে বিষহরী শুনগো সুন্দরী
কহিলে অদ্ভুত বাণী।
মরে যেই জন না পায় জীবন
ত্রিভুবনে নাই শুনি॥

১ পাঠান্তর—বিভারাত্রে পতি হারায়া এ গতি। ২ পা—তবে প্রাণ অভিলাষী

না জানিয়া বামা একেশ্বরী রামা
তেজিলে আপনা পুরী।
বয়সে ছায়াল[1] নাই জ্ঞান ভাল
কোথা দেখ বিবহরী॥
কুম্ভীর মগর নানা জলচর
আহার বলিয়া খাবে।
দুই লোকে নারী হবে হত্যাকারী[2]
আত্মহত্যা ফলে পাবে॥
ধরগো বচন শুন নারীজন
আস্যগো আমার বাসে।
একান্ত ভুবনে যাব দুই জনে
নানা সুখ অভিলাষে॥
বলেন বেহুলা শুনগো অবলা
স্বামী কে তো নাই জান।
স্বভাবে নির্ধন অর্থে তোমা মন
সুখভোগ বড় মান॥
শ্বশুর পিতার ধনের ভাণ্ডার
যে দিগে চাহিবে যত।
সুখে সমাধান দিলেগো নিদান
হারাইয়া প্রাণনাথ॥
যাঅ নিজ ঘরে বিধাতা আমারে
ভাসাইল এই সুখে।
দিয়া সমাধান মান্দাস খিয়ান
বেহুলা দক্ষিণ মুখে॥
যায় কথোদূরে মনসা অন্তরে
জানিল পরম সতী।
ভাবিল হৃদয়ে জিয়াব নিশ্চয়ে
আপনার প্রাণপতি॥

১ শিশু ২ পাঠান্তর—পাপকারী

কি কহিব আর সপ্তগ্রাম পার
বেহুলা সুন্দরী ভাসে।
গঙ্গার সহিত মনসা ত্বরিত
উপনীত তার পাশে॥
অকস্মাতে জল হইল প্রবল
তরঙ্গে দুকূল ভাঙ্গে।
পর্বত প্রমাণ ঢেউর চাপান
অগ্নি উছলিল গাঙ্গে॥
উঠয় কুম্ভীর বড় ভয়ঙ্কর
শুশুক মগর আদি।
বড় বড় নাগে ধায় চারিদিগে
আচ্ছাদি সকল নদী॥
মনসার মায়া কে জানিবে তাহা
খসিল মান্দাস জলে।
বড় বড় মাছ পায়্যা কলাগাছ
আহার বলিয়া গিলে॥
এক কলাগাছে লক্ষ্মীন্দর আছে
বেহুলা তাহার পাশে।
করে টলমল চক্রাবর্তে জল
ফিরে ঘন ঘোর ত্রাসে॥
দূরে গেল ভেলা দেখিয়া বেহুলা
আকুল হইল প্রাণে।
করয়ে করুণা বলে কি যাতনা
বিধি বাম এইখানে॥
এতদিনে আশা হরিল মনসা
নিশ্চয় জানিল মনে।
কবিরাজে কয় চিন্তিয়া হৃদয়
মনসারে স্তুতি ভণে॥

একপদী

সায়ের নন্দিনী এ রূপ দেখি।
ভয়ে করে স্তুতি সজল আঁখি ॥
কোথা বিষহরী আছ গো তুমি [১]।
জনম দুখিনী ডাকি গো আমি [২]॥
কেবল ভরসা তুমি গো মোর।
কি দোষ করিলু চরণে তোর ॥
শিশুকাল হৈতে তোমার পায়।
ভাবি হেন গতি পাইলু মায় ॥
তেজি দুই কূল ভাসিলু জলে।
নিরাশ হৈলু কর্মের ফলে ॥
চন্দ্র সূর্য সাক্ষী থাকহ সবে [৩]।
দশদিগপাল যতেক দেবে [৪]॥
যদি সতী আমি মনসাদাসী।
যোড়া লাগু পুন মান্দাসি আসি ॥
সর্প জলচর কুম্ভীর আদি।
দূরে যাউ ভাটা গড়ুক নদী ॥
নহে মনসার চরণতলে।
হত্যা দেয় বেহুলা জানিছ ভলে[৫] ॥
করুণা করিল মনসা মাতা।
কাতর বেহুলা দেখিয়া তথা ॥
জলজন্তু সব ডুবিল জলে।
উঠিল তরঙ্গ নিমেষে ভালে ॥
কলাগাছ ভাসি উঠিল বেগে।
ভাসিল মান্দাস বেহুলা আগে ।।
হরষিত দেখি সায়ের বালা।
প্রণতি করিয়া খিয়াল ভেলা ॥

১ পাঠান্তর-মাতা ২ পা—জন্ম দুখিনীর করগো চিন্তা ৩ পা—থাকিয় ভলে ৪। পা—দেব সকলে ৫ পা—হত্যা দিব আজি জানহ ভলে

কনক অঞ্জলি মনসা পায়।
দিয়া হরষিতে মান্দাস বায় ॥
বোদাল্যার [1] দহে ভাসিল বালা।
রাঘবে দেখিতে পাইল ভেলা ॥
আমিষের ঘ্রাণ পাইল দেখি।
লখাইর খাল্য আঁঠুর চাকি ॥
মহাত্রাসে বেহুলা তাড়ন করে।
ত্রাসিতে রাঘব পড়িল নীরে ॥
হায় হায় করি কান্দই নারী।
নিষ্ঠুরে [2] শাঁপিল মৎস্যেরে হেরি ॥
শুনরে পাপিষ্ঠ থাকরে দহে।
অজীর্ণ ধরুক তোমায় দেহে ॥
অস্থি জীর্ণ যেন না হয় পেটে।
হানিল করাত কণ্ঠের তটে ॥
যতদিন প্রভু না পান প্রাণ।
ততদিন থাক হারায়্যা গ্যান ॥
সেহি দহ তেজি চলিল সতী।
তিনি ধার জল প্রবেশ শুথি ॥
মিঠা লুনা আর খারণ পানি।
দেখিয়া বেহুলা ভাবিল শুনি ॥
মিঠা লুনা দুই তেজিল বালা।
খারাণি পানিতে রাখিল ভেলা [3]॥
নেতু বস্ত্র কাচে স্বর্ণ পাটে।
দেবের দুর্লভ অপূর্ব ঘাটে ॥
সে ঘাটে বেহুলা প্রবেশে গিয়া।
রাখিল মান্দাস নেতুরে চায়্যা ॥
নাহি জানে নেতু পশ্চাতে ভেলা।
মান্দাস উপরে আছে বেহুলা ॥

১ পাঠান্তর—বোহালিয়া ২ পা—নির্ভরে ৩ পা—খারা পানি মুখে ভাসাল ভেলা

কাচে বস্ত্র ঘাটে নড়াই তুলি।
দুই পুত্র তার কর‍্যাছে অলি [১]॥
সহিতে না পারি নেতাই রাগে।
ডাকে ক্রোধে কোথা আছরে নাগে॥
ধনা মনা মোর এ দুই সুতে।
দংশন করহ আমার হিতে॥
নেতুর বচনে খরিশ নাগে।
আলস্য না করি দংশিল বেগে[২]॥
নিশ্চিন্তে নেতু [৩] কাচিল বাস।
শেষ হৈল দিন লাগিল ত্রাস॥
বসন যতনে বন্ধন করি।
পুত্রে ডাকে উঠ যাবরে পুরী॥
আরে বিষ ছাড় পুত্রের দেহি।
বিষ নাই অঙ্গে ডাকে নেতাই॥
আরে বিষ নীল মিলারে বেগে।
মারিল চাপড় দাঁড়াল আগে॥
তিনি জন বস্ত্র চলিল লয়্যা।
বেহুলা মান্দাসে দেখয়ে চায়্যা॥
অদ্ভুত দেখিয়া বেহুলা ভাবে।
বলে কোথা আর আছয়ে দেবে॥
দেখিলু সাক্ষাতে সর্পের ঘাতে।
মরা পুত্র জিয়াইয়া চলিল সাথে॥
পুরাবে বাসনা আমার এই।
ইহা বিনু গতি দোসর নাই॥
নিশ্চিন্ত হৃদয় চিন্তিল বালা।
ভাবি বিষহরী বান্ধিল ভেলা॥
তেজি কাল নিদ্রা বঞ্চিল নিশি।
সূর্য্যের কিরণ প্রকাশে আসি॥

১ অলি—বাহানা, ওজর ২ পা—দংশন করিতে চলিল বেগে ৩ পা—আনন্দে নেতাই

নিত্য কর্ম নেতু সারিল জলে।
দেবপুরে বস্ত্র লইআ [১] চলে॥
মনসা চরণ বন্দিয়া সাথে।
রচে কবিরাজ মধুর গীতে॥

নেতু আনন্দিত হয়্যা প্রভাতে বসন লয়্যা
প্রবেশিল দেবতা ভুবনে।
যার যার যেই বাস যোগায় তাহার পাশ
আনে পুন মলিন বসনে॥
যবে বেলা দণ্ড ছয় ভুটে [২] আসি নেতু হয়
বসন সিজায় [৩] খার জলে।
প্রবেশি নদীর তটে বস্ত্র কাচে শূণ্য পাটে
পুন পুন মলিন পাখালে [৪]॥
বেহুলা এমন কালে চন্দ্র স্ুর্য্য দিগপালে
সাক্ষী করি রাখিল মান্দাস।
বলে পতিব্রতা মুই মান্দাসি ছুঁইবে যেই
সবংশে হইবে প্রাণে নাশ॥
বোলে মোর সত্য কথা শুন আগো গঙ্গামাতা
মম প্রাণ সঁপিলু তোমারে।
যদিগো মান্দাসি টলে মম প্রাণ যাবে হেলে
হত্যা হব তোমার উপরে॥
গঙ্গারে কহিয়া কথা কূলে উঠে সাধু সুতা
উপনীত নেতু বরাবরে।
পড়িয়া চরণ তলে করজোড় কর্য়া বলে
শুন মাতা আমার উত্তর॥

১ পঠান্তর—আনিতে ২ ধোপাদের কাপড় কাচার জায়গা ৩ সেদ্ধ করে ৪ ধোয়

আমি অভাগিনী নারী তেয়াগিয়া নিজ পুরী
সমুদ্রে ভাসিলু ছয়মাস।
ভাগ্যে পালু তোমা দেখা কেহ নাই মোর সাথা[১]
কৃপা করি পুর মোর আশ॥
কামনা বহুত ধরি থাকিব তোমার পুরী
দিবে মোরে অন্ন আচ্ছাদন।
করিব তোমার সেবা প্রাণপণে পারি যেবা
দাসী রূপে আমি অভাজন॥
নিত্য নিত্য এই তুটে বসন কাচিব ঘাটে
বসিয়া থাকিবে ঠাকুরানী।
মনের বাসনা আছে কহিব তোমার কাছে
স্নেহবশে যদি রাখ জানি॥
দেখি বেহুলার দুখ অন্তরে বিদুরে বুক
নেতু বলে উঠগো সুন্দরী।
বসন ফেলিয়া তলে বেহুলারে কৈল কোলে
বলে তুমি কাহার কুমারী॥
নীচ জাতি ধোবা আমি চরণে ধরিলে তুমি
শিশুমতি ধর্মেতে প্রবিনী।
ইহকালে পরকালে স্বামীর সহিত ভালে
আনন্দিতে যাউ তব দিনি॥
কহগো কেমন কথা কার নারী কার সুতা
মাতাপিতা শ্বশুরের নাম।
কেনবা ভাসিলে জলে কি কার্য্য আমার স্থলে
নিবাস তোমার কোন গ্রাম॥
বেহুলা বলেন মায় কহিগো তোমার ঠায়[২]
সত্য যদি কর মোর সাথে।
তোমার কার্য্যের ফলে কার্য্য আমি পাব হেলে
নহে প্রাণ দিব যে সাক্ষাতে॥

১ বন্ধু, আত্মীয় ২ কাছে

নেতু বলে ওগো রামা কেমন কার্য্যের সীমা
যদি সিদ্ধ হয় আমা দিয়া।
সত্য সত্য এই[১] কথা না হইবে অন্যথা
হেলা না করিব তোমা দিয়া॥
নেতুর সদয় বাণী বেহুলা সদয় শুনি
কহে যত নিজ নিবেদন।
বলে শুন ওগো মাতা কপালে আমার ধাতা
রাখ্যা ছিল এতেক কষণ[২]॥
চম্পা নগ্র বলি গ্রাম চান্দ সদাকর নাম
আমার শ্বশুর সেই হন।
নাগমাতা বিষহরী তার সঙ্গে বাদ করি
ছয় পুত্র মরিল দংশন॥
সর্বশেষে লক্ষীন্দর রূপ জিনি পঞ্চশর
জন্ম হৈল সনকা জঠরে।
সায় সদাকর পিতা অমলা আমার মাতা
সম্বন্ধ করিল মোর তরে॥
বেহুলা আমার নাম নিছানি আমার গ্রাম[৩]
বিধির সংযোগে বিঘটন[৪]।
পঞ্চ শব্দ বাদ্য লৈয়া পরম আনন্দ হৈয়া
বিভা করি নিল নিকেতন॥
সাতালি পর্বত পরে সাজাইল লোহা ঘরে
স্বামী সনে আমারে রাখিল।
মনসা দেবীর হটে এতে পরমাদ ঘটে
শেষ রাত্রে নাগিনী দংশিল॥
দেখিয়া প্রভুর গতি্ মান্দাস বানায়্যা[৫] তথি
ভাসিলু তেজিয়া পুরী জন।
মনসা চরণ পূজি অশেষ দুর্গম তেজি
ছয় মাস জলে অনুক্ষণ॥

১ পাঠান্তর—মোর ২ দুঃখ ৩ পা—নিবাস নিছানি গ্রাম ৪ পা—দুর্ঘটন
৫ পা—সাজায়্যা

আছিল কি পুণ্য ভালে প্রবেশিলু এই স্থলে
দেখিলু চরণ আসি তোর।
জিয়াইয়া প্রাণনাথে দাসি দাসী করি সাথে
রাথ নিবেদন লেহ মোর॥
জানিয়া পূর্ব্বের হেতু বুঝিয়া কহেন নেতু
শুন মাতা[১] আমার বচন।
মনসা সহিত বাদ কথা বড় পরমাদ
সত্য কৈলু না জানি কারণ॥
প্রত্যহ চান্দের কথা শুনি মনসার তথা[২]
প্রসঙ্গে ক্রোধিত হন অতি।
দেখিয়া করুণা তোর হৃদয় দহিছে মোর[৩]
থাক রামা আমার বসতি॥
আমি তার সহচরী নিরন্তরে সেবা করি
কার্য্য তোর করিব[৪] সাধন।
সাধিতে তোমার কাজ মনসা চরণ মাঝ
উছর্গিব আমার জীবন॥
শুনিয়া নেতুর কথা আনন্দ সায়ের সুতা
নেতুর সেবায় অবধান।
দ্বারিকা দাসেতে রচে বেহুলা কাপড় কাচে
চিতে করি বিষহরী[৫] ধ্যান॥

পয়ার

বেহুলা বলেন তবে নেতুর চরণে।
বসন কাচিব মাগো দেহ মোর স্থানে॥
নেতু বলে ওরে বাছা শুন মোর বাণী।
সাধুর নন্দিনী তুমি সাধুর গৃহিণী॥

১ পাঠান্তর—তুমি ২ পা—শুনিয়া মনসা মাতা। ৩ পা—দয়া উপজিল মোর
৪ পা—করাব ৫ পা—মনসারে

অন্য জাতি বসন কাচিতে নাহি পারে।
জাতি সনে বৃত্তি বিধি দিয়াছেন মোরে॥
বিশেষে সঙ্কট এই দেবতার বাস।
তিলে মাত্র দেঢ়ি[1] হৈলে হবে সর্বনাশ॥
বেহুলা বলেন শুন কহিগো তোমারে।
একখানি বস্ত্র দেহ প্রথমে আমারে॥
যদিগো স্বরঙ্গ ধরে না থাকে মলিন।
তবে বস্ত্র দিবে মোরে করিয়া প্রবীণ॥
প্রতয়[2] জন্মিয়া রামা নেতুর গোচরে।
এক বস্ত্র হাতে ধরি তোলে জল ধারে॥
চিনিয়া মনসা বস্ত্র ধরি করপুটে।
মলিন পাথালে[3] জলে কাচে স্বর্ণপাটে॥
গুণের সাগরী বেহুলা মনসার দাস।
রবির কিরণে দেয় শুখাইতে বাস॥
ধরিল বসন শোভা চন্দ্রের সমান।
নেতু বলে প্রাণনাথে বাঁচাবে নিদান॥
তিনি যুগ বস্ত্র আমি কাচি এই ঘাটে।
এমনি স্বরঙ্গ বস্ত্র কভু নাহি ফুটে॥
আনন্দে দিলেন নেতু সকল বসন।
বেহুলা কাচিয়া দেয় নেতু তুষ্ট মন॥
দশদিগ আলো হৈল বসন নির্মলে।
ঘরে চলে তুইজন রবি অস্তকালে॥
বহুত আশ্বাস নেতু কৈল বেহুলায়।
নানা সুখে হেন কালে রজনী পুহায়।
প্রভাতে করিয়া স্নান নেতাই ধোবনী।
দেবপুরে বস্ত্র লয়্যা চলিল আপনি॥
প্রথমে প্রবেশ হৈল শিবের গোচরে।
প্রণাম করিয়া নেতু রাখিল অমরে॥

১ ভিন্ন অবস্থা ২ বিশ্বাস ৩ ধোয়

হরগৌরী দুইজনে দেখিয়া বসন।
নেতুরে জিগ্যাসা করে কহ বিবরণ॥
সর্বকাল কাচ তুমি দেবের বসন।
অপূর্ব সুরঙ্গ বস্ত্র আজি কি কারণ॥
নেতু বলে অবধান কর শূলপাণি।
কালি মোর ঘরে আইল সাধের নন্দিনী॥
অপূর্ব নাচনী সেই নানা গুন ধরে।
কাচিল বসন সেই তারে রাখি ঘরে॥
শুনিয়া নেতুর কথা বলে শূলপাণি।
তোমার নাতিনী হৈলে আমার নাতিনী॥
অবশ্য আনিবে তারে করিয়া সাজন।
দেখিবে কেমন নাচে যত দেবগণ॥
অঙ্গীকার কৈল নেতু আনিব প্রভাতে।
ব্রহ্মার ভুবনে গেল বসন যোগাতে॥
ইন্দ্র চন্দ্র ভূপালক[১] কুবের বরুণ।
বস্ত্র দেখি জিগ্যাসা করেন জনে জন॥
না ভাঙ্গিয়া ভেদ নেতু আইল নিজ বাস।
বেহুলারে জানাইল হৃদের উল্লাস॥
দেখিবেন তোর নৃত্য দেব শূলপাণি।
কহিনু সভারে ঘরে আস্যাছে নাতিনী॥
মোর সঙ্গে যাবে কালি শুনগো বেহুলা।
জানিয়া করিবে নৃত্য শিব বড় ভোলা॥
লঙ্ঘিতে শিবের বাক্য পারে কার প্রাণে।
জিয়াইবে তোর পতি সভা বিদ্যমানে॥
বেহুলা বলেন তোমা হেন কার্য্য ঘটে।
সোনা হেন দ্রব্য বিনা লক্ষ্য নাহি উঠে॥
দুঃখের সমুদ্রে মোর তুমি কর্ণধার।
না পাইলে কূল আর নাহি প্রতিকার॥

১ পাঠান্তর—বিষ্ণু আদি

বঞ্চিল রজনী রামা ভাবি বিষহরী।
উঠিয়া নেতুর সঙ্গে প্রাতঃস্নান করি ॥
নৃত্য সাজ অঙ্গে পরে বেহুলা সুন্দরী।
রচিল দ্বারিকা দাস ভাবি বিষহরী ॥

একপদী

ভুবন মোহিনী বেহুলা নারী।
করে নৃত্য সাজ ভূষণ পরি ॥
অঙ্গুলে পাসুলি রসনা[১] সাজে।
মৃগেন্দ্র মাঝারে[২] রসনা বাজে ॥
পরিধান অঙ্গে নেতের শাড়ি।
দুকরে কঙ্কণ সুবর্ণ চুড়ি ॥
মৃণাল সমান ভুজের মাঝে।
তাড়[৩] অপরূপ বলয়া সাজে ॥
গজেন্দ্র গামিনী সায়ের বালা।
গলে সাতনরী পরিল মালা ॥
খঞ্জন গঞ্জন লোচন মাঝে।
কজ্জল উজ্জল অধিকে সাজে ॥
বেশর সুন্দর নাসায় দুলে।
সুরঙ্গ সিন্দুর শোভিত ভালে ॥
বিচিত্র কুণ্ডল শ্রবণযুগে।
ফণি জিনি মণি মস্তক ভাগে ॥
সঙ্গে করতাল লইল খোল।
বীণা স্বরে[৪] ডাকে মধুর বোল ॥
কি রূপে বিধাতা নির্মাল তারে।
কটাক্ষে ভুবন মোহিতে আরে ॥

১ নূপুর ২ মধ্যে কটিতে ৩ বাজুবন্ধ ৪ পাঠান্তর—বিনা স্বরে

স্বর্গ বিদ্যাধরী জিনিয়া বালা।
নেতুর পশ্চাতে চলে বেহুলা ॥
নেতু বলে বাক্য শুনগো রামা।
বসন ধরিয়া থাকিবে আমা ॥
ভুবনে মনুষ্য শরীর ধরি।
স্বর্গপথে কিবা গমিতে পারি ॥
বসন তেজিলে পড়িবে তলে।
আত্মহত্যা হবে কহিলু ভলে ॥
ত্রাসিত বেহুলা এসব শুনি।
ধরিল বসন সুদৃঢ় জানি ॥
বেহুলা নেতাই একই সাথে।
চলে দুহে বেগে একই পথে ॥
সুমেরু উপরে দেবের পুরী।
ধর্মদ্বারে দু'হে প্রবেশ করি ॥
অধর্ম বেহুলা নাহিক জানে।
পার হৈয়া গেল নেতুর সনে ॥
মায়া[1] অগ্নি জলে দ্বিতীয় দ্বারে।
ভয় কৈল অগ্নি সতীর ডরে ॥
চন্দন সমান লাগিল গায়।
সেই দ্বার রামা তেজিয়া যায় ॥
দেখে অন্ধকার তৃতীয় পথে।
সে দ্বার এড়াল নেতুর সাথে ॥
চতুর্থে দেখিল অপূর্ব[2] নদী।
নেতু পার হৈল সমস্ত ভেদি ॥
পঞ্চমে দেখিল পাতিছে ক্ষুর।
মনসা ভাবিতে সে গেল দূর ॥
ষষ্ঠে খরসান পাতিছে শাল।
কিরণে অগ্নি[3] উঠয়ে ভাল ॥

১ পাঠান্তর—মহা ২ পা—সম্পূর্ণ ৩ পা—অরুণ

বেহুলা ধর্ম্মেরে করিল তুস্তি।
দোষে শাস্তি দেহ যুগের পতি ॥
শঙ্কা না করিল বেহুলা তারে।
ধর্ম্ম স্মরিয়া তরিল দ্বারে ॥
ধর্ম্মের বিষয় সপ্তম দ্বার।
দেবাসুর যাতে না পারে আর ॥
তাল বেতালের সেখানে থানা।
ভিতরে যাইতে সভারে মানা ॥
বসন রাখিয়া নেতাই তথা।
চলে সঙ্গে করি সায়ের সুতা ॥
ইন্দ্র চন্দ্র আদি কুবের পুরী।
দশদিগপাল অন্ত না করি[১] ॥
বস্ত্র দিয়া নেতু চলিল বেগে।
উপনীত হৈল শিবের আগে ॥
প্রণতি করিল বেহুলা তথা।
দেখিয়া ডাকেন জগতমাতা ॥
আসগো নাচনী বৈসগো পাশে।
কত নৃত্য জান যুবা বয়সে ॥
তেজিয়া স্বামীরে এসেছ এথা।
ছাড়িয়া না দিব যাবেগো কোথা ॥
লাবণ্য[২] মুরতি দেখিয়া তার।
শিব দিল এক[৩] কুসুম হার ॥
বলিল নাচনী নাচগো তুমি।
সম্বন্ধে নাতিনী তোমারে গনি ॥
প্রণতি করিয়া বেহুলা বলে।
কৃপার সাগর শুনহ ভলে ॥

১ পাঠান্তর—অন্তর করি ২ পা—নবীন ৩ পা—গলে

সর্ব দেবগণে আনাহ তুমি।
সভামাঝে নৃত্য করিব আমি॥
আগ্যা কে লঙ্ঘিতে পারিবে তোমা।
উৎপত্তি নাশনে তুমি যে সীমা॥
বাসনা আমার আছয়ে মনে।
দেখিব সকল দেবতা গণে॥
সার্থক জীবন করাঅ আমা।
অপরাধ মোর করিঅ ক্ষমা॥
বেহুলার কথা শুনিয়া শিবে।
হাসি আগ্যা কৈল নেতুরে তবে॥
যাঅ যাঅ নেতু আমার বোলে।
আন গিয়া যত দেবতা কুলে॥
কহিয়া সকল কার্য্যের ভাবে।
সভাকারে নৈতে পাঠাল শিবে॥
যাঅ শীঘ্র কার্য্য করহ কিবা।
আন গিয়া যত দেবতা সভা[১]॥
বেহুলা রাখিয়া[২] চলিল নেতু।
বুঝি আপনার কার্য্যের হেতু॥
বৈদ্য[৩] দ্বারিকা দাসেতে বলে॥
আইসে দেবগণ শিবের স্থলে॥

ত্রিপদী

মনসা মঙ্গল শ্রবণে কুশল
একান্তে ভাবিলে পাপ দহয়ে সকল॥
নেতু তুষ্ট হয়্যা শিব আগ্যা পায়্যা
সর্ব দেবগণে ডাকে প্রণতি করিয়া॥

১ পাঠান্তর—আন গিয়া দেবী যতেক দেবা ২ পা— বেহুলারে রাখি ৩ পা—শ্রীযুত

শুন দেবগণ শিবের বচন
দেখিতে তাণ্ডব তথা চল সর্বজন ॥
শুনি এত কথা যতেক দেবতা
অবিলম্বে আসে সর্বে শুলপাণি যথা ॥
বাহন হরিণে চলিল পবনে
হংসে যান ব্রহ্মা বিষ্ণু গরুড় বাহনে ॥
গণেশ মূষিকে ময়ূরে কার্তিকে
দেখিবারে নৃত্য দুঁহে চলিল কৌতুকে ॥
বাহন মনুষ্যে যক্ষরাজ আইসে
দণ্ড হাতে লয়্যা যম চড়িয়া মহিষে ॥
আল্য জলধর শিবের গোচর
ঐরাবতে বজ্র হস্তে আইল পুরন্দর ।
আসিছে নাচনী নেতু মুখে শুনি
ভৈরবের সঙ্গে আইল চউবটি যোগিনী ॥
জল অধিপতি বরুণের গতি
যক্ষ বেতালের সঙ্গে প্রবেশিল তথি[১] ॥
গন্ধর্ব কিন্নরী স্বর্গ অপস্করী[২]
ছত্রিশ রাগিনী সঙ্গে আল্য বিদ্যাধরী ॥
দেব ঋষিগণ নারদ আপন
ভৃগু আদি আল্য যত সিদ্ধ তপোধন ॥
দশ দিগপাল আইল ততকাল
নবগ্রহ অষ্টবসু রুদ্রের মিশাল ॥
শিবের আদেশে সর্বদেব আইসে
ধ্যানে জানি বিষহরী রহিলেন বাসে ॥
নেতু যোড় করে নিবেদিল হরে
নাই আইল বিষহরী সভার ভিতরে ।
ক্রোধিত অন্তরে বলিছেন শঙ্করে
পিতা আগ্যা লঙ্ঘে কন্যা কোন অহঙ্কারে ॥

১ পাঠান্তর—আইল শীঘ্রগতি ২ অপ্সরা

যাওগো নেতাই আন তরা এথাই
মোর ক্রোধে পড়িলে এড়ান কার নাই ॥
বচন নিষ্ঠুর বলিল প্রচুর
ত্রাসে নেতু প্রবেশিল মনসার পুর ॥
নেতু যোড় করে বলে মনসারে
সর্বদেব উপনীত কোপিল শঙ্করে ॥
বলে বিষহরী মহা ক্রোধ করি
অবে[১] নেতু কথা বড় কহনা চাতুরী ॥
কোথার নাচনী আমি কি না জানি
দেখ্যাছি অনেক নৃত্য যাঅগো আপনি ॥
পূর্ব বিবরণ করিলে স্মরণ
ভাবিলে চান্দের কথা শরীর দহন ॥
ভাসাইয়া ভেলা আসিছে বেহলা
নৃত্য দেখিবারে হৈল দেবতার মেলা ॥
পূর্ব বিবরণ কহিবে যখন
সহিতে নারিব ক্রোধ বল অকারণ ॥
চান্দের গুমান[২] সহে কার প্রাণ
পৃথিবীতে মোর পূজা ভাঙ্গিল নিদান ॥
নেতু বলে মাতা শুন মোর কথা
পাইবে আপনি পূজা এ বোল সর্বথা ।
বেহলা নাচনী ধন্য তারে গনি
ছ মাস ভাসিল জলে দুঃখ নাই মানি[৩] ॥
কেবল তোমার পদ্ম কৈল সার
জিয়ায়্যা তাহার পতি পূজিবে সংসার ॥
সেবকের মান রাখিবে নিদান
জগতে পাইবে পূজা বাড়িবে সম্মান ॥
শুন ঠাকুরানী মোর হিতবাণী
পরিণামে পাবে কার্য্য চলগো আপনি ॥

১ 'ওরে' অর্থে ২ অহঙ্কার ৩ পাঠান্তর—দিবস রজনী

নেতুর বচন করিয়া ভাবন
 অভিমানে ক্রোধভরে দেবীর গমন ॥
নেতুর সহিত প্রবেশি ত্বরিত
 সমাপিল দেবগণ যেবা যথোচিত ॥
শিবের গোচর দেবের চাতর[1]
 বসিলেন স্থল জানি যতেক অমর[2] ॥
বেহুলা সুন্দরী গলে বস্ত্র করি
 প্রথমে প্রণাম কৈল যথা বিষহরী ॥
তবে দেবগণে মধুর বচনে
 বিনয়ে প্রণতি রামা করে[3] জনে জনে ॥
বলে শূলপাণি শুনগো নাচনী
 মনসারে এত ভক্তি কি ভাবে না জানি ॥
বলেন সুন্দরী করজোড় করি
 জন্ম হৈতে ইষ্ট মোর মনসা সুন্দরী[4] ॥
শিশুকালে হৈতে ভাবি এক চিতে
 দোসর আমার গতি নাই পৃথিবীতে ॥
তবে দেবতায় বলে বেহুলায়
 আরম্ভ করহ নৃত্য দেখিব সভায় ॥
বেহুলা নাচনী ভুবন মোহিনী
 ভাবিল গুরুর পদ শুভক্ষণ জানি ॥
কবিরাজে গায় মনসার পায়
 কৃপা করি বিষহরী রাখিবে সভায় ॥

১ পাঠান্তর—যতেক অমর ২ পা—যথা দেববর ৩ পা—কৈল ৪ পা—ঈশাণ কুমারী

একপদী

বন্দিয়া মনসা চরণ রঙ্গে।
নৃত্য কৈল রামা দেবের মাঝে ॥
ঝুন ঝুন ঝুন নূপুর বলে।
বামাস্বরে গায় পঞ্চম তালে ॥
ত্রিমিকি ত্রিমিকি মৃদঙ্গ ধ্বনি।
তাথই তাথই নাচয়ে ধনী[1] ॥
শূণ্যে পাক ধরে চরণ রাখে।
মনসা মনসা রাখগো ডাকে ॥
ইয়া তাইয়া তাইয়া তাতা থিনা তা।
নেতা তাল রাখে না টলে পা ॥
চক্র সম রামা ফিরয়ে দৃঢ়ে।
নৃত্য ভরে তনু ভাঙ্গিয়া পড়ে ॥
কংসাল রসাল[2] লইয়া হাতে।
বাজায়্যা ঝাঁঝর অশেষ মতে ॥
বাহুর বল্যানি হেলনি অঙ্গে।
রাখে তাল তার না হয় ভঙ্গে ॥
লোটন কপোত যেমন লোটে।
শূণ্যে পাক ধরি গগনে উঠে ॥
অঙ্গে আভরণ সে সব তালে।
এক স্বরে মিশি মধুর বলে ॥
চরণে নূপুর মৃদঙ্গ ভুজে।
কেশরী মাঝারে[3] রসনা বাজে ॥
করে করতাল মুখেতে বেণু।
সুমধুর ডাকে ঝটকে তনু ॥
শেষে সারদার ধরিল বীণা।
সারি সারি গম বাজে বাজনা ॥

১ পাঠান্তর—আলাপ করিল সংগীত জানি ২ পা—কর্তাল কংসাল ৩ সিংহ সদৃশ ক্ষীণ কটিতে

তাতা থিয়া তাতা তাথেই থিনা।
ইয়া ইয়া থিড়ি থিড়ি দেখেনা॥
গজেন্দ্র গামিনী বেহুলা নারী।
মোহিত করিল অমর পুরী॥
স্বর্গ বিদ্যাধরী লজ্জিত হৈল।
ভোলে ভোলানাথ বিভোল ভেল॥
ইন্দ্র দিল পারিজাতের মালা।
ধন্য গো নাচনী জন্মেছ[১] বালা॥
নারদ সারদ, দুজনে মিলি।
বেহুলাকে কোলে ধরিল তুলি॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু আদি কুবের দেবে।
নানা দ্রব্য দান দিলেক সভে॥
শিব দিল এক অপূর্ব মণি।
বলেন বাসনা কি তোর শুনি।
মোহ কৈলে যত দেবের পুরী।
মনোহর বর মাগগো নারী॥
বেহুলা শুনিয়া শিবের কথা।
লক্ষেক প্রণাম করিল তথা॥
বলে কৃপানিধি মাগিব কিবা।
কৃপা কর মোরে এ দেবসভা॥
লোহার বাসরে বিভার রাতি।
অনাথিনী হৈল হারায়্যা পতি॥
স্বামী দান দেহ সভাই মিলি।
দুখের সাগরে[৩] উদ্ধর তুলি॥
শুনিয়া জিগ্যাসে দেবতা সভা।
বলে অপরূপ কহিলে কিবা॥
কিভাবে মর্যাছে তোমার পতি।
কহগো নাচনী[৪] পূর্বের গতি॥

২ পাঠান্তর—জন্মিলে ২ সারঙ্গ (?) অনঙ্গদেব অর্থে ৩ পাঠান্তর—দুঃখ নদী হৈতে
৪ পা—কহ শুনি যত

নেতু বলে কহ পূর্বের কথা।
বিষহরী লাজে পুতিল মাথা॥
বেহুলা বলেন শুনহ দেবে।
পূর্ব পরিচয় কথার ভাবে॥
বেহুলা মোর নাম অমলা মাতা।
নিছানীতে ঘর সায়ের সুতা॥
চঁপা নগ্রে ঘর বণিক কুলে।
চান্দ সদাকর আছয় ভলে॥
বাদ কৈল সেই মনসা সাথে।
ছ পুত্র হারাল সর্পের হাতে॥
শেষে লক্ষীন্দর জন্মিল ঘরে।
ঘট স্বত্রে বিধি ঘটাল মোরে।
বিভাদিনে কন্যা বরের পাশে।
ভয়েতে থুইল লোহার বাসে॥
মনসা ক্রোধিত পাঠাল নাগে।
দংশন করিল প্রভুরে বেগে॥
বিভারাত্রে মোর এতেক দশা।
তেজিলু সংসার সভার আশা॥
কলার মান্দাসে স্বামীর সাথে।
মনসা ভাবিয়া ভাসিলু স্রোতে॥
পূর্বের বাসনা কর্মের ফলে।
ভেটিলু সভার চরণতলে॥
পতি দিয়া দান রাখহ প্রাণ।
নিবেদিলু দুঃখ সভার স্থান॥
শুনি তার বাণী যতেক দেবে।
অনেক প্রশংসা করিল তবে॥
বলে ধন্য ধন্য তুমি গো নারী।
দুর্গম সমোদ্রে এসেছ তরি॥

পাঠান্তর—দংশিল প্রভুরে চলিল বেগে

মানব শরীর ধরিয়া ভলে।
হেন কর্ম্ম করে কে ক্ষিতি তলে॥
যুগে যুগে যশ ধরণী তলে।
রাখিলে নির্মল করিয়া কুলে॥
ধন্য নারী তোমা যে ধরিল গর্ভে।
না জানি কি তপ করিল পূর্বে॥
ধন্য পতিব্রতা তুমি গো নারী।
না হলে কি স্বর্গে গমিতে পারি॥
পতিব্রতা পুণ্য আছয় ক্ষিতি।
উদ্ধারিবে বংশ তুমি গো সতী॥
অনেক প্রশংসা করিল সভে।
মনসায় কিছু গঞ্জিল এবে॥
শুন বিষহরী হরের সুতা।
দয়াশীল তুমি নাগের মাতা॥
অপরূপ কথা এসব শুনি।
কি দোষ করিল বেহুলা জানি॥
এ রূপ যৌবনে ইহার গতি।
দংশিয়া ভুবনে রাখিলে খ্যাতি॥
বেহুলা তোমার বটে এ দাসী।
খ্যাই তোমা জলে আইল ভাসি॥
ক্রোধে মনসারে বলেন শিবে।
হেন বুদ্ধি মাগো শিখিলে কবে॥
পর পুত্রে খাতে[১] না হৈল দয়া।
রাখিলে কলঙ্ক নিষ্ঠুর হৈয়া॥
দেখিতে শুনিতে বহুত লাজ।
কি কৈলে মনসা[২] অযোগ্য কাজ॥
সাত পুত্রে তার খায়্যাছ তুমি।
এ সকল কথা শুনিলু আমি॥

১ পাঠান্তর—খাইতে ২ পা -মাগো

শুনি বিষহরী পিতার কথা।
ক্রোধে দুই চক্ষু করিল রতা ॥
রোষে থরহর করিল দেহি।
অন্যকে কহিলে নারিত সহি ॥
অরুণ নয়নে মনসা বলে।
শুন আরে দাণ্টা বেহুলা ভলে ॥
মিথ্যা কথা কহ মরণ কালে।
এ কথা শুনিলে সর্বাঙ্গ জলে ॥
কবে কোথা বস্তা দেখ্যাছ তুমি।
কোথা চাঁপা নগ্র আমি না জানি ॥
দেবমুখে থুইলে অযশ বাণী।

*　　*　　*

গঞ্জনা বাপার সহিলু যত।
আর হৈলে পাইত জন্মের মত।।
কহিতে কহিতে অরুণ অক্ষি।
হৃদে মহাক্রোধ প্রবেশ দেখি ॥
ডাকে বিষহরী আস্তরে নাগে।
দুই সর্প আসি দাঁড়াল আগে ॥
বলে মিথ্যা বাদ দিলেক মোরে।
দংশ তোরা বেগে এ বেহুলারে ॥
মনসার আগে থরিস নাগে।
চক্র ধরি ধাইল দংশিতে বেগে ।।
ঢাক দিল বেহুলা আপন পেড়ি।
যদি নাগ ইথে আসিবে ছড়ি[১] ॥
শতেক দুহাই মনসার লাগে।
পরশে মরিবে শুনরে নাগে ॥
মহা সর্প[২] হৈয়া দু সর্প ধায়।
পরিশিতে গারে[৩] পড়িল ঠায় ॥

১ বিচার না করে চলে আসা ২ পাঠান্তর—ক্রোধ ভর ৩ চিহ্নে

মরে ছুই সর্প লঙ্ঘিয়া বাণী ।
ধন্য ধন্য সতী দেবতা ভনি ॥
বৈদ্য শ্রী দ্বারিকা দাসেতে বলে ।
সর্বদা মনসা রাখিঅ ভলে ॥

পয়ার

সতীর বচন লঙ্ঘি মরে ছুই ফণী ।
দেখি ক্রোধ ভরে বলে বিষ বিনোদিনী ॥
আলো বেউলা কুমন্ত্রে[১] মারিলি মোর সাপ ।
চান্দ বাণ্যা জিনি তোর দেখিতে প্রতাপ ॥
বেহুলা বলেন মাতা আমি তোমার দাস ।
আগ্যা লঙ্ঘি তব সাপ প্রাণে গেল নাশ ॥
সেবক বিষয়ে মাগো ধরহ করুণা ।
সহিলু দারুণ প্রাণে বিশেষ যন্ত্রনা ॥
না ধরে শিশুর দোষ জননী কখন ।
কৃপা করি মোর দুঃখ কর নিবারণ ॥
আতঙ্ক ভঞ্জনী তুমি শিবের নন্দিনী ।
নাগ রূপে শিরে করি ধরিলে ধরণী ॥
জল স্থল ব্যাপিত হয়্যাছ ভুবন ।
মোর মনে কেহ নাই কেবল আপন ॥
স্বামী দান দেহ মোরে দুঃখ কর দূর ।
পূজিবে চরণ তুমার আমার শ্বশুর ॥
মনসা তুমার নাম মনোবাঞ্ছাপুরী ।
দাসী প্রতি এত দুঃখ কেন বিষহরী ॥
সগোষ্ঠী সহিত পূজা করিব তুমার ।
স্বামীদান দেহ মোরে ঘোষুক সংসার ॥

১ পাঠান্তর—কি মন্ত্রে

বেহুলারে কাতর দেখিয়া দেবগণ।
আশ্বাসিয়া মনসারে বলেন বচন।।
লেহ দুঃখ বিষহরী সেবকেরে চায়্যা।
পূজিবে তোমার পদ নিজপুরে গিয়া॥
তব পদ বিনা বেউলা অন্য নাহি জানে।
স্বামী দান দেহ বেউলা যাউ নিজ গ্রামে॥
বেহুলার স্তুতি শুনি দেবের আশ্বাস।
ক্রোধ দূরে ছাড়ি হৈল মনসার হাস।।
মনসা বলেন রামা শুনগো বচন।
কোন নাগে তোর পতি কর‍্যাছে দংশন॥
শুনিয়া বেহুলা তবে দেবতা সভায়।
সর্পের ফাকুড়া[১] আনি ঢাকুনি মুকায়[২]॥
বঙ্করাজ কালদন্ত সর্প উদেনাগে।
লজ্জা পায়্যা তিনি সর্প পালাইল বেগে॥
কালিনীর কাটা লাঞ্জ আড়াই আঙ্গুলি।
মনসার আগে দিয়া হইল ব্যাকুলি॥
নারিল এড়াতে মাতা দেখিল সাক্ষাত।
নেতু বলে অপরাধ ক্ষমা কর যত॥
চান্দ সদাকর যদি না পূজে চরণ।
পুনর্বার দংশিবারে লাগে কতক্ষণ॥
আগ্যা কৈল ভোলানাথ মনসা গোচরে[৩]।
লক্ষীন্দরে দেঅ প্রাণ যাউ নিজ ঘরে॥
বেহুলার পক্ষে বলে সকল দেবতা।
জিয়াইব বলি আগ্যা[৪] দিল নাগমাতা॥
মনসা বলেন শুন বেহুলা নাচনী।
ছ মাসের মড়া কোথা রাখ্যাছ আপনি॥
বেহুলা বলেন শুন করুণাবৎসল।
আছয় প্রভুর মোর অস্থি যে সকল॥

১ পেড়ি ২ খোলে ৩ পা—বেহুলার তরে ৪ পা—বাক্য।

মনসার আগ্যা পায়্যা নেতুর সহিত।
আনিতে লখাইর অস্থি চলিল তুরিত ॥
চক্ষুর নিমিষে ছুহে গেল নিজ পুরী।
প্রবেশে বেহুলা ঘাটে নেতু সঙ্গে করি ॥
মনসা করিল মায়া থাকি দেবপুরে।
মান্দাস ডুবায়্যা থুইল জলের ভিতরে ॥
না দেখি মান্দাস বেহুলা পরাণ বিকলে।
দশদিগ সাক্ষী করি গঙ্গা প্রতি বলে ॥
লঙ্ঘিয়া তুমার জল আইলু এখানে।
সমর্পি মান্দাস গেলু তুমার চরণে ॥
ছুর্গমে তরিলু মাগো তুমার কৃপায়।
হৈলা কার্য্য নষ্ট যায় হত্যা নেহ মায় ॥
দশদিগ সাক্ষী করি ভাবি বিষহরী।
হত্যা নেহ গঙ্গা বলি ঝাঁপিল সুন্দরী ॥
সতী ঝাঁপ দিল দেখি গঙ্গা কৈল ডর।
শুখাইয়া যায় জল ত্রাসে থরতর ॥
ভাসাইয়া দিল মাতা কলার মান্দাস।
দেখি কূলে উঠে রামা দূরে তেজি ত্রাস ॥
বান্ধিয়া স্বামীর অস্থি নেতের আঁচলে।
নেতু সঙ্গে পুনর্বার দেবপুরে চলে ॥
মনসার পাদপদ্ম নিকটে বেহুলা।
রাখিয়া স্বামীর অস্থি দাঁড়াল অবলা ॥
মনসা বলেন নেতু বুদ্ধি বল এবে।
পুনর্বার শরীর জুড়িবে কোনভাবে ॥
চর্ম রক্ত মাংস মেদ অস্থি পঞ্চ আদি।
সপ্তধাতু সনে দেহ নির্মাইল বিধি ॥
পুনর্বার অস্থিমধ্যে এ সব ঘটন।
বড়ই কঠিন কর্ম অসাধ্য সাধন ॥

দেবগণ সভে গিয়া দেখে চতুর্ভিতে।
বস্ত্রের কাঁড়ার[1] মাতা দিল মধ্য গতে॥
কেবল লখাইর অস্থি মনসা লইয়া।
বস্ত্রের কাঁড়ারে মাতা প্রবেশিল গিয়া॥
পড়িয়া অপূর্ব মন্ত্র রাখিলেন হাড়ে।
যোগমার্গে মন্ত্র পড়ি ক্রমে হাড়[2] জুড়ে॥
মন্ত্রজল দিল মাতা তন্ত্রের বিধানে।
চর্ম রক্ত মাংস পুন লাগিল সন্ধানে॥
মহাস্বত্রে সপ্তধাতু হইল নির্মাণ।
মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রে দিল জীব দান॥
দূরে ফেলাইল মাতা বস্ত্রের কাঁড়ার।
ভাসিছে গরল মুখে সাধুর কুমার॥
সুবর্ণ জিনিয়া তনু অতি সুকুমার।
ভাসিল নয়ানে নীর দেখি বেহুলার॥
ছ মাস ভাসিল কালী বিষদন্ত দিয়া।
ভেদিল কঠিন হাড়ে বিষ গেল রয়্যা॥
নেতুরে লইয়া সঙ্গে বিষ বিনোদিনী।
ডাকিতে লাগিল মন্ত্র ঝঙ্কারি আপনি॥
জগবল্লভের মন্ত্র দুইজনা পড়ে।
ভাটা দেয় আদ্যের বিষ কালা ঘর ছাড়ে[3]॥
পদ্মে উপজিল বিষ করে টলমল।
মনসা ডাকেন বিষ ক্রমে হয় জল॥
ডম্ব চিয়ানেতে নেতু শিরে জল ঢালে।
আরে আরে উগরিয়া[4] বিষ আইস চলে॥
থড় থড় ডম্বরু ত্রিসঙ্গের ভারে।
ডাকে ভস্ম হয়[5] বিষ নেতুর হুঙ্কারে॥
রক্তে ফির রক্তে চর রক্তে কর বাস।
ছাড়রে কপালের বিষ রক্তে যারে নাশ॥

১ তাঁবু ২ পাঠান্তর—অস্থি ৩ পা—ভাটা দিয়া বিষ আসে কালি ঘর ছাড়ে
৪ পা—উপচিয়া ৫ পা—হরে।

পানিকর্ণ পানিকর্ণ জগতের সার।
ভক চিয়ানের বিষ জলে নাই আর ॥
সহস্র হাজার বিষ পড়ি গেল টানা।
মায়ের স্মরণে বিষ ফুঁকে ভস্ম জানা ॥
পানিকর্ণ বিষহরী ডাকেন আপনি।
মন্ত্রজল চক্ষে মারে নেতাই ধোবনী ॥
কালঘুম মন্ত্রে ডাকে[১] বিষহরী মায়।
ছাড়িল চক্ষের বিষ লক্ষীন্দর চায় ॥
আইল গরুড় পক্ষী বহু দুরবার[২]
যার পিঠে বিষ্ণু হন আপনি সভার[৩] ॥
ডাকেন গরুড় পক্ষী ত্রিভুবন জিনি।
হরিল গরল বিষ ফুঁকে কৈল পাণি ॥
ছাড় ছাড় ওরে বিষ পবনের ঘর।
খগ ডাক দিল তোরে গগন উপর ॥
বিষ খায় বিষ চরে সর্প ধর্‌য়া গিলে ॥
খগ স্মরণে বিষ ধীরে ধীরে চলে ॥
বিষের বিষম ডাক দিলেন নেউলে।
কাঁপিল বিষের তনু হইয়া ব্যাকুলে ॥
শতেক গরুড় জমা হইল এক বাসে।
বিষ-বলে কোথা যাব গরুড়ের ত্রাসে ॥
স্বর্গে গেলে ইন্দ্র কাঁপে বাসুকি পাতালে।
ছাড়িয়া গরল বিষ পেটে আস্য উলে[৪] ॥
চালনে চালিয়া বিষ বিষহরী আনে।
গণ্ডী[৫] মুণ্ড কাটে নেতু উলিল চরণে ॥
হরণ গুছন শেষে ডাকেন উড়ান।
আরে আরে বিষ বেগে ধর নিজ স্থান ॥
দূর্বার উপর হৈল শিশিরের ভর।
ডম্বরু বাজান হর তাহার উপর ॥

১ পাঠান্তর—ডাকে ২ দুর্বার ৩ সওয়ার ৪ নেমে ৫ শরীরের মধ্যভাগ।

কি কর কি কর বিষ রক্তে করি বাস।
চাহিলে মনসা ক্রোধে ফুঁকে যার নাশ ॥
মন্ত্রে হর পবনে হর   মনের বিষ পবনে হর।
মন চলিতে পবন চলে   শূন্যের বিষ শূন্যে হরে।
ভাটাল সকল বিষ নাই ছাড়ে ঘা।
হর বিষ হর নেতু মারিলেন পা ॥
ধন্য সে কালীর বিষ এতেক প্রকারে।
*ভস্ম হৈয়া নাই যায় গড়ে[1] কথোদূরে ॥
মনসার পাদপদ্মে লক্ষ্মীন্দর লুটে।
কবিরাজে বিষহরী রাখিবে সংকটে ॥

ত্রিপদী

লক্ষ্মীন্দর প্রাণ পাইল   দেবে জয় জয় দিল
        বেহুলা দিলেন হুলাহুলি।
ভাসিল আনন্দ জলে   মৃত পতি লয়্যা কোলে
        সুখ কে পারিবে তার বলি ॥
মনসার পদ্মপায়   বেহুলা লুটিয়া যায়
        বলে মাতা কৃপার সাগরী।
তুমিগো গুণের রাশি   দোঁহে হব দাস দাসী
        থাকিব চরণ সেবা করি ॥

১ পাঠান্তর—পড়ে।

*সাপের বিষ নামানোর মন্ত্র সম্পর্কে উল্লেখ অথর্ববেদ, অগ্নিপুরাণ, এবং গরুড় পুরাণের মধ্যে আছে। বিশ্বকোষ গ্রন্থে নগেন্দ্রনাথ বসু যে মন্ত্রটি উল্লেখ করেছেন তা হোল—
ওঁ জ্বল মহামতে হৃদয়ায় গরুড় বিরল শিরসে গরুড় শিখায়ৈ
গরুড় বিষভঞ্জন প্রভেদন:প্রভেদন বিত্রাশয় বিত্রাশয়
বিমর্দ্দয় বিমর্দ্দয় কবচায় অপ্রতিহত শাসনং বং হুং ফট্,
অস্ত্রায় উগ্ররূপ ধারক, সর্বভয়ঙ্কর ভীষয় সর্ব্বং দহদহ
ভস্মীকুরু কুরু স্বাহা নেত্রায়। (বিশ্বকোষ, সং নগেন্দ্র নাথ বসু, একবিংশ ভাগ, পৃঃ ৩০৮)
গরুড়ের নামোল্লেখ এবং বিষভস্ম হবার কথা উভয় মন্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায়।

শ্বশুর শাশুড়ি মাতা কি করিবে বন্ধু ভ্রাতা
সেই সব মায়ার সংসার[১]।
তব পদ আশ্রে করি তরিব সংসার বারি
লোকে ধন্য জীবন আমার ॥
হরের ঔরসে জাতা তুমিগো ভুজঙ্গমাতা
সৃষ্টি স্থিতি সংহারকারিনী।
এক নিবেদন করি ক্ষেম দোষ বিষহরী
বাসনা পূরহ মোর জানি ॥
প্রভুরে লইয়া কোলে ভাসিতে অগাধ জলে
বোদাল্যার[২] দহে যবে আসি।
রাঘব বোআল দেখি গিলিল আঠুর[৩] চাকি
হৃদে মোর দিয়া গেল ফাঁসি ॥
প্রভু মোর উঠিবারে তে কারণে নাহি পারে
প্রতীকার কর ঠাকুরানী।
চিন্তিল মনসা ঘটে দেখিল মৎস্যের পেটে
আছে অস্থি জীর্ণ নহে জানি ॥
ডাকে দেবী হস্ত তুলি যাদুয়া মাধুয়া জালি
দুই ভাই আইস শীঘ্রগতি।
মনসায় ভয় বাসি দুই ভাই শীঘ্র আসি
দাঁড়াইল করিয়া প্রণতি ॥
মনসা দোঁহারে কহে যাঅ বোদালিয়ার[৪] দহে
রাঘবে ধরিয়া আন বেগে।
আছে মোর প্রয়োজন চলে ভাই দুইজন
উপনীত সমোদ্রের আগে ॥
দুর্গম গম্ভীর জলে বেড়িলেক মহাজালে
বেহুলা আগ্যায় মীন আছে[৫]।
পড়িল জালের ফান্দে দুই ভাই করি কান্ধে
আনি দিল মনসার কাছে ॥

১ পাঠান্তর—সকার ২ পা—বোহালিয়া ৩ হাঁটুর ৪ পা—বোহালির ৫ পা—বেহুলার শাপে মীন আছে।

দেখি মাতা কৃপাময়ী আশ্বাসিল দুই ভাই
প্রসাদ করিল এক মণি।
সে মণির গুন যত তাহাবা কহিব কত
দিনে লক্ষ রাজা যায় কিনি॥
তবে বিষহরী মায় চিরিয়া মৎস্যের কায়
করে অস্ত্র[1] ধরিয়া আপনি।
আঠুর উপরে রাখি নানা মন্ত্র মনে ডাকি
সন্ধানে জোড়িল ঠাকুরাণী॥
তন্ত্রের ঔষধ দিল মন্ত্র জল ছড়াইল
উঠিয়া দাঁড়ায় লক্ষ্মীন্দর।
দেবতা চরণ তলে করুণা করিয়া বলে
ভক্তিভাব করিয়া বিস্তর॥
মনসা চরণযুগে কবিরাজে এই[2] মাগে
সভাকার চিন্তিয়া[3] কুশল।
অশেষ সংকট ঘোরে উদ্ধারিবে সেই নরে
যেবা শুনে তোমার মঙ্গল॥

ত্রিপদী

সাধুর কুমর জোড়ি দুই কর
সম্ভাষয় দেবলোকে।
পড়িয়া চরণে মধুর বচনে
তুষ্টি করে একে একে॥
সংসারের গান লক্ষ্মীন্দর গান
বিষ্ণুমায়া বশ হৈতে।
করিয়া ভাবন সাধুর নন্দন
ত্রাসিত হইয়া চিতে॥
বলে বিড়ম্বন কৈল কোন জন
এত চঁপা নগ্র নহে।
কোথা মোর পিতা গর্ভধারী মাতা
কান্দে সাধু মায়া মোহে॥

১ পাঠান্তর—অস্থি ২ পা—ক্ষমা ৩ পা—চিন্তিবে।

হেন কালে সাধু দেখি কুলবধূ
গঞ্জন করয় তারে।
বলে একি কথা শুনরে বনিতা
অপরূপ দেখি তোরে॥
তেজি পুর মাঝ কুল ভয় লাজ
বসি আছ সভা মাঝে।
ছিল মোর কুল চন্দ্র সমতুল
ঢাকালি কলঙ্ক লাজে।
আমি সাধুপুত্র দুর্বাঋষি গোত্র
বণিক কুলের ধাতা।
লোক মধ্যে ধনী রাখিলে কু-ধ্বনি
কৈলে অতি মন্দ কথা॥
বেহুলা উত্তর স্বামীর গোষ্ঠ
দুকর জোড়িয়া কহে।
বলে শুন কথা না ভাব অন্যথা
দৈব দুঃখ কেবা সহে॥
বিভার দিবসে ছিলে লোহাবাসে
কালিনী দংশিল তোমা।
তোমা লয়্যা কোলে ছয়মাস জলে
বিধাতা ভাসাল আমা॥
সীমা মোর দুখে দিবে কোন লোকে
খণ্ডন করিবে দশা।
নেতু'কৃপা করি আনি দেবপুরী
পুরাল মনের আশা॥
পূর্ব পুণ্যফলে দেবতা সকলে
নিজ দেহ[১] দেখ ভলে।
মাতা পিতা ঘর চঁপাই নগর
দেখিবে ছ মাস গেলে॥

১ পাঠান্তর—নরদেহ

আদ্য অন্ত যত শুনিয়া ত্রাসিত
বলে ধন্য আগো রামা।
পুরুষের গতি যদি রহে সতী
নহে নহে শাস্ত্রে সীমা[১] ॥
প্রশংসি বহুত বেহুলা সহিত
মনসারে তুষ্টি করে।
কৃপার সাগরী দাস দাসী করি
রাখ মোর দুঁহাকারে ॥
তুমি মাতা পিতা দুই লোক ত্রাতা
ধৈরজ[২] ধারিনী ধাতা।
ত্রিভুবন ব্যাপী তুমি নাগরূপী
হরের ঔরসে জাতা ॥
পিতা মোর মন্দ তোমা সনে দ্বন্দ্ব
করিয়া পাইল ফল।
যুবতীর ধর্ম মোর শুভ কর্ম
থাকি সে বিপদ তল ॥
বলে বিষহরী যাও তোরা পুরী
অঙ্গীকার করি মোরে।
চান্দ সদাকরে নানা উপহারে
পূজিবে আপনা ঘরে ॥
যদি করে আন হারাবে পরাণ
নিশ্চয় কহিলু তোরে।
মনসার বাণী শুনিয়া নাচনী
নিবেদয় জোড়ি করে ॥
পূজিবে শ্বশুর ক্রোধ কর দূর
যদি নিবেদন রাখ।
যাইতে বল দেশ বলি যে বিশেষ
ধর্মপথ নহে দেখ ॥

১ পাঠান্তর—না রহে দুঃখের সীমা ২ পা—ধরণা

জিয়াইয়া স্বামী সুখে যাব আমি
আপনার কার্য্য সাধি।
ছয় জায়া মোরে দেখি নিরন্তরে
তুলিবে দুঃখের নদী ॥
অঝোর করুণা করিবে শোচনা
সহিতে নারিব প্রাণে।
কীর্তি যুগে যুগে থাকু ভূমিভাগে
ছ ভাইয়ুরে দেহ দানে ॥
পূর্ণ কর আশা শুনিয়া মনসা
ভাবনা করিল মনে।
কবিরাজে ভনে আরম্ভি চরণে[১]
মনসা চরণ ধ্যানে ॥

পয়ার

উর উর বিষহরী তেজ নিজ স্থান।
সেবক তোমারে ডাকে চিতে করি ধ্যান ॥
স্বর্গ মঞ্চ অন্তরীক্ষ আছ কি পাতালে।
সেবক স্মরণ করে উর ভূমণ্ডলে ॥
সেবকের মুখে শুন আপনা সঙ্গীত।
আসর ধরুক শোভা আইস ত্বরিত ॥
তবে নেতু নিবেদয় শুন বিষহরী।
শান্তি মূর্তি ধরি মাতা ক্রোধ দূর করি ॥

১ পাঠান্তর—আরম্ভ শ্রাবনে (নাগপূজার প্রশস্ত কাল শ্রাবণ থেকে কার্তিক)

ছ পুত্র সাধুর যদি দিতে পার তুমি।
জগতে পাইবে পূজা ভাল আমি জানি॥
পূর্ণ কর বেহুলার মনের বাসনা।
সংসার ভরিআ যশ ঘোষু সর্বজনা॥
শুনিয়া নেতুর কথা দেবী বিষহরী।
বরুণের মুখ মাতা চাহিলেন হেরি॥
শুনহে বরুণ তুমি যাঅ নিজ পুরে।
সাধুর ছ পুত্র আন আমার গোচরে॥
অকাল মরণ হেতু রাখি তোমা স্থানে।
কালে মৃত্যু হৈলে যায় যমের ভুবনে॥
অকাল মরণে না যাইতে যমপুরে।
ধর্মপুত্র যমালয় কালে সভাকারে॥
মনসার আগ্যা পায়্যা চলিল বরুণে।
সাধুর ছ পুত্র ডাকি আনে বিগুমানে॥
নানা আভরণ দিল বরুণ সভারে।
পৃথিবীতে সুদুর্লভ বাখানি যাহারে॥
নানা ধনে তুষ্ট করি বলেন বচন।
পৃথিবীতে চল অবে তোরা ছয় জন॥
সাধুর কুমার তোরা চঁপা নগ্রে ঘর।
মনসা মারিল তোর ছয় সহোদর॥
বিভারাত্রে সর্পাঘাতে তেজিলে জীবন।
মাতাপিতা নারী তোর শোকে অচেতন॥
লক্ষীন্দর জন্ম হৈল তোমার ভুবনে।
পতিব্রতা নারী তার পূর্ব আরাধনে॥
স্বামীর মরণে সতী তেজিল ভুবন।
ভাসিল সমুদ্র জলে হৈয়া এক মন।
ধন্য ধন্য জন্ম তার রমণীর কুলে।
মনুষ্য শরীর হৈয়া স্বর্গে আসি মিলে॥
ধন্য মাতা ধন্য পিতা ধন্য তার স্বামী।
ধন্য দেশ ধন্য পৃথী সতী যেই ভূমি॥

পিতাকুল মাতাকুল[১] আপনার বংশ।
সপ্তকুল উদ্ধার পাতক কৈল ধ্বংস[২] ॥
পশু পক্ষী কীট আদি কিবা নর্ক ঘোরে।
সতীর প্রতাপে সবে স্বর্গ ভোগ করে ॥
সতীর পবন লাগে যত যত দেশ[৩]।
পবিত্র ভুবন করে হরে নানা ক্লেশ ॥
সতীর মনের দুঃখ উঠে যেই কালে ॥
ব্রহ্মা ধ্যান ছাড় রহে পৃথী পাছে টলে ॥
হেন সতী উপনীত তোমার ভুবনে।
স্বধর্ম্মে উদ্ধার করিল সাতজনে ॥
মনসা তাহার পতি দিল পুনর্ব্বার।
ছয় ভাই চল তোরা দেখিতে সংসার ॥
বরুণের পুরেতে আছিল যতজন।
সভারে বিদায় মাগে হৈয়া দুঃখ মন।
বরুণে প্রবোধ করি ছয় সহোদর।
মনসা চরণ তলে শরণ কুমর[৪] ॥
বিষহরী আদি যত ছিল দেবগণ।
সভাকারে ছয়জন প্রণিপাত হন ॥
বেহুলা সুন্দরী তবে দেখিয়া ভাসুরে।
লজ্জিত হইয়া বস্ত্র টানি দিল শিরে ॥
লাজে অধোমুখী রামা নেতুর পশ্চাতে।
মনসা মনের মধ্যে লাগিল হাসিতে ॥
লক্ষীন্দর সাথে ছয় ভাইর মিলন।
বেহুলারে আনন্দিত কহে কোনজন ॥
মায়ায় মোহিত হৈল সাত সহোদর।
স্মরণ পড়িল মনে মাতাপিতা ঘর ॥
মনসা বলেন শুন বেহুলা সুন্দরী।
পুরিল মনের আশা যাও নিজ পুরী ॥

১ পাঠান্তর—পিতৃকুল মাতৃকুল ২ পা—সর্ব্বকুল উদ্ধার করে পাপ করে ধ্বংস ৩ পা—সতীর গমন করে খ্যাতি দেশ দেশ। ৪ পা—মনসা চরণে জানি সঁপিল তাহারে।

তোর দুঃখে প্রাণদান দিলু সাতজনে।
স্মরণে সদয় হব যাঅ নিকেতনে॥
প্রথমে আমারে চান্দ দিবে পুষ্প[১] জল।
তবে পূজা নিব আমি অবনী মণ্ডল॥
বেহুলা বলেন মাতা আমি তব দাসী।
ক্ষমিবে সহস্র দোষ যদি হই দোষী॥
পূজিবে শ্বশুর মোর চরণে তুমার।
অন্তকালে চরণ দেখাবে পুনর্বার॥
আর এক নিবেদন জাগে মোর মনে।
সাত ডিঙ্গা শ্বশুরের ডুবাইলে কেনে॥
কৃপা করি বিষহরী দেঅ সাত তরি॥
অনাথা কিরূপে ঘরে যাইবারে পারি॥
কলার মান্দাসে একা ভাসিলু সাগরে।
কূল পাইলাম তব কৃপা অনুসারে॥
মনসা বলেন ভাল কহিলে বেহুলা।
অষ্টজনা ভার কোথা সহে রম্ভা ভেলা॥
নেতুরে জিগ্যাসা করে বিষহরী মায়।
কেমনে যাইবে বেউলা বলনা উপায়॥
নেতু বলে হনুমানে করহ স্মরণ।
নিমিষে সাধুর নৌকা তুলিবে এখন॥
কারণ জানিয়া মাতা হনুমানে ডাকে।
পবন নন্দন বাছা আসরে সমুখে।
করিলে রামের কার্য্য সমুদ্র লঙ্ঘনে।
অসাধ্য সাধ্যের কার্য্য নহে তব বিনে॥
সমুদ্রে ভাসিবে তরি ধরি করপুটে।
তুলি দেহ সাত ডিঙ্গা নেতাইর ঘাটে॥
সমুদ্রের জলে গিয়া উলে[২] হনুমান॥

১ পুষ্প২ পাঠান্তর—উরে

মনসা মনের মধ্যে করিলেন ধ্যান
যেইখানে চান্দ বাণ্যা ডুব্যাছিল নায় ।
চরণ হিলায়্যা জলে দেখিবারে পায় ॥
সপ্তডিঙ্গা জলে তুলে পবননন্দন ।
আনিয়া নেতুর ঘাটে করিল বন্ধন ॥
পবন নন্দন সেই পবনের বায় ।
মনসারে কহি পুন নিজস্থানে যায় ॥
হারা ধন জন দিয়া বলে বিষহরী ।
পুরিল মনের আশা যাও নিজপুরী[1] ॥
মনসার পাদপদ্মে সাত সহোদর ।
প্রণতি করিল সভে হইয়া কাতর ॥
মনসা আশীষ কৈল সাত সহোদরে ।
অন্তে গতি পাবে তোরা[2] থাক মর্ত্ত পুরে ॥
যতেক দেবতাগণে হৈল নমস্কার ।
বিনয় প্রণতি ভাবে সাধুর কুমার ॥
বেহুলা সুন্দরী পড়ে মনসার পায় ।
কোলে করি বিষহরী তুলিলেন তায় ॥
চুম্বন করিলেন তার পঙ্কজ বদনে ।
বলে মাতা যশ তোর ব্যাপুক ভুবনে ॥
*ব্রতকন্যা তুমি মোর সংসারের মাঝে ।
উদ্ধারিয়া দুইলোকে যাবে নিজ তেজে ॥
পাইলে অনেক দুঃখ আমার কারণে ।
যুগে যুগে যশ তোর ব্যাপুক ভুবনে ॥
শত শত প্রণিপাত মনসায় করি ।
বিদায় মাগিল শিবে বেহুলা সুন্দরী[3] ॥
ইন্দ্র চন্দ্র ভবানীর চরণ কমলে ।
কুবের বরুণ যম দশদিগপালে ॥

১ পা—নিজপুরে যাও সভে দুঃখ দূর করি ২ পা—সুখে * পরপর চার ছত্র ভিন্ন পুঁথি থেকে সংগৃহীত। ৩ পা—প্রাণপাত করি

অষ্টাঙ্গ প্রণতি করি মাগিল বিদায় ।
আনন্দে আশীষ কৈল দেবগণে তায় ॥
ছ ভাসুরে প্রাণনাথে করিয়া উদ্ধার ।
হরিধ্বনি করি রামা হৈল আগুসার ॥
নেতুরে লইয়া সভে ঘাটের কিনারে ।
সাত ডিঙ্গা ঘাটে দেখে অতি মনোহরে ।
দেখিয়া সায়ের সুতা আনন্দ অন্তর ॥
উপরে মালিম লাগে আজুয়ার উপর ॥
যেইমত ডিঙ্গা মাতা ডুব্যা ছিল জলে ।
কিঙ্কিতে তাহার দ্রব্য কিছুই না টলে[1] ॥
নানা ধনে সপ্ত ডিঙ্গা ভাসয়ে সুন্দর[2] ।
ডিঙ্গার মুখেতে সাজে মুকুতার ফল ॥
রত্নে বিভূষিত ডিঙ্গা দেখিয়া সুন্দরী ।
বলে পতিব্রতা এই ধনা-বিষহরী ॥
নেতু বলে শুভক্ষণে জন্মিলে সুন্দরী ।
হারা ধনজন লয়্যা যাঅ নিজপুরী ॥
কন্যা রত্ন তুমিগো জন্মিলে যার গর্ভে ।
না জানি কতেক তপ কর‍্যাছিল পূর্বে ॥
বেহুলা বলেন মাতা তোমার প্রসাদে ।
রাখিলে আমার মান বাড়ায়্যা সম্পদে ॥
গর্ভধারী অধিক জননী তুমি মোর ।
কি গুণ সাধিতে আমি পারিব তোমার ॥
অনুমতি দেঅ যদি যাই নিজপুরী ।
নহে বা তোমার পদ থাকি আশ্রে করি ॥
নেতু বলে অরে বাছা তুমি মোর প্রাণ ।
শরীর থাকিতে তোর বাঞ্ছিব[3] কল্যাণ ॥
দেখ গিয়া পরিজন স্বামীর সহিতে ।
সুখে দিন যাউ তোমা জন্ম আয়ো হাতে ॥

১ পাঠান্তর—নষ্ট নহে জলে ২ করে ঝলমল ৩ করিব

চুম্বন করিল নেতু বদন মণ্ডলে।
পরিতে বসন দিল সিন্দুর কপালে।
নেতুর চরণে সভে কৈল নমস্কার।
শুভক্ষণে যাত্রা কৈল সাধুর কুমার ॥
ধরণীরে তুতি করি গঙ্গার চরণে।
প্রণতি করিয়া নায় বসে[১] অষ্টজনে ॥
মনসার-পাদপদ্ম মস্তকের আগে।
বন্দিয়া মনসা চরণ কবিরাজে মাগে ॥

একপদী

ভাবি বিষহরী একধ্যান করি।
জয় জয় দিয়া নায় বসিল সুন্দরী ॥
কদলীর ভেলা দেখি হেন বেলা।
প্রণতি করিয়া তারে বলেন বেহুলা ॥
পৃথিবী ভিতরে থাক নিরন্তরে।
শুভকার্য্যে আদর করুক সর্বনরে ॥
প্রসাদে তোমার রহিল সংসার।
সিদ্ধ হৈল মোর কার্য্য থাকু নমস্কার ॥
স্বামীর সঙ্গতি বসিল যুবতী।
ছয় নায় ছয় জনা বৈসে শীঘ্রগতি ॥
আজুয়ার সন্ধানে দক্ষিণ পবনে।
বান্ধিয়া ছাড়িল ডিঙ্গা বিষহরী ধ্যানে ॥
কৃপা মনসার উপরে যাহার।
অসাধ্য তাহার কর্ম কিবা আছে আর ॥
জিনিয়া পবন নৌকার গমন।
আজুয়ার প্রথর পুরে প্রথর বদন ॥

১ পাঠান্তর—বৈসে

সাত সহোদরে ডিঙ্গার উপরে।
কর্ণধার হৈয়া হালি ধরিলেন করে ॥
সলক সন্ধান[1] লঙ্কার পয়ান[2]।
ত্রিধারা গঙ্গার জল দেখিবারে পান ॥
বেহুলা সুন্দরী নিবেদন করি।
বলিল উত্তর দিগে ভাসাইতে তরি ॥
সমুদ্রের জল তরঙ্গ প্রবল।
কল্লোলে হিল্লোল করে নৌকা টলমল ॥
সাধুর নন্দন জল বিবরণ।
না জানি সমুদ্র দেখি সভে ত্রাসমন ॥
দহে বোদাল্যার হৈল আগুসার।
বেহুলা স্বামীরে কহে পূর্ব সমাচার ॥
এই দহ জলে আসিবার কালে।
আঠুচাকি তোমার রাঘব মৎস্য গিলে ॥
দুঃখ এইখানে যত হৈল মনে।
কহিতে সে সব কথা পারে কোন জনে ॥
কৃপা মনসার মৎস্য গেল মার।
পুনর্বার আঠুচাকি জুড়িল তোমার ॥
বেহুলা বচন শুনি ত্রাসমন।
ত্রাসিত অন্তর হৈয়া সভে প্রশংসেন ॥
মান্দাস সলিলে খসিল যে কালে।
সে কথা বেহুলা কহে পরাণ বিকলে ॥
বলেন সুন্দরী মাতা বিষহরী।
সেখানে রাখিল মোরে প্রাণে নাই মারি ॥
সমুদ্রের জল হইল প্রবল।
তরঙ্গে দুকূল ভাসে পরান চঞ্চল ॥
কুম্ভীর মগর নানা জলচর।
চতুর্দিগে সর্পগণ ধাইল[3] বিস্তর ॥

১ হুরুক সন্ধান (?) ২ পথ (?) ৩ পাঠান্তর—সর্বজন্তু বেড়িল

হৃদে হৈল ত্রাস খসিল মান্দাস।
একটি কলার গাছে দুজনার বাস ॥
তেজিবারে প্রাণ ভাবিলু নিদান।
পুনর্বার বিষহরী রাখিলেন মান ॥
ইহার উত্তার সাতগ্রাম পার।
গুহালিনী ভাঙ্গাইল লৈতে নিজ[1] ঘর ॥
কহেন সুন্দরী স্বামী বরাবরি।
কুকুর ঘাটায় আসি লাগে সাত তরি ॥
তার বিবরণ কহি আগমন।
ভাসায়্যা গোদার ঘাটে দিল দরশন ॥
গোদা সেই ঘাটে বসি নদীতটে।
ঘন ঘন মৎস্য মারে বড় মৎস্য উঠে ॥
বেহুলা দেখিল হাসিতে লাগিল।
গোদার পূর্বের কথা সকলি কহিল।
স্থল ভাল দেখি ডিঙ্গা তথা রাখি।
রন্ধন ভোজন কৈল সভে হৈয়া সুখী ॥
গোদা সেই স্থলে আসি হেন কালে।
বেহুলায় দেখি কিছু বলে[2] ॥
শুন আগো রামা মোর দুঃখ সীমা।
কে কহিতে পারে ভলে তরাইলে বামা।
সাধুর নন্দন হাসে সাতজন।
বেহুলা বলেন দুঃখ কর্মবশ[3] হন ॥
পূর্ণ কৈল আশা কেবল মনসা।
বিদ্যমানে দেখ এই না হৈলু নিরাশা ॥
গোদা বেহুলারে বলে জোড়করে।
সুন্দর হইয়া ঘরে গেলু তুমা বরে ॥

১ পাঠান্তর—লৈবা যাতে ২ পা—বেহুলারে চিন্তিয়া কিছু উত্তর বলে ৩ পা—কর্মদোষে

নারী হৈয়া মোরে ঝাটা মাইল শিরে।
এত দুঃখ হৈল মোর মাথা মার তরে ॥
কেবল বড়শি আড়ু[1] আমি প্রাণ পোসি।
কৃপা করি কিছু দেহ সুখে খাই বসি ॥
গোদার উত্তর শুনি লক্ষীন্দর।
নানা ধনে তুষ্ট করি নায় দিল ভর ॥
যে ঘাটে রাখাল নবলক্ষ পাল।
ধেনু রাখে সেই ঘাটে চলিল তৎকাল[2] ॥
কহিল সুন্দরী স্বামী বরাবরি।
সহস্র রাখাল ঝাঁপ দিল এই বারি ॥
আমার কারণ তেজয় জীবন।
সভে পাইল প্রাণ করি গঙ্গারে স্তবন ॥
রবি হেন কালে ডুবে সেই স্থলে।
একরাত্র রহিলু সে কেদার দেউলে ॥
অপূর্ব ঘটন মৃত্তিকা বলন[3]।
সিদ্ধরূপে বিষহরী ঘটে বিরাজন ॥
পুহাই রজনী মাগিলু মেলানি।
বাহিয়া উত্তরমুখে চলিলু উজানি ॥
দেখি নানা দেশ আনন্দ বিশেষ।
হাতিয়ার দহে গিয়া হইলু প্রবেশ ॥
মনসার বরে সে দহ উত্তারে[4]।
চঁপাতলে উপনীত বেলা দেড় পরে[5] ॥
রাখিলেক তরি বেহুলা সুন্দরী।
কহিল সকল কথা হৃদে দুঃখ করি ॥
বলে এইখানে ভাই সাতজনে
ঘরে লৈয়া যাইতে মোরে হৈল সকরুণে ॥
নাই গেলু বাস অনেক হুতাশ।
চঁপা তলে পোতি গেল কড়াইর সন্দেশ ॥

১ পাঠান্তর—আড়ি ২ পা—বেহুলা সেইঘাটে চলে ততকাল ৩ পা—সুপুষ্ট গঠণ
৪ পরে ৫ প্রহরে

বেহুলার বলে চাঁপা তলে খুলে।
কড়াইর সন্দেশ সভে এইরূপে তুলে ॥
সতীর বচনে আছে দ্রব্যগণে।
স্নান করি জলপান কৈল সর্বজনে ॥
বেহুলা স্বামীরে কহি জোড়ি করে।
প্রথমে দেখিব মায় কয়্যাছি ভাইরে ॥
যদি কৃপা হয় মোর সত্য রয়।
মায়ারূপে মায় ভেটিব নিশ্চয় ॥
আমার কারণ শোকে অচেতন।
কি জানি মায়ের প্রাণ আছে কি গেছেন ॥
বলে লক্ষ্মীন্দরে পুছহ সহোদরে।
দুইজনে দেখিয়া গিয়া আইস ঘরে ॥
শুনিয়া সুন্দরী স্বামী সঙ্গে করি।
কথো দূরে গিয়া তথা মায়ারূপ ধরি ॥
যোগেন্দ্র যোগিনী কৈল দুই প্রাণী।
কর্ণেতে কুণ্ডল লৈল দূরে তেজি মণি ॥
পিঠে ব্যাঘ্রছাল হাথে লৈল থাল।
গলে রুদ্রাক্ষের মালা শিঙ্গা বাজায় রসাল ॥
লোহিত বসন বিভূতি ভূষণ।
ডম্বরু ধরিয়া হাথে করিল গমন[১] ॥
মনসা চরণে কবিরাজ ভনে।
উমাপতি দাসে মাতা রাখিবে কল্যাণে ॥

সত্য যোগীরে মাই।
মায়ারূপে ভিক্ষা মাগে বেহুলা লখাই ॥
ধরিয়া যোগীর বেশ বালা[২] লক্ষ্মীন্দর।
নিছানি নগরে ভিক্ষা মাগে ঘর ঘর ॥
বেহুলা স্বামীর সঙ্গে পরম লজ্জিত।
দেখিয়া দোঁহার রূপ সভে মূরছিত ॥

১ পাঠান্তর—মায়ারূপ ধরিকরি করিল গমন পা—বেহুলা

থালভরি চালকড়ি দেয় সর্বজন।
কেহ ভক্ষ্যদ্রব্য দেয় কেহ দেয় বসন ॥
মনের হরষে ভিক্ষা[1] মাগি কথো ঘরে।
প্রবেশ হইল গিয়া সায়ের মন্দিরে ॥
লক্ষীন্দর গীত গায় বামা অতি মধুর[2]।
বেহুলা রাখয় তাল শুনিতে মধুর ॥
শুনিতে পাইল তাল অমলা সুন্দরী।
বলে কোথা হৈতে আইল অপূর্ব ভিখারী ॥
বেহুলার তালতন্ত্র পড়িল স্মরণ।
কান্দিতে কান্দিতে রামা করিল গমন ॥
দেখিতে দোঁহার রূপ অমলা আকুলে।
নিকটে দাঁড়াল আসি ভাসি অশ্রুজলে ॥
শাশুড়ির পুরী[3] দেখিলায়ে লক্ষীন্দর।
হেটমাথা করি রহে লজ্জায় কাতর ॥
অমলা জিগ্যাসা করে করুণ বচনে।
কাহার নন্দন ঘর কর কোনখানে ॥
আপনার নাম মাগো কহত বিশেষে।
আকুল পরাণ মোর হৈল তোর আশে ॥
বেহুলার প্রায় তোর দেখিগো বদন।
কুশলে আমার বাছা আর কি আছেন ॥
পিতামাতা কেমনে ধরিল তোর প্রাণ।
দয়া না করিয়া ভিক্ষা মাগিতে পাঠান ॥
বেহুলা বলেন তবে শুন ঠাকুরাণী।
কর্মবশে দুঃখ পাই দরিদ্র পরাণী ॥
দ্রব্য আছে ভোগহীন হয়্যাছে আমার।
ভিক্ষা দেহ দিন যায় ফিরি দেশ যার ॥
জন্ম মোর দিব্যকুলে দৈবযোগে যোগী।
করুণা করিয়া মাতা জিগ্যাস কি লাগি ॥

১। পাঠান্তর—কৌতুকে দোঁহে ২ পা—বাজায় ডম্বরু ৩ পা—মুখ।

অমলা বলেন মোর ছিল এক সুতা।
হৃদয় বিদরে তার স্মরিলে কথা।।
সে হেন গুণের কন্যা করিল নিরাশ।
হৃদে সে লদিয়া[1] গেল শূন্যে করি বাস।।
সরিল আমার সুখ সে কন্যার সনে।
বেহুলা বলেন সেই মরিল কেমনে॥
অমলা বলেন মোর কর্ম্মের লিখন।
কহিতে সে সব কথা দহে মোর মন।।
অল্পকালে বিভা দিলু সাধুর নন্দনে।
বিভারাত্রে পতি তার মরিল দংশনে।।
স্বামীর সহিত বাছা ভাসিল সলিলে।
নাজানি কুম্ভীর খাইল ডুবিল কি জলে।
অভাগী মায়ের প্রাণে কত কত হয়।
অন্তরে তুষের অগ্নি প্রতিদিন দয়॥
হায় হায় করি রাত্রদিন বসি কান্দি।
একদিন স্বপ্নে বাছা দেখা দিল যদি।
ধুবনীর ঘাটে বাছা কাচয়ে বসন।
ঘামে দরদর তনু বিরস বদন॥
দেখিয়া আকুলে যাই ধরিবারে কোলে।
পাপ নিদ্রা ছাড়ি মোর গেল হেন কালে॥
বেহুলা তাহার নাম গুণে নাই সীমা।
স্মরণ পড়িল আজি মুখ দেখি তোমা॥
সেই রূপ সেই কথা দেখিয়া তোমার।
দহিল শরীর প্রাণ মেলিল বিস্তর॥
কহিতে কহিতে গ্যান হারিল অমলা।
জননীর দুঃখ দেখি কান্দয়ে বেহুলা॥
গুপ্তবেশ লক্ষীন্দর বেহুলারে কন।
কি কার্য্য করিলে রামা আসিয়া আপন॥

১ চাপিয়ে দিয়ে।

বেহুলা বলেন প্রভু দিব পরিচয়।
জননীর দুঃখ দেখি জীবন সংশয়॥
লক্ষ্মীন্দর বলে পাছে জানয় সংসার।
গুপ্ত বেশে আসি কথা করিলে প্রচার॥
বেহুলা বলেন একা জানিবে জননী।
প্রবোধ করিয়া প্রভু যাব দুই প্রাণী॥
লক্ষ্মীন্দর সায় দিল হেটমাথা করি।
প্রণাম করিয়া কহে সাধুর[১] কুমারী॥
বেহুলা বলেন মাগো না কান্দিঅ আর।
হেটশিরে[২] লক্ষ্মীন্দর জামাতা তোমার॥
বেহুলা আমার নাম তোমার কিঙ্করী।
গর্ভধারী তুমি মোর অমলা সুন্দরী॥
কহিলে দুঃখের কথা কে ধরিবে প্রাণ।
নারী জন্ম হৈয়া এত কে সহিবে আন॥
কেবল তোমার পুণ্য মনসার বরে।
জিয়াইয়া পুনর্বার আইলু প্রভুরে॥
মনের বাসনা ছিল দেখিব চরণ।
তেকারণে গুপ্তবেশে আইলু দুইজন॥
পরিচয় নেঅ মাগো না কর রোদন।
পিতারে না কহ মোর এসব কথন॥
ছ ভাসুর সপ্তডিঙ্গা স্বামীর সহিতে।
চঁপাতলে বসি আছে চায়্যা মোর পথে॥
যদি মনসার ঘট শ্বশুর আমার।
পূজিবে সংসার ভোগ রহিবে সভার॥
পূর্ব হৈতে আশা মোর ধর‍্যাছিল মন।
দেশে আইলে পুনর্বার দেখিব চরণ॥
অমলা এসব কথা বেহুলার শুনি।
শিরে হস্ত দিয়া কোলে ধরিল জননী॥

১ পাঠান্তর—হেটমাথা ২ পা—মায়ের

লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদন পঙ্কজে ।
পুনর্বার প্রাণ যেন আইল তনুমাঝে ॥
আনন্দ সাগরে কিবা ভাসিল কামিনী ।
শোক[১]অগ্নি উপরে ঢালিল যেন পানি ॥
বলে বাছা কত দুঃখ পাইলে[২] পরাণে ।
সুকোমল সূক্ষ্ম তনু ধইলে কেমনে ॥
অভাগী মায়েরে মনে হৈল এতদিনে ।
দিবসে আন্ধার মোর তোমার বিহনে[৩] ॥
ঘুচিল তিমির আজ মুখ দরশনে ।
গলে ধরি বেহুলারে বলে সকরুণে[৪] ॥
ধরুক ঘরের শোভা আইসগো ভুবনে ।
ঘরে আস বস মাগো জামাতার সনে ॥
বেহুলা বলেন মাগো কথার প্রস্তাবে ।
পরিচয় দিলু মাতা ঘরে যাঅ এবে ॥
কঠিন হৃদয় মোর হৈয়াছে পাষাণ ।
নাহৈলে কি প্রাণনাথ বাচালু নিদান ॥
দেখিলে জামাতা আর আপনার সুতা ।
পশ্চাতে পাঠাঅ লোক কৃপা করি মাতা ॥
তরিয়া সংকটে আইলু না হৈল মরণ ।
হৃদয়ের দুঃখ তেজি যাঅ নিকেতন ॥
মায়েরে প্রবোধ করি বেহুলা সুন্দরী ।
লক্ষ্মীন্দর সহিতে প্রণাম দুঁহে করি ॥
ছাড়িয়া মায়ের মায়া চলিল বেহুলা ।
হরষ বিষাদে ভাবে কান্দিয়া অমলা ॥
চরণ না চলে তার দেখি দুইজনে ।
চাহিয়া দুঁহার মুখ রহিল সেখানে ॥
স্বামীর পশ্চাতে বালা করিল পয়ান ।
চঁপাতলে প্রবেশিল দিন অবসান ॥

১ পাঠান্তর—অনন্তা ২ পা—সহিলে ৩ পা—হৈল তোমা বিনে ৪ পা—বলয়ে করুণে

ডিঙ্গার উপরে বসি বাহ বাহ বলে।
প্রবেশিল সাতডিঙ্গা গাঙ্গুড়ির খালে॥
দেখিতে পাইল ঘর লোহার বাসর।
রাখিলেন সাতডিঙ্গা ফেলিয়া নঙ্গর॥
আনন্দ সভার চিতে হৈল অতিশয়।
মনসা মঙ্গল গীত কবিরাজে গায়॥

ত্রিপদী

বেহুলা সুন্দরী করপুট করি
নিবেদয় সভাকারে।
বলে প্যায়া ক্লেশ আসি নিজদেশ
বিসরিলে মনসারে॥
দেব বিদ্যমানে মনসা আপনে
সত্য কৈল মোর সনে।
যদি সদাকরে পূজিবে আমারে
যুগল চরণ ধ্যানে॥
তবে যাবে ঘরে থাকি কথোদূরে
প্রথমে জানাবে গিয়া।
মনসা বচন বিরূপে লঙ্ঘন
করি নিজ কর্ম পায়্যা॥
দুঃখনিধি ঘোরে উদ্ধারি সভারে
পাঠাইল বিষহরী।
যদি আগ্যা হয় মোর সত্য রয়
যাই শ্বশুরের পুরী॥
মায়ারূপ ধরি শাশুড়ীরে হেরি
কহিব কথার ছলে
শ্বশুরে বুঝায়্যা অঙ্গীকার লৈয়া
যাব সভে কুতূহলে॥

ছ ভাসুর পতি দিল অনুমতি
বেহুলা উঠিল কূলে।
ভাবিল সুন্দরী নাই যাব পুরী
ভেটিব কেমন ছলে।
যদ্যপি শ্বশুর ধরিবে উত্তর
তবে যাব গৃহবাসে।
না হৈলে মনসা হরিবেন আশা
সভারে বধিবে শেষে॥
একধ্যান করি ভাবিল সুন্দরী
মনসা চরণ রাজে।
জানি বিষহরী শূন্যে ভর করি
উরিল পৃথিবী মাঝে।
পদ্ম ছিল হাতে মনসা তাহাতে
ধ্যান করি দিল ফেলি।
বেহুলার করে পদ্ম শূন্যভরে
অপূর্ব বিচনী[১] হেলি॥
লক্ষের বিচনী দেখিয়া কামিনী
ডোমনীর বেশ ধরে।
পুরুনা বসন অঙ্গের ভূষণ[২]
আভরণ তেজি দূরে॥
হস্তে করি ধনী লক্ষের বিচনী[৩]
চাঁপানগ্র মুখে যায়॥
বিচনীর শোভা কহি পারে কেবা
বিজুরি ঝটকে তায়॥
মণি হীরা নীলা মুক্তা সঙ্গে পলা
বেড়ি আছে পাঁতি পাঁতি।
নানা বর্ণ ধরে প্রাণী মন হরে
জিনিছে সূর্যের জ্যোতি॥

১ ব্যজনী ২ পাঠান্তর— অঙ্গে আচ্ছাদন ৩ লক্ষমূল্য মূল্যের ব্যজনী

নগরের লোকে ধায় ঝাঁকে ঝাঁকে
অপূর্ব বিচনী দেখি।
বড় বড় ধনী মূল্য করে জানি
বলে শুন চন্দ্রমুখী[১] ॥
অপূর্ব বিচনী আনিছ কামিনী
মনুষ্যে নির্মাণ নহে।
বল অকপটে কত মূল্য বটে
বেহুলা শুনিয়া কহে ॥
লক্ষের বিচনী কিনে কোন ধনী
হেন ধনী নাই দেখি।
ফিরি নানা দেশ পাই নানা ক্লেশ
ঘরে যাইতে মন রাখি ॥
হেনকালে শুনি চাঁপানগ্রে ধনী
আছে কত সদাকর।
ফিরি কথোদূরে[২] যাব নিজপুরে
কহ ধনী কোন নর ॥
বলে সাধুগণ করগো গমন
চাঁদের ভুবন মাঝে।
তাহা হৈতে ধনী দেখি নাহি শুনি
নিতে পারে ধনতেজে ॥
বেহুলা হাসিয়া চলে দৃঢ় হৈয়া
লোহার বাসর যথা।
দেখিয়া বাসর জোড়ি দুইকর
প্রণাম করিল তথা ॥
মুদ্রিত[৩] কপাটে ফিরি চারিতটে
কান্দিতে লাগিল রামা।
বিবাহের নিশি যত দুঃখ বাসি
ইহারে কে দিবে সীমা ॥

১ পাঠান্তর—বিধুমুখী ২ পা—প্রতিদ্বারে ৩ বন্ধ।

অমলার বালা চলিল বেহুলা
লক্ষের বিচনী হাতে ॥
সনকা সুন্দরী যান স্নান করি
ভেটিল দুজন পথে ॥
চাহিল নয়ানে বন্দিল পরাণে
স্মরণে পড়িল কথা।
কাঁদে উভরায় ঘনে মুখ চায়
ধরণী লুটায়্যা তথা।
মহাশোক ভরে চলিতে না পারে[১]
ডাকে পুত্রবধূ বলি।
কবিরাজে গায় মনসার পায়
সুখনিধি আইল চলি ॥

পয়ার

সনকা বলেন কথা শুনগো সুন্দরী।
কার কন্যা কোথা ঘর কার তুমি নারী ॥
লক্ষের বিচনী হাতে নহেগো দুঃখিতা।
দহিল পরাণ মোর জীবন সংশিতা ॥
বেহুলা বলেন মাগো প্রাণে হৈল ডর ॥
মোরে দেখি কান্দ কেন কহগো উত্তর ॥
সনকা বলেন মোর বধূর অবয়া।
তোরে দেখি হৈল মোর আকুলি হৃদয়া ॥
বিদ্যমানে দেখ এই লোহার বাসর।
বিভারাত্রে পুত্র মৈল বধূ দেশান্তর ॥
আমার দুঃখের কথা কহিলেকি সরে।
সাতপুত্র খায়্যা মুখ না দেখাই কারে ॥

১. পাঠান্তর—চিনিতে না পারে।

কেবল আমার অঙ্গে প্রাণ নাই ছাড়ে [১]।
গলিত হইয়া দুঃখ বিন্ধি আছে হাড়ে ॥
কঠিন পুত্রের শোকে হৃদয় বিদরে ॥
পাষাণ গলিয়া যায় প্রাণ কেবা ধরে ॥
দুরাচারী ভাগ্যহীন মুই পাপমতি।
পুত্রশোকে শরীর দহিল দিবারাতি ॥
নিত্য দুঃখে তনু মোর হয়্যাছে পাষাণ।
অশেষ পাপের ভাগী[২] আমি সে নিদান ॥
মনসা আমার আশা করিল নিরাশ।
স্বামী দোষে মোর পুত্রে করিল বিনাশ ॥
বেহুলা বলেন মাগো দেবী বিষহরী।
তার সঙ্গে বাদ কৈলে রহে কার গারি[৩]
স্বামীরে বুঝায়্যা কর মনসা পূজন।
হারা পুত্র কোলে মাগো পাইবে আপন ॥
সনকা বলেন বাছা তুমি কোনজন।
কহিলে অদ্ভুত কথা শুনি ত্রাসমন ॥
মোর দিব্য আছে যদি কহ অন্য করি।
হবেকি আমার বধূ বেহুলা সুন্দরী ॥
যুড়াউ শরীরে প্রাণ আইসু পুনর্বার।
বধূ হৈতে বংশ মোর হবেকি উদ্ধার ॥
করুণা শুনিয়া রামা করিল প্রণাম।
দুকর জোড়িয়া বলে বেহুলা মোর নাম ॥
আছিল বিশেষ[৪] পুণ্য তোমায় [৫]আমায়।
দুর্গম সমুদ্র তরি ভেটি মনসায় ॥
স্বামী দান দিল মোরে দেবী বিষহরী।
ছ ভাসুরে দিল প্রাণ আর সপ্ততরি ॥[৬]

১ পাঠান্তর—কঠিন আমার প্রাণ পিণ্ড নাহি ছাড়ে ২ পা—পাপা ৩ সীমা
৪ পাঠান্তর—তোমার ৫ পা—বিশেষ ৬ পা—তবে সাতপুত্র তব আনিবে নিস্তরি।

গাঙ্গুড়ির খালে মাগো নৌকার চাপান।
ধরি হীনজাতি বেশ আইলু তব স্থান ॥
শ্বশুরে বুঝায়্যা আগু পূজ বিষহরী।
তবে সাতপুত্র আন আর সপ্ততরি ॥
বেহুলার কথা শূন্যা পীউষ সমান।
মৃতদেহে পুনর্বার[১] বসিল কি প্রাণ ॥
আনন্দ হইয়া কৈল বেহুলারে কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদন কমলে[২] ॥
আপ্যাইত[৩] তনু হৈল বধূ করি কোলে।
দূরে দুঃখ গেল মূর্ছা হৈল সুখজলে ॥
সনকা বলেন বাণী কহিলে নিদান।
সত্যকি আমার দুঃখ হৈল অবসান ॥
দুঃখের রজনী আজু পুহাইল জানি।
উদ্ধারিলে ভগীরথ বংশ গঙ্গা আনি ॥
বেহুলা বলেন আমি কহি তব স্থান।
বিষহরী পূজা বিনে না পাবে নিদান ॥
সনকা বলেন বাছা দিলে সমাধান।
প্রিতয় না যায় মোর নিদারুণ প্রাণ ॥
শুনিয়া বেহুলা সাথে করিয়া সনকা।
লোহার বাসর দ্বারে দিল গিয়া দেখা ॥
প্রদক্ষিণ করি[৪] বেহুলা ধরিল কবাট।
বিনয়ে দিলেন ডাক ছাড়ি দেহ বাট ॥
কবাট খসিল বেগে বেহুলার বলে।
বাসরে প্রদীপ দেখ মন্দ মন্দ জ্বলে ॥
অগ্নিশিখা বেহুলা বন্দিল নিজ শিরে।
করুণা করিয়া রামা চাহেন বাসরে ॥
অদ্ভুত সনকা দেখি ভাবিল হৃদয়।
জানিল কে মায়াধারী বধূ মোর নয় ॥

১ পা—মূর্তি ধরি ২ পা—মণ্ডলে ৩ পা—পুলকিত ৪ পা—প্রণতি করিয়া

না জানি কি তপ পূর্বে কৈলু কোনখানে।
সেই তপে বধূ রূপে আমার ভুবনে ॥
বেহুলারে কোলে করি সনকা সুন্দরী।
উপনীত যেইখানে চান্দ অধিকারী ॥
বেহুলা প্রণাম করে সনকার সাথে।
নিবেদন কথা সব চাঁদের সাক্ষাতে ॥
সাতপুত্র সাতডিঙ্গা মনসার বরে।
ঘরে আন সদাকর পূজি মনসারে।
শুনিতে পাইল ঘরে আর ছয় বধূ।
সভে বলে মনসারে পূজা কর সাধু ॥
আসিল নগরের লোক সাধুর মন্দিরে।
হরিধ্বনি দেয় সভে প্রশংসি বেহুলারে ॥
তথাচ না ছাড়ে গর্ব চান্দ অধিকারী।
ঢালিলে পাষাণে জল নহে মৃদুকারী ॥
চান্দবাণ্যা বলে তবে পূজি বিষহরী।
শুকুলাতে চলিয়া আইস্থ সাততরি ॥
সর্বদা আমার মন নাই পূজিবারে ॥
তবে পূজি যদি নৌকা চল্যে আইসে ঘরে[১] ॥
সনকা বলেন মাগো তুমি পতিব্রতা।
পৃথিবী ভিতরে রাখ ঘোষিবারে কথা ॥
দুর্গম তরিলে মাগো কলার মান্দাসে ॥
হারা ধনজন লৈয়া আইলে নিজ দেশে ॥
হেন কর্ম পৃথিবীতে করে কোনজন।
উদ্ধার পাইলু মোরা তোমার কারণ ॥
মনসার দাসী মাগো তুমি অতিশয়।
রাখহ সাধুর মান চিন্ত মনসায় ॥
শুনিয়া অতেক কথা সায়ের কুমারী।
হৃদে ধ্যান করিয়া চিন্তিল বিষহরী ॥

১ পাঠান্তর—ঘারে

কোথা আছ আগো মাতা সেবকরক্ষণী।
পালহ পূর্বের কথা ডাকয়ে দুঃখিনী ॥
কুমতি জনের মাগো দেহগো সুগ্যান।
দূর কর আসি মাগো শ্বশুরের মান ॥
বেহুলা করিল ধ্যান চিতে করি আশা।
টলিল আসন তথা জানিল মনসা ॥
নেতুর সহিত মাতা করিল বিচার।
বড় বড় সর্পগণে দিলেন হুঙ্কার ॥
শঙ্খচূড় রাধাচিতি ধাইল গোখুরা।
আসিয়া সমুখে সর্প হইলেন খাড়া[১]।
অজগর ময়াল আইল দুইজন[২] ॥
দীর্ঘ চারিক্রোশ তনু প্রখর বদন[৩] ॥
কুম্ভত অঞ্জন আইল সর্প কালচিতি।
পর্বতিয়া বোড়া ধায়্যা আইসে শীঘ্রগতি ॥
সর্পগণে বিষহরী আশ্বাসিয়া বলে।
অবিলম্বে যাঅ তোরা গাঙ্গুড়ির খালে ॥
শিরে করি সাত ডিঙ্গা আমার বচনে।
তুল্যে দিয়া আইস সভে চান্দের ভুবনে ॥
শুকুলাতে নৌকা যদি পার চালাইতে।
তবে চাঁদ বাণ্যা পূজা করিবে আমাতে ॥
মনসার আগ্যাতে চলিল নাগগণ।
গাঙ্গুড়ির খালে গিয়া অতি শীঘ্রে হন ॥
জলে ডুবি সর্পগণ নায় দিল মাথা।
শুকুলাতে চলে নৌকা সাধু আছে যথা ॥
পবন জিনিয়া হৈল নৌকার গমন ॥
দেখিয়া ত্রাসিত হয় যত জীবগণ ॥
একতিলে সাত ডিঙ্গা সাধুর গোচরে।
রাখিয়া চলিল সর্প পবনের ভরে ॥

১ পাঠান্তর—এক এক সর্প আসে পর্বতের পারা। ২ পা—[illegible]নে ৩ পা—গঠনে

সপ্ত ডিঙ্গা ধনে পূর্ণ দেখি সাত স্থতে।
করুণা সাধুর চিতে বাড়িল ত্বরিতে॥
মনসার পাদপদ্ম করিতে পূজন।
নানা দ্রব্য করে সাধু কবিরাজে কন॥

ত্রিপদী

হরের নন্দিনী দীন হীন জানি
উরহ আসরে মোক্ষ ভুজঙ্গবাহিনী॥
তোমার মহিমা কার প্রাণ সীমা
ভুবন ব্যাপিত * * * রূপ তোমা॥
কৃপা মোর কুলে স্থাপিত নিশ্চলে
সর্প ভয় নিবারিয়া রাখিবে কুশলে॥
তুমার সঙ্গীত শুনে যার চিত
সর্বদা তাহার পক্ষে হবে দয়ান্বিত॥
তবে সদাকর দেখিয়া কুমর
হৃদয়ে করুণা তার জন্মিল বিস্তর॥
সনকার স্থখ দেখি পুত্রমুখ
দূরে গেল সঞ্চিত আছিল যত দুখ॥
চিন্তিয়া ত্রিপুরা সাধু কৈল ত্বরা
উপহার আনি পূজে মনসার বারা॥
সাধুর আদেশে নানা দ্রব্য আইসে
প্রতি দ্বারে ঘট দেখি মনসার বৈসে।
নানা বাদ্য বাজে নগরের মাঝে
জয়ধ্বনি দশদিগে সুমঙ্গল কার্যে॥
ধূপ দীপ ধুনা গন্ধ পুষ্প নানা
শীঘ্র আয়োজন করি দিল সর্বজনা॥
করিয়া ত্রিপুর চান্দ সদাকর[১]
মনসার ঘট স্থাপে ঘরের ভিতর॥

১ পাঠান্তর—স্নান করি ঘর গেল সদাকর

হেন্তালের বাড়ি দূরে ছিল পড়ি
নিকটে রাখিল সাধু ক্রোধ দূরে ছাড়ি[১] ॥
অগুরু চন্দন নানা পুষ্পগণ
বাম হস্তে পূজা সাধু কৈল আরোপন ॥
মনসা আপনে রহিলা গগনে
ঘটে নাই দেন ভর শঙ্কার কারণে[২] ॥
বেহুলা সুন্দরী দেখি বিষহরী
বলে মাতা ঘটে ভর দেহ ত্বরতরি ॥
বড়ই নিষ্ঠুর আমার শ্বশুর
কৃপা করি ঘটে আস ক্রোধ করি দূর ॥
বলে বিষহরী শঙ্কা মনে ধরি
হেন্তালের বাড়ি সাধু ফেলু দূর করি ॥
বেহুলা কহিল সনকা শুনিল
কান্দিয়া[৩] স্বামীরে কিছু বলিতে নারিল[৪] ॥
শরীর পাষাণ ধরেছ নিদান
এখন না ছাড় তুমি মনসারে মান ॥
অসাধ্য সাধিলে হারাধন পাইলে
মৃতপুত্র বিষহরী আনি দিল কোলে ॥
বেহুলার তরে পৃথিবী ভিতরে
রহিল তোমার কীর্তি যুগ যুগান্তরে ॥
বোলি করজোড়ি ক্রোধ দূরে এড়ি
মনসারে পূজ ফেলি হেন্তালের বাড়ি ॥
গগন উপর দেবী দিল ভর
ঘটে নাই উরে দেবী মনে করি ডর ॥
হাসে সদাকরে সনকা উত্তরে
ফেলিল হেন্তালের বাড়ি ক্রোধ করি দূরে ॥

১ পাঠান্তর—অহঙ্কার ছাড়ি ২ পা—শঙ্কা করি মনে ৩ পা—নিন্দিয়া ৪ পা—লাগিল

পূজে এক ধ্যানে মনসা চরণে
ঘটে ভর দিল মাতা তুষ্ট হৈয়া মনে ॥
অবনীর মাঝে মনসা বিরাজে
দশদিগ শোভা ধরে নানা বাদ্য বাজে ॥
নারীগণ মিলি ধূপ দীপ জ্বালি
জয় জয় শব্দ ধ্বনি দেয় হুলাহুলি ॥
মঙ্গল মহুরি বাজে সারি সারি
শঙ্খ করতাল কাঁসি পিনাক ঝাঁঝরি[১] ॥
বলে বিষহরী শান্ত মূর্তি ধরি
সাতপুত্র ঘরে আন মঙ্গলিয়া তরি ॥
দেবীর আদেশে চলিল হরিষে
নগরীর নারীগণ ধাইল বিশেষে ॥
সনকা সুন্দরী বধূ সঙ্গে করি
বিহিত মঙ্গল কৈল জয় জয় পুরি ॥
দেখিয়া জননী তেজিল তরনী
মায়ের চরণে প্রণমিল সভে জানি[২] ॥
দেখি সাত সুতে সনকার চিতে
উৎসব আনন্দ[৩] হৈল পুত্র মুখ চাইতে ॥
জনপ্রতি কোলে সনকা আকুলে
দিল লক্ষ লক্ষ চুম্ব বদন মণ্ডলে ॥
আনন্দ অপার কি কহিব আর
অন্ধ যেন লোচন পাইল পুনর্বার ॥
চান্দ অধিকারী পূজে বিষহরী
সাত পুত্র আসি নমে ঈশাণ কুমারী ॥
তবে সভাকারে[৪] প্রণিপাত করে
দেখিআ করুণাজলে হৃদয় বিদুরে ॥

১ পাঠান্তর—কংশাল করতাল বংশী বাজয়ে খঞ্জরি ২ পা—লুটে সাতভাই জানি ৩ পা—উছলিল আনন্দ ৪ পা—সদাকরে

আসি সাতজনে মধুর বচনে[১],
তুষ্টি করে মনসারে বিবিধ বন্দনে ॥
বলে আগো মাতা হরের দুহিতা
না চিনি তোমারে মোর[২] অনেক অবস্থা ॥
ক্ষেম অপরাধ পূর্ণ কর সাধ
ঘুঁচিলে বিবাদ আগ্যা করহ প্রসাদ ॥
বলে বিষহরী থাক মর্ত্ত পুরী
অন্তকালে গতি পাবে চান্দ অধিকারী ॥
ঘটে বিসর্জনে দেঅ সর্বজনে
স্মরণে পাইবে দেখা যাঅ নিকেতনে ॥
বেহুলা নাচনী বলে তত্ত্ব জানি
সেবকে ছাড়িয়া কোথা যাঅ পদ্মাসনী[৩] ॥
এ সব সংসার মায়ার সঞ্চার
ইহাতে আমার চিত নাহি ডুবে আর ॥
ঈশাণ নন্দিনী কহিলেক জানি
কথোদিন পৃথিবীতে থাক দুইপ্রাণী ॥
যাবে স্বর্গপুরে ইন্দ্রের নগরে
ইহার বৃত্তান্ত মাগো[৪] কহিব তোমারে ॥
মাগিল বিদায় বিষহরী যায়
পৃথিবীতে রাখি পূজা নিজ স্থান যায় ॥
ইহার উত্তার[৫] চান্দ সদাকর
নিমন্ত্রণ দিল যত বণিকের ঘর ॥
আনি বন্ধুগণ সুগ্যানী ব্রাহ্মণ
সাতপুত্র পুনর্বার ঘরে বিবাহন ॥
সভাই কৌতুকে রহিলেন সুখে
বেহুলার যশ গুণ বাড়ে দুই লোকে ॥

১ পাঠান্তর—আনন্দিত মনে আসিয়া নন্দনে ২ পা—পাইনু ৩ পা—ঠাকুরাণী
৪ পা—পাছু ৫ পরে

মনসামঙ্গল শ্রবণে কুশল
সর্পভয় পীড়া দূরে নাশে অমংগল ॥
কবিরাজে গায় মনসার পায়
কৃপা করি বিষহরী রাখ পদ্মপায় ॥

পয়ার

জয় জয়[1] বিষহরী মনসা কুমারী।
রাখহ সেবকের মান মনোবাঞ্ছা পুরি ॥
অষ্টাঙ্গ নাগমণি মাগো শোভে তুমা মস্তে[2]।
গর্জন করয় ঘোর কালসর্প হস্তে ॥
তুমি যারে বাম মাগো মৃঢ় সেই প্রাণী।
শেষ শূন্য কৈল কিসে গুণ তুমার জানি ॥
একচক্রে ধরিলে তুমি পৃথিবীর ভার।
অপার মহিমা দেখি শিব কৈল হার ॥
অশেষ পাপের পাপী আমি অভাজন।
কিঞ্চিত কটাক্ষ মাগো করিবে আপন ॥
আমি অল্পমতি কুলে কুলাঙ্গার।
জানিতে কি পারি মাগো মহিমা তুমার ॥
জলে স্থলে ব্যাপিত যত ত্রিভুবন।
আপনি নাগের রাণী লয়্যাছি শরণ ॥
সর্পভয় নিবারিবে শিবের নন্দিনী।
উদ্ধারিলে লক্ষীন্দরে ভুজঙ্গ জননী ॥
তবে বিষহরী মাতা জানিয়া কারণ।
ইন্দ্রের নগরে গিয়া দিল দরশন ॥
শচী ইন্দ্র দুইজন মনসা[3] দেখিয়া।
করুণা করিআ বলে পুত্রবধূ লাগিয়া[4] ॥

১ পাঠান্তর—উরউর ২ মস্তে—মস্তকে ৩ পা—মনসারে দুজনে ৪ পা—খোআ্যা (খোয়াইয়া)

কি করিলে বিষহরী দয়া দূরে ছাড়ি।
পুত্র বধূ বিনে মোর শূন্য ঘর বাড়ী ॥
নিরন্তরে শোকে প্রাণ পরাণ ব্যথিত।
দশদিগ অন্ধকার স্থির নহে চিত ॥
কঠিন পুত্রের শোকে ধৈর্য্য করে দূর।
ত্রিভুবনে সহে হেন কে আছে নিষ্ঠুর ॥
অনেক করুণা করি শচীর ক্রন্দন।
বলে পুত্র বধূ কোথা রাখিলে আপন ॥
নিশ্চয় পরান যায় তুমার গোচরে।
নহে পুত্র বধূ আনি দেহ মোর ঘরে ॥
শচীর কাতর দেখি ইন্দ্রের কাতর।
প্রবোধিয়া বিষহরী আইলা মরুপুর ॥
পবন জিনিয়া চলে হংসের বিমান।
চক্ষুর নিমিষে গিয়া চঁপা নগ্র পান ॥
প্রবেশিল বিষহরী চাঁন্দের মন্দিরে।
দেখিয়া জানিল বেউলা নিতে আইল মোরে ॥
সগোষ্ঠী সহিতে পড়ে মনসার পায়।
সভারে আশীষ দিয়া তুলিলেন মায় ॥
লক্ষীন্দর বেহুলারে বলে বিষহরী।
দুজনে চলহ তোরা ইন্দ্রের নগরী ॥
ইন্দ্রের নন্দন তুমি নাম নীলাম্বর।
পৃথিবীতে পাইলে জন্ম শাঁপিল শঙ্কর ॥
না দেখিয়া পুত্র বধূ শচীর কাতর।
পৃথিবীতে ভোগ শেষ চল যাই ঘর ॥
সংসার মায়ার বন্ধ সব মিথ্যাময়।
মাতাপিতা যত দেখ কেহ কার নয় ॥
অল্প দিন অল্প ভোগ প্রাণীর বিনাশ।
সংসার করিল বন্দী বিধি দিয়া পাশ।
লক্ষীন্দর বেহুলার আনন্দ শুনিয়া।
আর ছয় ভাই কান্দে কারণ জানিয়া ॥

সনকা রোদন করে পুত্র বধূ লয়্যা।
কোথা যাঅ দুইজন আমারে ছাড়িয়া॥
পূর্বের তপস্যা হেতু দুঁহে মোর ঘরে।
আনন্দ সাগরে যাঅ তেজি দুঃখ ঘোরে॥
মনসা বলেন শুন সনকা বাণ্যানী।
মরিল দুঁহার ভোগ দুঃখ কর কেনি॥
সনকা বলেন মাতা আগে দিব প্রাণ।
তবে দুঁহে লয়্যা যাঅ কহিলু নিদান॥
বিষহরী বলে তোমা ভোগ আছে ক্ষিতি।
প্রাণগতে সভাকারে দিব দিব্য গতি॥
কহিতে কহিতে রথ আসে শূণ্যভরে।
স্বর্গের বাহন তারা বিজুরি সঙ্করে॥
লক্ষীন্দর বেহুলা বিদায় হয়[১] বাপ মায়।
ছয় ভাই বধূগণে মাগিল বিদায়॥
কলরব গণ্ডগোল উঠিল বিস্তর।
ধরণী লোটায়্যা কান্দে চাঁদ সদাকর॥
লক্ষীন্দর বেহুলার ধরি দুই কর।
মনসা রথের মধ্যে শূন্যে দিল ভর॥
পবনে[২] উড়িলা রথ অদৃশ্য সন্ধান।
দেখিতে না পায় কেহ গেল কোন্ স্থান॥
নিমিষেতে রথ গেল শূন্যপুরে[৩]।
স্বর্গগঙ্গা যেন খানে বহ্যা আছে ধীরে॥
দুইজনে সেই জলে করিল স্নাহান।
মনুষ্য শরীর ছাড়ি দেবমূর্তি পান॥
শচী ইন্দ্র করুণা করএ যেইখানে।
পুত্র বধূ লয়্যা মাতা দিয়া সেহি স্থানে[৪]॥

১ পাঠান্তর—প্র.বাধিয়া ২ পা—আকাশে ৩ পা—গগন ভেদিয়া গেল স্বর্গের উপরে
৪ পা—দিল তার স্থানে

আনন্দে পূজিল ইন্দ্র মনসার পায় ।
বিদায় হইয়া দেশ বিষহরী যায় ॥
বেউলা লক্ষীন্দর রৈল ইন্দ্রের ভুবনে ।
ঘুঁচিল যতেক দুঃখ সুখসুধা পানে ॥
গায়ন মঙ্গল গায় নাচয় কিন্নরী ।
নৃত্য গীতে শোভা ধরে ইন্দ্রের নগরী ॥
মনসা আপন স্থানে রহিলেন সুখে ।
পৃথিবীতে পূজা লয়্যা উদ্ধারি সেবকে ॥
মনসার পাদপদ্মে নিবেশিয়া চিত ।
এতদূরে পূর্ণ হৈল মনসার গীত ॥
যে জন স্মরণ করে তুমার মঙ্গল ।
ক্ষমিবে তাহার দোষ চিন্তিবে কুশল ॥
তুমার চরণ পদ্মে জানি অবতংশে ।
কৃপা করি দয়াময়ী রাখ মোর বংশে ॥
দেশ অধিপতি কুলে বাড়িবে সম্মান ।
উমাপতি দাস প্রতি রাখিবে কল্যাণ ।
সভাকার মনোবাঞ্ছা ধর পূর্ণ করি ।
হরিবে সাপের ভয় ঈশান কুমারী ॥
কেরুড়ে নিবাস করি নন্দীগ্রামে আসি ।
রচিলু তুমার গীত মনে অভিলাষী ॥
আষাঢ়ের শেষ দিন পঞ্চমীর* তিথি ।
লিখিতে আরম্ভ[১] হৈয়া সাঙ্গ হৈল পুঁথি ॥

---

* আষাঢ়ী কৃষ্ণাপঞ্চমীতে মনসাদেবীর পূজা প্রশস্ত। এটি রঘুনন্দন কৃত অষ্টাবিংশতি তত্বে সমর্থিত—

সুপ্তে জনার্দ্দনে কৃষ্ণে পঞ্চম্যাং ভবনাঙ্গনে ।
পূজয়েন্মনসা দেবীং স্নুহী বিটপসংস্থিতাম্ ॥

আষাঢ় মাসে ভগবান বিষ্ণু নিদ্রিত হলে কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে ঘরের উঠোনে সিজগাছে মনসাদেবীর পূজা বিধেয় ।

১ পাঠান্তর—মিথুনে আরম্ভ

যদি বাড়া তুটা[১] ছন্দ হৈয়া আছে দেঢ়ি[২] ।
শুনিবে সঙ্গীত মাগো ক্রোধ দূরে এড়ি ॥
তুমার চরণে গীত কৈলু সমর্পণ ।
ক্ষমিবে আমার দোষ আমি অভাজন ॥
কেবল তুমার পদ করিয়া ভরসা ।
রচিল দ্বারিকা দাস রাখগো মনসা ॥

পুষ্পিকা

নকল করিল পুথি কাঁথি দেশে ঘর ।
তাহার ঠাকুরের নাম অতি মনোহর ॥
শ্রী বংশী চরণ বেহেরা মুলোকে ঘোষণা ।
ঠাকুর দাদার নাম রাধু চরণ বেহেরা ॥
আমি অতি মূঢ়মতি কি লিখিতে জানি ।
যেমত মনসার দয়া সেইমত বাখানি ॥
মনসা তুমার নাম মনবাঞ্ছা পুরি ।
জন্ম হৈতে ইষ্ট মোর মনসা সুন্দরী ॥
গাহক জনাকে কহি জুড়ি দুই কর ।
ক্ষমিবে সকল দোষ সেবক তোমার ॥
সেবকের দোষ যদি শ্রবণে শুনিবে ।
তবে ত এজন পরিত্রাণ কোথা পাবে ॥
সম্পূর্ণ হইল পুথি চৌতর সাল চৌতুর মাসে
তেইসি দিনে শনিবারে শুক্লপক্ষে পঞ্চমী তিথি
বেলা চোউদ ঘড়ি সমএ সম্পূর্ণ হৈল পুথি
শুন সর্বনরে ।

১ কম ২ কোন প্রকারের ত্রুটি, ভিন্ন প্রকার

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট

রচয়িতাঃ খারি চিত্রকর
গায়কঃ পিয়ারী চিত্রকর

জয় দিয়ে পূজিলাম মাগো জয় বিষহরী।
অষ্টম লাগের মাতা পরম সুন্দরী॥
লাগের হোল খাটপালংক লাগের সিংহাসন।
মঙ্গলা বড়ার পিঠে দেবীর আসন॥
চম্পক নগরে ঘর চাঁদ সদাগর।
মনসার সাথে বাদ তার শুনহ সত্তর॥
মনসার সাথে করে বাদ ছয় ব্যাটা মরল।
শেষেতে সওদাগর ক্রোধিত হইল॥
তরজে গরজে বেগে মচড়ায় দাড়ি।
কাঁধে করে নাচে বুড়া হেঁতালের বাড়ি॥
যদি বেটী চ্যাংমুড়ি লাগাল যদি পাই।
মারিব হেঁতলার বাড়ি কম্মড় কুচাই॥[1]
যেই গাল বিষহরী আপনি শুনিল।
ক্রোধিত হইয়া তখন মনসা চলিল॥
কোলের ব্যাটা আছে আমার দুর্ল্লভ[2] লখিন্দর।
তার বিভা দিতে যাব নিছানি নগর॥
নিছানি নগরে ঘর সায় সদাগর।
বেহুলা নামতে কন্যা দেখিতে সুন্দর॥
তাহার সঙ্গেতে তার বিভা যে হইল।
বিবাহে লখিন্দর ঘরেতে চলিল॥
সাতালি পর্বতে করল লুহার বাসর ঘর।
তাথে শুয়ে নিদ্রা যাবে কান্ত লখিন্দর॥
বিশ্বকর্মা সেই ঘর নির্মান করিল।
তাহাতে একটি সুতার ফাটল রাখিল॥

১। গুঁড়িয়ে ২। কেতকাদাস-ব্যবহৃত বিশেষণ

দেবতার সঙ্গে বাদ কে করিতে পারে ।
দেবতার কোপে তারা পড়িল সত্বরে ॥
মনসার আজ্ঞায় নাগ বাসরে পৌছিল ।
সুতার সঞ্চার দিয়ে ঘরেতে ঢুকিল ॥
লখিন্দরের রূপ দেখে চিন্তায় পড়িল ।
এমন সুন্দর বালকে কি করে দংশিব ॥
এই বলে নাগ আশে পাশে ঘুরে ।
পাশমড়া দেল বেগে শুনহ সত্বরে ॥
পাশমড়া দিতে সাপে দন্তে মারে লাথি ।
এই দেখ চন্দ্রসূর্য তোমরা রহ সাথী ।
বিনা অপরাধে বেণা দন্তে মারে লাথি ॥
এই চন্দ্র সূর্য সাক্ষী রেখে মারিল কামড় ।
বিষের জ্বালায় চেতন হল বালা লখিন্দর ॥
উঠনা উঠনা রামা সায়বেণের ঝি ।
তোমায় এল কালনিদ্রা আমায় খেল কি ॥*
কন্যা যে জাগিয়া ছিল নিশাভোর রাতি ।
আঁচল চিরিয়া কন্যা জ্বালিলেন বাতি ॥
সাপের ফিঁকিয়া[১] মারে সুবর্ণের জাঁতি ॥
নেজ কাটা গেল সাপের আড়াই আঙ্গুল ।
সাপুনী পলায়ে গেল ব্যাথায় আকুল ॥
দৌড়ি গিয়ে বেহুলা যে সদাগরে কয় ।
তোমার ব্যাটা মারা গেছে শুন মহাশয় ॥
ভাল হোল আমার ব্যাটা লক্ষিন্দর মরল ।
হেতলার বাড়ি নিয়ে নাচিতে লাগিল ॥
কখন হবে বেহুলা রজনী প্রভাত ।
মাছ পড়া করে আমি খাব পান্তাভাত ॥**
দিয়েছিলে শাঁখা শাড়ি লহ খসাইয়া ।
কলার মান্দাস শ্বশুর দেহ বানাইয়া ॥

---

* এই দু'টি ছত্রে কেতকাদাসের প্রভাব লক্ষণীয়। ১। ছুঁড়ে
* * ছত্রটিতে কেতকাদাসের প্রভাব প্রত্যক্ষ ।

একখানি কলার গাছ তিনখানি করিল।
বাঁশের গ্যাজাল[১] মেরে মান্দাস বানাল ॥
লখিন্দর নয়ে বেহুলা ভাসিয়া চলিল।
ভাসিতে ভাসিতে ভেলা কতদূর গেল।
তাড়াতাড়ি বেহুলার ছয় ভাই এল ॥
ভগ্নীরে আদর করি বলিতে লাগিল ॥
ছয়ভাই বলে দিদি প্রাণের ভগিনী ॥
পচা মড়া নয়ে কেন জলে ভাস তুমি ॥
অল্প বয়সে দাদা হলাম কড়ে রাঁড়ি।[২]
কতনা ফেলাব ভাই নিরামিশ্যের হাঁড়ি ॥
ছয়ভাই বলে দিদি ঘরে ফিরে চল।
ছটি বধূ আছে তোমার নিচে খাটাব ॥
মা বাপের ঘর ভাই আর নাহি সাজে।
কুঁদুলে ভাজেদের সাথে সদাই দ্বন্দ্ব বাজে ॥
ভায়েরে পরিবোধ দিয়া ভাসিয়া চলিল।
কিছুদূর পর বেহুলা গদাঘাট গেল ॥
গদা বুড়া বড়শি আড়ে গাঙ্গুড়ির জলে।
শুধু অন্ন খায়নি গদা রুই মাছ ধরে ॥
দুই পায়ে গোদ গদা কানে রামকড়ি।*
আশে পাশে ফিকে গদা বড়শির দড়ি ॥
যুবতিনী দেখে গদা করে উপহাস।
বলনাগো সিমন্তিনী কোন দেশে বাস ॥
তোর মুখে ছাইরে গদা তোর মুখে ছাই।
মনসার দাসী আমি ভেসে চলে যাই ॥
গদারে গালি দিয়ে ভাসিয়া চলিল।
বস্তু ঘাটে গিয়ে মড়া উপস্থিত হল ॥
বস্তু বলে সিমন্তিনী এক সত্য রাখ।
বাঁচাব তোমার স্বামী আমার দেশে থাক ॥

১। গজাল ২। অল্পবয়স্কা বিধবা
* কেতকাদাসের প্রভাব সুস্পষ্ট।

তোর মুখ ছাইরে বদ্য তোর মুখে ছাই।
মনসার দাসী আমি জলে ভেসে যাই ॥
বদ্যরে গালি দিয়া ভাসিয়া চলিল।
শৃগাল কুকুর ঘাট আড়াইয়া গেল ॥
হাঙ্গর কুমীরের ঘাট আড়াইয়া গেল।
তমলুকের ঘাটে মড়া উপনীত হল।
পচা গন্ধ হইছে স্বামী ফেলাইব কথা।
শ্বেতকাকে ছিঁড়ে খায় লক্ষিন্দরের মাথা ॥
ধনা মনা দুটি ছেলে শুয়াইয়া ঘাটে।*
নিত্যাই ধোপানী কাপড় কাচে তমলুকের পাটে ॥
নিত্যা কাচিল কাপড় ছার ক্ষার জলে।
বেহুলা কাচিল কাপড় শুধু গঙ্গাজলে ॥*
দুইজনে কাপড় শুকাইতে দিল।
বেহুলার কাপড় উজ্জ্বল হইল ॥
সেই কাপড় নয়ে বেহুলা দেবপুরে গেল।
দেবপুরে যেয়ে বেহুলা নাচিতে লাগিল ॥
নাচগান শুনে দেবতারা বেহুলারে জিজ্ঞাসিল ॥
কিবা বর চাহ মাগো বলনা সত্বর।
এই বর চাহি প্রভু তোমাদের কাছে।
ছটি ভাসুর স্বামী মোর দেহ বাঁচাইয়ে ॥
দিলাম তোমায় বর বেহুলা দিলাম তোমায় বর।
ছয় ভাসুর স্বামী লয়ে তুমি যাও ঘর ॥
এই বলে ছয় ভাসুর স্বামী বাঁচাইয়া দিল।
ডিঙ্গা বাঁচায়ে করে ঘরেতে আসিল ॥
মনসা পূজা সেই হতে আরম্ভ হইল ॥
অন্য লোকে পুষ্প দিলে জলে ভেসে যায়।
চাঁদ বেণা পুষ্প দিলে মনসার জটায় শুকায় ॥
সেই হতে মনসা পূজা প্রতি ঘরে হোল।
বামহাতে সদাগর প্রচার করিল ॥

* কেতকাদাসের প্রভাব লক্ষণীয়

ষাটি হাজার সাইত্রিশ সালে কৃপা কৈল মহীতলে
দিয়া রাঙা চরণের ছায়া।
স্বর্গে থাকি মা মনসা কণ্ঠে দেহ পা
মোর কণ্ঠে কর কৃপা ওগো গুরু মা॥
সভামধ্যে গুণ পাই যেন লজ্জা নাহি পাই
কৃপা কর ঈশান-কুমারী।
পাদপদ্মে করি আশ ডাকিছে তোমারে দাস
কৃপা কর ভুজঙ্গ-জননী॥

শব্দসূচী

শব্দসূচী

অ

আ

ই

ঈ

উ

গ

ঘ

চ

ঢ

ত

থ

দ

প

ভ

ম

য

———